মা

ম্যাক্সিম গর্কী

অনুবাদক
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
[illegible]নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীআশুতোষ ঘোষ
গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীহট্ট, তেলিহাওর
১৮ই আষাঢ়, ১৩৫১

—দাম পাঁচ সিকা—

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস।
প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়।
৭১।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

রাশিয়া এক অদ্ভুত দেশ। সেখানে যা-কিছু ঘটে, তা চরম-মাত্রায় ঘটে।

উদাসীন অত্যাচারী রাজতন্ত্র সেখানে যে বিকট মূর্ত্তি গ্রহণ করেছিল—জগতের ইতিহাসে তার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত বিরল বল্লেই হয়। সত্তর বছরের মধ্যে আট লক্ষ লোক জার-তন্ত্রের প্রতিবাদের অপরাধস্বরূপ একই পথ দিয়ে সাইবেরিয়ার চির-তুহিনে চির-নির্ব্বাসিতের জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়।

উদাসীন অত্যাচারী শাসক জাতির অন্তরকে কশাঘাতে যখন দীর্ণ করে ফেলে, তখন সেই দীর্ণ অন্তর থেকে রক্ত-কমলের মত ফুটে ওঠে, জাতির মুক্তি-বাণী!

গর্কীর জগৎ বিখ্যাত উপন্যাস—"মাদার"—সেই অপরূপ রক্ত-কমল! নির্য্যাতিত, নিপীড়িত মানবত্বের মুক্তি-বাণী!

একটা সমগ্র জাতির অন্তর-বেদনার ইতিহাস এমন ভাবে জগতের আর কোন ভাষায় লেখা নেই!

"গর্কী" মানে হলো তিক্ত! এই ছদ্ম-নামে তিনি আজ জগতে খ্যাত। তাঁর অর্দ্ধেক জীবন দিয়ে জগতের নানাক্ষেত্রে তিনি যে তিক্ততম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন—জগতের ইতিহাসে বেদনার সঙ্গে সেরকম ঘনিষ্ঠ এবং নিগূঢ় পরিচয় খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটেছে দেখা যায়। তাঁর সাহিত্য সেই নিগূঢ় অভিজ্ঞতার পুণ্যতম স্মৃতি! বেদনার নব-বেদ!

সমস্ত অনাচার, সমস্ত ভয়াবহতা, সমস্ত পঙ্কিলতার সকল রকম তিক্ততার সীমা-রেখা পায়ে হেঁটে পার হয়ে, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যে গর্ব্বী অতি বলিষ্ঠ পুরুষ-কণ্ঠে এই বাণী প্রচার করেছেন—তবু ঘৃণা নয়, প্রেম হ'ক জীবনের ধাত্রী !

এই অপরূপ বাণী এবং সকল রকম গ্লানির মধ্যে মানুষের মুক্তির চরম-আশ্বাসের কথা—তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "মাদারে" রূপ নিয়েছে। যদিও "মাদার" একান্তভাবে রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এই গ্রন্থের সঙ্গে একটা জাতির মুক্তি-পণের ইতিহাস সাক্ষাৎভাবে বিজড়িত—তবুও রসের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির লোক এই গ্রন্থকে আদর করে বরণ করে নিয়েছেন, কেন না—যে বেদনায় সন্তানের জন্যে মার মন কাঁদে, মার মনের সে-বেদনা তার নিজের ছেলের জন্যে হলেও, তার মধ্যে দিয়ে যে-মাতৃত্ব ফুটে ওঠে, সেটা সকল দেশে এক ! মাতৃত্বের এক অপরূপ সন্তান-সন্তাপহারিনী মূর্ত্তি এই বইতে ফুটে উঠেছে বলে—জগতের সকল জাতির লোকের অন্তরে কোথায় অলক্ষিতে এই বইখানি একটা দাগ রেখে গিয়েছে।

অনুবাদ দুর্ব্বল হলেও, অনুবাদকের একমাত্র ভরসা যে, মাতৃরূপের উপাসক বাঙালীর মন, জননীর নতুন এই চিত্রটীকে নিশ্চয়ই সাদরে বরণ করে নেবে এবং সেইটুকু উদ্দেশ্য যদি সফল হয়, তা হলে তার মধ্যে এই অনুবাদের সমস্ত ত্রুটী সত্ত্বেও, অনুবাদক নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে।

শেলী

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(জীবনী-উপন্যাস)—দাম দেড় টাকা

বাংলা ভাষায় এই ধরণের জীবনী এই প্রথম লেখা হইল। প্রেম, বিদ্রোহ ও আত্মার শতসন্দেহক্ষুব্ধ মহাকবি শেলীর করুণ জীবন আগাগোড়া উপন্যাসের অভিনব রচনা-ভঙ্গীতে বলা হইয়াছে। রচনার প্রত্যেক অক্ষর বাহিরের ঘটনা হইতে পাঠকের মনকে ঘটনার অন্তঃপুর কবির অন্তরের রহস্যলোকে লইয়া যাইবে। জীবনীসাহিত্যে ইহা যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে।

মা—

ম্যাক্সিম গর্কী

—প্রথম ভাগ—

প্রতিদিন প্রভাতে কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠে। কম্পিত কর্কশ দীর্ঘ শব্দ শ্রমজীবিদের আবাসের উপরের ধূম-ধূসর পরিম্লান আকাশকে ছাইয়া ফেলে। যন্ত্র-দানবের এই নিষ্করুণ আহ্বানে নত-মস্তক অসংখ্য নর নারী ম্লান গৃহ-গহ্বর হইতে দলে দলে পথে বাহির হইয়া পড়ে, বিশুষ্ক বিষণ্ণ-মুখে, সন্ত্রস্ত জন্তুর মত তাহারা আগাইয়া চলে,—অনিদ্রায়, অল্প-নিদ্রায় দেহ কাঠ হইয়া থাকে। অদূর-আগত প্রভাতের মন্দ-আলোকে, কর্দমাক্ত পথে, তরল বিবর্ণ নয়নের অর্থহীন দৃষ্টি লইয়া সঙ্কীর্ণ খোয়ার পথ বাহিয়া তাহারা চলে—যেখানে তাহাদের জন্য হিম স্নেহে অপেক্ষায় রহিয়াছে দীর্ঘ প্রস্তরের পিঞ্জরগুলি। কাদায় পায়ে-চলার শব্দ হয়—অনুকম্পার অভিনয়ের শব্দ। তন্দ্রাচ্ছন্ন গভীর কর্কশ শব্দে পথ ভরিয়া যায়, ক্ষুব্ধ আক্রোশের নির্লজ্জ ভাষা আকাশ ছাইয়া ফেলে। আর সেই সমস্ত অতিক্রম করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য গভীর বধির গতি-রোলে যন্ত্রের পীড়িত আর্ত্তনাদ তাহাদের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতে থাকে। নির্দ্দয় অনিবার্য্যতার মত অন্ধকারে কারখানার চিমনীগুলি দীর্ঘ সবল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় যখন আবার সূর্য্য অস্ত যায়, অস্ত-সূর্য্যের বিলম্বিত রক্ত-আলো যখন বাতায়নে বাতায়নে আসিয়া পড়ে, তখন আবার কারখানা হইতে দাহ-অন্তে ভস্মের মত অসংখ্য নর-নারী দলে দলে

পথে আসিয়া পড়ে। অন্ধকার-মুখ, ধোঁয়ায় ধূসর; সারা দেহে কল-চালানো তেলের তীব্র গন্ধ; গোধূলির ঈষৎ-আলোকে ক্ষুধার্ত্ত দাঁত-গুলির রক্তহীন পীত আভা মাঝে মাঝে জ্বলিতে থাকে। ফিরিবার সময় কিন্তু তাহাদের ভাষা একটু যেন সতেজ মনে হয়—একটু আনন্দের আভাস থাকে। একটা দিনের দীর্ঘ শ্রমের অবসান ত' হইল, ঘরেতে আহার আছে, তাহার সঙ্গে আছে বিরাম।

জীবন হইতে যন্ত্রদানব নিঃশব্দে দিবসকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। মাংসপেশী ও শিরা-উপশিরা হইতে যতদূর পারা যায় যন্ত্র তাহার আহারের জন্য রস চুষিয়া লইয়াছে। মানবের জীবন হইতে দিবসের রৌদ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। একটাও রবির কর জীবনের সঙ্গে গাঁথা হয় না। আপনার অগোচরে মানব মৃত্যুর গহ্বরের দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তবুও তাহার মনে বিরামের আনন্দের বাসনা আছে—সম্মুখেই পূতি-গন্ধময় ভাঁটিখানার আনন্দ-আশ্রম খোলা। আনন্দে সে তাহাই গ্রহণ করে।

ছুটির দিনে তাহারা বেলা দশটা পর্য্যন্ত ঘুমায়। তারপর বিবাহিত এবং অপেক্ষাকৃত শান্ত প্রকৃতির লোকেরা যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া গির্জ্জায় উপাসনার জন্য যায়। যাইবার সময় ছোকরাদের ধর্ম্মে অনাস্থার বিষয়ে তীব্র মন্তব্য করে। গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রুষ-জাতির মোহন-ভোগ 'পিরগ' খায়। খাওয়ার পর আবার ঘুমাইতে যায়—সেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। বহুবর্ষের স্তূপীকৃত অবসাদ ক্ষুধাকে কখন নষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাই আহারের প্রবৃত্তিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহারা জাগিয়া উঠিয়া আকুলভাবে মদ্যপান করে। উদরের অসহায় তন্ত্রীগুলি 'ভোডকার' তীব্র বিষজ্বালায় জ্বলিয়া উঠে।

তারপর তাহারা পথে এমনি ঘুরিতে বাহির হয়। এমনি অলসভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহাদের ভাল লাগে। কেউ কেউ কাদায় ব্যবহারের জন্য "ওভার-সু" পরে—যদিও পথ শুক্‌না থাকে, ছাতি লইয়া ছড়ির মত হাতে করিয়া চলে—রৌদ্র থাকিলেও। প্রত্যেকেরই যে জুতা ও ছাতা আছে তাহা নয় কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে বাসনা আছে যে, সে তাহার প্রতিবেশীর অপেক্ষা অধিকতর শোভন হইবে।

পথে দেখাশোনা হইলে তাহারা কারখানা আর যন্ত্রপাতির কথাই বলাবলি করে। ফোরম্যানকে লইয়া বেশ দুকথা অসাক্ষাতে বলা-কওয়া চলে। তাহাদের চিন্তার সীমানা কারখানা আর যন্ত্রপাতিকে ছাড়াইয়া যায় না। ক্বচিৎ, এবং তাহাও একান্ত আভাসে, তাহাদের সেই প্রতিদিনের অতিপুরাতন ক্লান্ত কথার মধ্যে সহসা কোন বন্ধ্যা বাসনার একটী স্ফুলিঙ্গ হয়ত দেখা দিত। বাড়ীতে ফিরিয়া তাহারা নিয়মিত ভাবে তাহাদের স্ত্রীদের উপর কব্জীর জোর পরীক্ষা করিত। ছোকরারা ভাঁটিখানায় স্ফূর্ত্তি জমায়, কারুর বাড়ীতেই হয়ত আড্ডা বসে, বাজনা বাজে, সৌন্দর্য্যের নাম-গন্ধ-শূন্য অশ্লীল গান পুরাদমে চলে, নাচ হয়, শ-কার ব-কারের সঙ্গে ভরা 'ভোড্‌কার' ভাঁড় অনবরত ভরা আর খালি হইতে থাকে।

শ্রমে-অবসন্ন-অন্তর তাহারা অতিক্রত পান করিয়া চলে। প্রত্যেক চুমুকের সঙ্গে প্রত্যেকের অন্তরে একটা অর্থহীন ব্যাধিগ্রস্ত চাঞ্চল্য জাগে। সে চাঞ্চল্য বাহিরে রূপ লইতে চায়। তাই সামান্য কারণে তাহারা বন্ধুদের সামান্যতম কথার ছল ধরিয়া বিষম ঝগড়ার সৃষ্টি করে। অন্তরের পিঞ্জরে আবদ্ধ সেই বিরক্তিকর চাঞ্চল্য মুক্তি চায়। কলহ ঘন হইয়া উঠে; মত্ত পশুর মত তাহারা আপনাদের

মধ্যে কলহ করে—কামড়াকামড়ি করে—রক্তারক্তি এবং কখন কখন হত্যাও হয়।

স্নায়ুতে বদ্ধমূল অবসাদের মত তাহাদের অন্তরেও এই হিংসার সংগোপন প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে সমস্ত হৃদয়-মন ছাইয়া ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তরের এই দুরারোগ্য ব্যাধি লইয়াই তাহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। যতদিন না মৃত্যু আসিয়া আবার তাহাদের এই পৃথিবী হইতে সরাইয়া লইয়া যাইত, ততদিন পর্য্যন্ত ঘন-কৃষ্ণ ছায়ার মত এই ব্যাধি তাহাদের ঘিরিয়া থাকিয়া নিত্য নব উদ্দেশ্যহীন অনাচারের ইন্ধন জোগাইত।

ছুটীর দিনে ছেলেরা বাড়ী ফিরিত গভীর রাতে—কাপড়-চোপড় ছেঁড়া, সর্ব্ব-দেহ ক্ষত-বিক্ষত। কেউ তার-স্বরে চীৎকার করিয়া জানাইতেছে কেমন আর একজনকে বেশ দু-ঘা দিয়া আসিয়াছে অথবা জোর দু-কথা শোনাইয়া আসিয়াছে ; কেউ বা অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিত। এমনিভাবে নিশীথ-রাত্রে তাহারা বাড়ী ফিরিত, মাতাল, অসহায়, বীভৎস হতভাগ্যের দল! কখনও ছোক্‌রাদের মা বাবা মাতাল অবস্থায় রাস্তা বা সরাইখানা হইতে অচৈতন্য অবস্থায় তুলিয়া আনে, গালাগাল দিয়া বকে, মদ্য-রসে ভরা স্পঞ্জের দেহে বৃথাই আঘাত করে। আবার তাহাদিগকে ধরিয়া কোনও রকমে বিছানায় শোওয়াইয়া দেওয়া হয়, কারণ আবার প্রভাত হইতে না হইতে ত' বাতাস কাঁপাইয়া কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিবে।

মাতলামি আর এই ভাঁটিখানার জীবন যে বুড়োদের কাছে অন্যায় লাগিত তাহা নয়, বরঞ্চ সেটা তাহাদের ন্যায্য অধিকার—একথা

বুড়ারা মানিত তবুও তাহারা ছেলেদের প্রহার ও গালাগালি করিত। তাহাদেরও যখন যৌবন ছিল তাহারাও এমনি উন্মত্ত হইয়াছে, কলহ করিয়াছে, আবার তাহাদেরও এমনি তাহাদের মা বাবা রাস্তা হইতে তুলিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছে। জীবন চিরকাল ধরিয়া এমনি বহিয়া চলিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর এমনি করিয়া একই-সুরে-বাঁধা জীবন-ধারা কোনও রকমে পঙ্কিল আবর্ত্তনের তলা দিয়া নিঃশব্দে বহিয়া চলিত। অতি পুরাতন অভ্যাসের ক্রীতদাস স্বরূপ তাহারা প্রতিদিন একই কাজ অবিরত দিবারাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া করিয়া চলিত। জীবনের এই ধারাকে পরিবর্ত্তিত করে—এমন সময় ও ইচ্ছা তাহাদের কাহারও ছিল না।

বহুদিন অন্তর সহসা হয়ত একটু নূতন ধরণের কোনো লোক গ্রামে আসে। নবাগত বলিয়াই সে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজের খাতিরে সে যে-সমস্ত জায়গায় গিয়াছে সেখানকার গল্প করিয়া ধীরে ধীরে অনেকের মধ্যে একটা আবছায়া কৌতূহলের সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছুকাল পরেই আবার এইটুকু নতুনত্ব তাহাও পুরাতন হইয়া আসে। এই সমস্ত গল্প শুনিয়া তাহারা বুঝিয়া লয় যে, সকল দেশেই কুলী-মজুরদের জীবন এমনি সমান বৈচিত্র্যহীন। তাহাই যদি হয় তবে ইহা লইয়া আলোচনা করিয়া কি লাভ!

ক্বচিৎ কখনও গ্রামে এমন এক একটী লোক আসে যাহার কথা একেবারে নূতন লাগে। তাহার সঙ্গে তাহারা কোনও তর্ক করে না, অদ্ভুত যাহা কিছু সে বলিয়া যায়, চরম অবিশ্বাসে তাহারা তাহাই চুপ করিয়া শুনে। এই রকম লোকের কথায় কখনও হয়ত কাহারও

অন্তরে অজানা একটা অন্ধ চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিত; বিশ্বাস কারতে গিয়া কাহারও বা অন্তরে কি একটা এলোমেলো আশঙ্কা জাগিত; কেহবা তাহার মধ্যে কোন অজানা সম্ভাবনার ক্ষীণ ছায়াময় আভাস দেখিতে পাইত। কিন্তু এই নিতান্ত উত্ত্যক্তকারী অপ্রয়োজনীয় ক্ষণিক উত্তেজনার হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা সকলেই আবার অধিকতর মাত্রায় পান করিত।

এই রকম নবাগতের চারিদিকে একটা অস্বাভাবিক কিছু তাহারা লক্ষ্য করিত বলিয়াই একটু বেশী দিন ধরিয়া তাহার স্মৃতি ইহাদের মনে জাগিয়া থাকিত এবং লোকটী তাহাদের মত হইতে পারে নাই বলিয়া সর্ব্বদাই শঙ্কিত সন্দেহের সঙ্গে দেখিত। তাহাদের ভয় হইত যে, হয়ত এই লোকটী তাহাদের জীবনে এমন একটা কিছু ঘটাইয়া তুলিতে পারে যাহাতে তাহাদের জীবনের এই অন্ধকার-বাহিনীর সনাতনী ধারা বুঝি বা ব্যাহত হইবে। অন্ধকার অথবা কুটীল যাই হ'ক এ জীবনের ধারা তাহাদের সুপরিচিত। তাই তাহাদের মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, জীবনের মাত্র একটী মাত্রা আছে—তাহার চেয়ে ভাল কি, তাহা তাহারা জানিত না, তাই তাহারা ভাবিত—পরিবর্ত্তন মানে শুধু জীবনের বোঝার মাত্রা বাড়ান।

সেই জন্য বস্তীর লোকেরা যাহারা জীবন সম্বন্ধে নূতন কথা বলিত তাহাদের নীরবে এড়াইয়া চলিত। এই সব নূতন লোকের মধ্যে কেউ কেউ যেমন সহসা আসিত, তেমনি সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইত। যদি কেহ সেই গ্রামে থাকিয়া যাইত, পাছে সেই গ্রামের রেখাহীন অসংখ্যের মধ্যে মিশাইয়া যাইতে হয়, সেই আশঙ্কায় সে আলাদা হইয়াই বাস করিত।

এমনিভাবে জীবন যাপন করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে একজন শ্রমজীবী পৃথিবী হইতে অবশেষে বিদায় গ্রহণ করিত।

ঠিক এমনি জীবন যাপন করিয়া যায় মাইকেল ভ্লাসব। মুখে তাহার কোনও হাসির চিহ্ন ছিল না। একরাশ ভ্রূর মধ্যে ছোট ছোট দুটো চোখ দিয়া সর্ব্বদাই এমন ভাবে চাহিয়া থাকিত যে, দেখিলেই মনে হইত যে জগতশুদ্ধ লোককে সে সন্দেহের চোখে দেখিতেছে।

গ্রামের মধ্যে সে সবচেয়ে ভাল মিস্ত্রী ছিল। দেহের শক্তিতেও তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। কারখানার ফোরম্যান বা ম্যানেজারকে সে মোটেই গ্রাহ্য করিত না; ফলে রোজগার হইত কম। ছুটির দিন সে কাহাকেও না কাহাকেও প্রহার না করিয়া বড়-একটা বাড়ী ফিরিত না। সেইজন্য প্রত্যেক লোক তাহাকে ঘৃণা এবং ভয় করিত।

বহুবার তাহাকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিবার চেষ্টাও হইয়াছিল; কিন্তু কোনও চেষ্টা ঠিক সফল হইতে পারে নাই। সে যেই বুঝিত যে তাহার উপর কোনও আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, তৎক্ষণাৎ সে হাতের কাছে ইট, পাথর যাহা পাইত, তাহা লইয়া পা ফাঁক করিয়া সোজা হইয়া নীরবে আক্রমণকারীর অপেক্ষায় ফিরিয়া দাঁড়াইত; যে তাহার দিকে আগাইয়া আসিবে, তাহারই মাথা গুঁড়া হইয়া যাইবে। তাহার চেহারার মধ্যে এমন একটা বীভৎসতার ছাপ ছিল যে, তাহাকে দেখিলেই লোকের ভয় করিত। বিশেষ করিয়া ভয়ের ছিল, তাহার ছোট ছোট চোখ দুটা। কোটরের ভিতর হইতে

ছোট চোখ দুটীর দৃষ্টি যেখানে গিয়া পড়িত, মনে হইত গরম লোহার সিকের মত সে যায়গা যেন ভেদ করিয়া চলিযাছে। চোখাচোখি হইলে মনে হইত যেন সম্মুখে এক হিংস্র বন্য জন্তু দাঁড়াইয়া আছে, চোখে এক আদিম ভয়াল হিংস্র দৃষ্টি এ দৃষ্টি যাহার, কোন নির্ম্মমতায় তাহার কোনও কুণ্ঠা নাই।

সে খুব অল্প কথাই কহিত, কিন্তু তাহার সকল কথার মাত্রা ছিল "পাজী বদমায়েস"। ঐ নামে সে কারখানার উপরিওয়ালাদের ডাকিত, ঐ নামে সে পুলিশের লোকদের গালাগালি দিত। বাড়ীতে ঐ নামে স্ত্রীকে সম্বোধন করিত।

তাহার ছেলে পাভেলের বয়স তখন চোদ্দ। একদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সহসা ছেলের চুলের মুঠী ধরিয়া টানিয়া তুলিবার তাহার বাসনা হইল। মাথায় হাত দিতে না দিতেই, পুত্রও গর্জ্জিয়া উঠিল। সামনে একটা হাতুড়ী পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া পুত্র রুখিয়া দাঁড়াইল।

"খবরদার। আমার গায়ে হাত দিও না বলছি। অনেক সহ্য করেছি, আর আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।"

পুত্রের দিকে চাহিয়া মাইকেল হাসিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা পাজী বদমায়েস।"

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে সে তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ্, কাল থেকে আর আমার কাছে পয়সা চাইবি না, এবার থেকে তোর ছেলে তোকে রোজগার করে খাওয়াবে।"

ভয়কুণ্ঠিত স্বরে নারীটী বলিল, "আর তুমি যা রোজগার করবে, সব মদ খেয়ে ওড়াবে তো?"

"তোর তাতে কি পাজী বদমায়েস!"

সেই দিন হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত যতদিন সে বাঁচিয়া ছিল, সে পুত্রের কোনও খোঁজখবর লইত না—পুত্রের সঙ্গে কোন কথাও বলিত না।

ভূ'সরের সঙ্গীহীন জীবনে একটী নিত্য সঙ্গী ছিল, সে তাহার কুকুর। কুকুরটী ছিল তাহারই মত ভীষণ ও বীভৎস। প্রতিদিন সকালে সে যখন কারখানায় যাইত, কুকুরটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার গেট পর্য্যন্ত যাইত। সন্ধ্যাবেলায় কারখানা হইতে সে যখন ফিরিয়া আসিত, কুকুরটা তাহার অপেক্ষায় গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। ছুটীর দিন কুকুরটীও সারাদিন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিত। রাত্রে মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া কুকুরটীকে লইয়া সে খাইতে বসিত, আপনার প্লেট হইতেই তাহাকে খাওয়াইত। কুকুরটাকে সে কোনও দিন মারে নাই, কোনও দিন আদরও করে নাই। খাওয়া শেষ হইলে, স্ত্রীর অপেক্ষা না করিয়াই ডিসগুলি সে ছুঁড়িয়া চতুর্দ্দিকে ফেলিয়া দিত; একটী হুইস্কীর বোতল লইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া গান গাহিত। গানের ভাষা তাহার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া জড়াইয়া যাইত। সেই বীভৎস স্বরের ধাক্কায় দাঁতের ফাঁক হইতে রুটীর টুক্‌রা ছিটকাইয়া পড়িয়া গোঁফে দাড়িতে আসিয়া লাগিত। সে আপনার মনে জগতের সকলের অনধিগম্য ভাষায় যতক্ষণ বোতলে মদ থাকিত, ততক্ষণ গাহিয়া চলিত। তাহার এই সঙ্গীত শুনিয়া মনে হইত, শীত-সন্ধ্যার নিস্তব্ধ প্রান্তরে যেন ক্ষুধিত শার্দ্দূল চীৎকার করিতেছে।

মদ ফুরাইয়া গেলে সেইখানেই সে ঘুমাইয়া পড়িত। কুকুরটীও তাহার পাশে শুইয়া পড়িত। রাত্রিশেষে যখন আবার কারখানার

বাঁশী বাজিয়া উঠিত যন্ত্রচালিতের মত তখনই সে-আহ্বানে আবার সে জাগিয়া উঠিত।

এমনি করিয়াই সে বাঁচিয়া ছিল, মরিল যখন তখন ঠিক এমনি কঠোর রূপেই মরণ তাহার নিকট আসিল। সর্ব্বশরীর তাহার কালো হইয়া গিয়াছিল। পাঁচদিন ধরিয়া অসীম যন্ত্রণায় সে বিছানায় গড়াগড়ি দিল। শুধু মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিত, "আমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্, মেরে ফেল্ আমাকে!"

স্ত্রী ডাক্তার ডাকিল। ডাক্তার আসিয়া জানাইলেন যে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে, এখানে চিকিৎসা হওয়া সম্ভবপর নয়।

হাসপাতালের কথা শুনিয়া ভ্লাসব চীৎকার করিয়া উঠিল, "বেরোও পাজী বদমায়েস; আমি কোথাও যেতে চাই না—এইখানেই মরবো!"

ডাক্তার চলিয়া গেলে, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে স্ত্রী কাতর নিবেদন করিল, "হ্যাগা, চলনা হাসপাতালে!"

"খবরদার বলছি, হাসপাতালে পাঠাস্ নি! হয়ত আমি সেখানে সেরে উঠতে পারি, আর তাতে তোরই বিপদ্ বেশী!"

ভোরবেলা সে দেহত্যাগ করিল। ঠিক তখন কারখানার বাঁশী বাজিতেছিল। অন্য সব মজুরেরা তখন প্রতিদিনকার অভ্যাসে কারখানার দিকে আগাইয়া চলিতেছিল। যখন তাহাকে কবর দেওয়া হয় তখন সেখানে তাহার স্ত্রী, তাহার পুত্র এবং কুকুরটী ছাড়া একজন বৃদ্ধ মাতাল, একটী দাগী চোর ও সেখানকার কয়েকজন ভিখারী উপস্থিত ছিল। স্ত্রী কাঁদিতেছিল, কিন্তু পুত্রের চোখে অশ্রুর বাষ্পও ছিল না। রোরুদ্যমানা স্ত্রীর দিকে চাহিয়া সমাগত লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, "ভ্লাসব মরেছে, না মাগীর হাড় জুড়িয়েছে।"

কবরের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেই নিঃস্তব্ধ প্রান্তবে শুধু একটি প্রাণী পড়িয়া রহিল। সদ্য-খোঁড়া মাটীর উপব বসিয়া কুকুবটী মাটীতে মুখ রাখিয়া গন্ধেব মধ্য দিয়া কাহার সন্ধানেব জন্য তখনও বসিযাছিল।

পিতার মৃত্যুব দুই সপ্তাহ পবে একদিন রবিবাব প্যাভেল রীতিমত মাতাল হইয়া বাড়ীতে ফিবিল। কোনও রকমে হামাগুড়ি দিয়া যেখানে বসিয়া তাহাব বাবা আহাব কবিত, ঠিক সেইখানে বসিয়া টেবিলের উপবে জোরে ঘুষি মাবিয়া ঠিক তাহাব বাবা যেমন কবিয়া চীৎকাব করিত তেমনিভাবে চীৎকার কবিয়া বলিয়া উঠিল, "খাবার নিয়ে আয়!"

পুত্রের চীৎকার শুনিয়া মাতা ধীবে ধীবে পুত্রের পাশে গিয়া বসিয়া তাহাকে বুকে টানিযা লইলেন। মাতার এই আদরে পাভেল আরও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, এবং মার হাত তাহার ঘাড় হইতে জোরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "শিগ্‌গির খাবার দে শিগ্‌গির!"

শান্ত স্নেহসিক্ত কণ্ঠে পুত্রেব হাত ধরিয়া মা শুধু বলিলেন, "দুষ্ট ছেলে!"

মার দিকে না চাহিয়াই জড়িত কণ্ঠে পাভেল বলিল, "আমি তামাকও খাব, বাবার পাইপটা আমাকে এনে দে!"

জীবনে এই প্রথম সে মদ খাইয়াছে। তীব্র মদিরা তাহার সর্ব্বদেহকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল কিন্তু তখনও তাহার চৈতন্য

হারায় নাই। তাহার মাথার ভিতরে কে যেন তখন অনবরত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মদ? মদ খেয়েছ? মাতাল হয়েছ?"

মার আদরে সে আরও অসোয়াস্তি বোধ করিতেছিল। মার চোখের দিকে চাহিতেই, সেই বিষণ্ণদৃষ্টি তাহার মর্ম্ম-মূলে যেন বিঁধিতে ছিল। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু উদ্বেলিত কান্নাকে চাপিবার জন্য, যতখানি না মাতাল হইয়াছিল সে তাহার বেশী ভান করিতে লাগিল।

পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা বলে, "কেন তুই এ কাজ করলি? তোর কি এ কাজ করা উচিত ছিল?"

পাভেলের শরীর ঝিমাইয়া আসিতেছিল। সে ভীষণভাবে ন্যাকার করিতে লাগিল। তারপর অবসন্ন হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল দূর হইতে যেন তার মা বলিতেছে,—

"তুই যা আমাকে খাওয়াবি, তা বুঝতে পারছি!"

চোখ বন্ধ করিয়াই সে উত্তর দিল, "কেন, সবাই তো মদ খায়?"

পুত্রের উত্তর শুনিয়া মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সে ঠিকই বলিয়াছে, সবাই তো মদ খায়! তিনি খুব ভাল রকমই জানিতেন যে সরাইখানা ছাড়া জগতে এমন কোনও যায়গা নাই যেখানে এরা বুকের জ্বালা জুড়ায়, 'ভড্‌কার' আস্বাদ ছাড়া এমন কোনও আনন্দের স্বাদ নাই যে তাহাদের জীবনকে ক্ষণিকের জন্য ভরিয়া তোলে। তবুও তিনি বলিলেন, "সবাই খায় বলে, তুইও খাবি? তোর বাবা যে তোদের দুজনের হয়ে খেয়ে গেছে! কত যে সয়েছি! একবার অভাগী মার দিকে ফিরে চা—দেখবি তোর আর খেতে প্রবৃত্তি হবে না—"

মার শান্ত স্নেহ-কোমল কথায় পাভেলের মনে পড়িল যতদিন তাহাব বাবা বাঁচিয়াছিল ততদিন মার অস্তিত্বের কোনও খবর কেহ যেন পাইত না। একান্ত নীরবে তিনি যেন সর্ব্বদাই অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন কখন অতর্কিত প্রহারেব পালা আরম্ভ হইবে। ইদানীং বাবাব সঙ্গে যাহাতে দেখা সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য পাভেল বাড়ীতে খুব অল্প সময়ই থাকিত। এই সমস্ত কারণে তাহাব মন হইতে মার কথা একবকম দূবে সবিযাই গিযাছিল।

একটু সুস্থিব হইয়া পাভেল বহুদিন পবে মাব মুখের দিকে চাহিল। বহুদিনের পরিশ্রমে তাঁহাব দীর্ঘ দেহ নুইয়া পড়িয়াছে। চোখেব কোলে কোলে বিষাদেব ছাযা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। গ্রামেব অন্য সমস্ত নারীদের চোখেব কোলেও এই একই ছায়া। ঘন-কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের মধ্যে এক এক জায়গা শাদা হইয়া গিয়াছে, মনে হয় যেন কাহারও বজ্রমুষ্টির ছাপ এখনও রহিয়া গিয়াছে। পাভেল দেখিল মার চোখে জল।

"আঃ, কেঁদো না, দাঁড়াও, একটু জল দাও দেখি?"

"দাঁড়া, একটু বরফ জল এনে দিচ্ছি!"

ববফ জল লইয়া যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন দেখেন পাভেল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দে ঝুঁকিয়া পুত্রের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে পেয়ালাটী টেবিলে রাখিয়া ঘরের এক কোণে ক্রুশবিদ্ধ মহাপুরুষের যে বিমলিন ছবিটী টাঙ্গানো ছিল, তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া নীরবে শুধু অশ্রুজলে পুত্রের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা জানাইলেন।

বাহিরে তখন অন্ধকারে নষ্ট-জীবনের নিশীথ-উন্মাদনার শব্দ

উঠিতেছে। শরতের কুয়াসা-আচ্ছন্ন বাতাসে দূর হইতে একটা ভাঙ্গা সেতারের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। কোথাও তার-স্বরে কেহ চীৎকার করিয়া গান গাহিতেছে, কেহ বা অবিশ্রান্ত কুৎসিত গালাগাল বকিয়া চলিয়াছে। আব তাহাব মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের তিক্ত অভিশাপ-বাণী নিশীথ অন্ধকারকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছে।

নিতান্ত একঘেয়ে ভাবে কোনও রকমে মাতা-পুত্রের জীবন বহিয়া চলিয়াছিল। গ্রামের অন্য সমস্ত ছেলে যেমনভাবে দিন কাটায় ঠিক সেই রকম ভাবেই পাভেল তাহার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করে। গ্রামের অন্য সব ছেলেদের দেখাদেখি সেও একটা বাজনা কিনিল, ছুটির দিন বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য একটা ছড়ি, নেকটাই, ওভার স্থও কিনিল। সরাইখানার সান্ধ্য-সমিতিতে এখন সে নিয়মিত যাতায়াত করে এবং সেখানে নাচিতেও শিখিল। ছুটীর দিনে রাত্রে সে মাতাল হইয়াই বাড়ীতে ফিরে এবং যন্ত্রণায় ছটফট করে। সকাল বেলা বুক জ্বালা করে, মুখ ফ্যাকাসে হইয়া যায়, মাথা তুলিবার আর ক্ষমতা থাকে না।

একদিন সকাল বেলায় মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, কাল রাত্রে কেমন ছিলি ?"

বিরক্ত হইয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, "মনে হচ্ছে যেন একটা মস্ত কবরের মধ্যে বসেছিলাম—উঃ, কিছু আর ভাল লাগে না—মানুষগুলো সব যেন এক একটা কলকব্জা! নাঃ, এবার ছুটীর দিন মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়বো, না হয় একটা বন্দুক কিনবো!"

কিন্তু মাছধরা অথবা শীকার করা কোনটাই তাহার হইয়া উঠে নাই। তবে যত দিন যাইতে লাগিল ততই সে প্রতিদিনের বাঁধা পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সরাইখানার সান্ধ্য-সমিতিতে তাহাব গতায়াত ক্রমশঃ কমিযা আসিতে লাগিল। ছুটীর দিনে সে বাহিবে কোথায চলিয়া যাইত, কিন্তু বেশ সুস্থ অবস্থাতেই বাড়ী ফিরিত। মা বিস্মিত হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। দেখিতেন তাহাব মুখের রেখাগুলি যেন ক্রমশঃ বদলাইয়া আসিতেছে, চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটিয়া উঠিত, মা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু পারিতেন না। পাভেলের মুখ দেখিয়া মনে হইত সে যেন কাহারও উপর ভয়ানক রাগিয়া আছে, অথবা তাহার বুকের কোথাও কোনও ভীষণ ক্ষত যেন তাহার দেহের সমস্ত রক্ত শুষিয়া লইতেছে। পুরাণো বন্ধুরা তাহার অদর্শনে তাহাকে ডাকিয়া লইতে প্রথম প্রথম তাহার বাড়ীতে আসিত, কিন্তু বাড়ীতে তাহাকে বারেবারে না পাওয়ার দরুণ, তাহারাও আসা বন্ধ করিয়া দিল।

ছেলের মতিগতি ফিরিয়াছে দেখিয়া মার মনে আনন্দ হইত। কিন্তু সেই সঙ্গে কোথা হইতে তাঁহার মনে এক অজানা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিত। পুত্রের মতিগতি যে ফিরিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন কিন্তু যেন কোন্ এক দুরধিগম্য রহস্যময় পথে সে চলিয়াছে—সে পথের কোন দিশাই তিনি ঠিক করিতে পারিতেন না।

ইদানীং বাড়ী ফিরিবার সময় সে প্রত্যহ সঙ্গে করিয়া নানারকমের বই লইয়া আসে। প্রথমে সে লুকাইয়া লুকাইয়া পড়িত এবং পড়া শেষ হইয়া গেলে বইগুলি লুকাইয়া রাখিয়া দিত। মাঝে মাঝে বই

হইতে গোপনে কাগজে সে কি লিখিয়া লইত এবং লেখা কাগজখানিও লুকাইয়া রাখিত।

মাঝে মাঝে মা জিজ্ঞাসা করেন, "হারে, পাভলুসা, তোর কি কোন অসুখ করেছে ?"

মাথা নাড়িয়া পাভেল বলে, "কই, না, মা।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলেন, "রোজ রোজ রোগা হয়ে যাচ্ছিস্!" —এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হয়।

যত দিন যায়, মাতাপুত্রে কথাবার্ত্তা তত কমিয়া আসে। সকালে নিঃশব্দে চা খাইয়া সে কাজে চলিয়া যায়—দুপুর বেলার খাবার সময় দুই একটা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা ব্যতীত সে আর কোনও কথা বলিত না। রাত্রে কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গা হাত পা ধুইয়া তেমনি নীরবে আহার সমাপন করিয়া সে আপনার বইপত্র লইয়া বসিত, ছুটীর দিন ভোর না হইতেই সে বাড়ী হইতে বাহির হইত এবং গভীর রাত্রে ফিরিত। মা ভাবিতেন ছেলে শহরে থিয়েটারে যায়। ইদানীং মা দেখিতেন যে পাভেল প্রায়ই এমন সব ভাষা ব্যবহার করে, যাহা ইহার পূর্ব্বে তিনি কোনও দিন আর শোনেন নাই এবং যার অর্থও তিনি বুঝিতে পারেন না। সবার চেয়ে তাঁহার নজরে বেশী পড়িল যে আগে তাহার কণ্ঠস্বরে একটা কর্কশতা ছিল, তাহা যেন কেমন কোমল নমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আগে গ্রামের ছোকরাদের মত বাবু সাজিতে পাভেল ব্যস্ত থাকিত, এখন মা দেখিলেন যে বাবুয়ানির দিকে আদৌ তাহার লক্ষ্য নাই অথচ পোষাক-পরিচ্ছদ সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। পাভেল যত কোমল হয়, যত সহজ ও সরল হয়, মার মন ততই কি এক অজানা আশঙ্কায় দুলিয়া দুলিয়া উঠে।

একদিন সে একটী ছবি আনিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইল। ছবির দিকে চাহিয়া মা দেখিলেন যে, তিনজন লোক ধীর গম্ভীর ভাবে চলিয়াছে, চলিতে চলিতে কি কথা বলিতেছে।

মার বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে পাভেল বলিল, "মৃত্যুর ওপার থেকে যিশু নব-জীবন লাভ করেছেন—"

যিশুর মুখের দিকে চাহিয়া ছবিটী মার ভাল লাগিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনে এক বিরাট ভাবনার উদয় হইল, "একি রকম! যিশুকে যে এত ভালবাসে, সে কেন গির্জ্জায় যায় না একদিনও?"

ক্রমে দেওয়ালে একটার পর একটা করিয়া ছবি ভরিয়া উঠিল। বই্এর থাকে খালি যায়গাগুলিও ভরিয়া উঠিল। ইঁট-কাঠের দেয়ালের বেড়া ঘর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

কিন্তু মার মনের আশঙ্কা আর কমিল না। যতদিন যায়, পাভেলের গতিবিধি, হাবভাব তাঁহার নিকট ততই রহস্যময় লাগে এবং তাঁহার অন্তর এক অজানা আশঙ্কায় ততই দুলিয়া দুলিয়া উঠে। এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কোনও সন্ধান না করিতে পারিয়া মনে মনে তিনি ভাবেন, "আর সকলে কেমন মানুষের মত হাসে খেলে, এ এক কোন্ সন্ন্যাসী, এই বয়সে নির্ব্বাক গম্ভীর!" মাঝে মাঝে মার মনে আর একটা কথা জাগিয়া উঠে, হয়ত সহরে কোনও মেয়ের সঙ্গে পাভেল প্রেমে পড়িয়াছে—

কিন্তু মা ভালরকমই জানিতেন যে প্রেম করিতে অর্থের প্রয়োজন আছে। পাভেল যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, সমস্তই তো তাঁহাকে ধরিয়া দেয়। তবে?

এমনি করিয়া দিনের পর দিন চলিয়া যায়। এমনি করিয়া

নিঃশব্দে কখন দুইটী জীবনের ধারা দীর্ঘ দুই বৎসর বহিয়া চলিয়া গেল। কেহ কাহাকেও জানিল না। শুধু মার অন্তরে পথ-হীন রেখা-হীন ভাবনার বোঝা জমা হইয়াই রহিল।

একদিন খাওয়া-দাওয়ার পর পাভেল নিত্য যেমন আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসে তেমনি পড়িতে বসিয়াছিল।

অতিসন্তর্পণে পুত্রের পিছনে আসিয়া একটু ঝুঁকিয়া মৃদুকণ্ঠে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোকে জিজ্ঞাসা করি, এ সব কি তুই রোজ পড়িস্ ?"

মার মুখের দিকে চাহিয়া বই বন্ধ করিয়া দিয়া পাভেল বলিল, "এখানে বসো, বলছি !"

পুত্রেব ইঙ্গিতে মা সম্মুখে আসিয়া বসিলেন, অন্তরে গুরু আশঙ্কা, এখনই বুঝি ভয়ানক কি শুনিবেন—

মার মুখের দিকে না চাহিয়াই পাভেল বলিতে লাগিল, "আমি যে সমস্ত বই পড়ি, সে সমস্ত পড়া বা কাছে রাখা নিষিদ্ধ। কেন নিষিদ্ধ জান ? তোমার আমার, আমাদের চারিদিককার এইসব শ্রমিকদের জীবনের সম্বন্ধে সত্যি কথা এই সব বই-এ লেখা আছে—তাই এ নিষেধ ! গোপনে এ সমস্ত ছাপা হয়, গোপনে বিলি হয়, যদি কারুর কাছে এই সমস্ত বই পাওয়া যায়, তাহলে তক্ষুণি তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। আমাকেও কারাগারে যেতে হবে—কারণ আজ আমি সত্যকে জানতে চাই—'

সহসা মার সমস্ত নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। কোনও মতে চোখ তুলিয়া ছেলের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন —তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুত্রের বদলে

যেন কে একজন নূতন লোক বসিয়া আছে—তাহাকে ইহার পূর্ব্বে তিনি যেন আর কখনও দেখেন নাই।

"তুই কেন এসব পড়িস্?"

"আমি সত্যকে জান্‌তে চাই!"

পাভেলেব মুখেব দিকে তিনি আবও ভাল করিয়া চাহিলেন। তাহাব চক্ষু হইতে স্থির জ্যোতি বাহিব হইতেছিল। সেই মুখের দিকে চাহিয়া জননীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তিনি বুঝিলেন যে তাঁহাব পুত্র যেন কোন্ এক রহস্যময় ভয়াল শক্তির নিকট চিবকালের মত আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহাকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তিনি স্বীকার কবিয়া আসিয়াছেন। কোন কিছু চিন্তা না করিয়া সেই ভবিতব্যতাব নিকট আত্মসমর্পণ কবাই তিনি জানিতেন। তাই আজও তাঁহাব কোনও কথা জোগাইল না। বেদনার গুরুভার অন্তরে চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"কাঁদছো কেন, মা?"

পুত্রেব প্রশ্ন শুনিয়া মাব মনে হইল, বিদায়ের কালে পুত্র যেন শেষ প্রশ্ন কবিতেছে!

"একবার ভেবে দেখো, কি রকমভাবে তুমি বেঁচে আছ! তোমার আজ চল্লিশ বছর বয়স হলো কিন্তু বলতো একদিনও তুমি বাঁচার মত করে বাঁচতে পেরেছো? বাবা তোমাকে নিয়তই মারতেন—তার কারণ অবশ্য আজ আমি বুঝতে পেরেছি। তাঁর নিজের জীবনে যে সব দুঃসহ অবিচার ও অত্যাচার সইতে হতো, নিরুপায় হয়ে তিনি তোমার উপর তারই প্রতিশোধ নিতেন। তিরিশ বছর ধরে

ক্রমান্বয়ে ভূতের মত খেটে চলে গেছেন। যখন ছেলেবেলায় তিনি কারখানায় ঢোকেন তখন কারখানায় মাত্র দুটো বাড়ী ছিল, আজ সেখানে সাত সাতটা বাড়ী উঠেছে। এমনিই হয়, কল বাড়ে, কারখানা বাড়ে, আব তারই চাকায় তেল জোগাতে মানুষ মরে।”

যৌবনের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বাধাবন্ধহারা ভাবে আপনার সত্য অনুভূতির প্রথম প্রকাশ-আনন্দে পাভেল অন্তরের অন্তঃস্থলে যাহা আসিতেছিল তাহাই আজ বলিয়া চলিতে লাগিল। সে যে বিশেষ করিয়া তাহার মাকে উপলক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতেছিল, তাহা নয়, আপনার অন্তরের সদ্যজাত সত্য-উপলব্ধিকেই সে রূপ দিতেছিল।

সহসা মার মুখের দিকে চাহিয়া পাভেল জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, বলতো মা, জীবনে কোনও দিন তুমি এতটুকু আনন্দের স্বাদ পেয়েছ? পেছন দিকে চাইলে কোন আনন্দের স্মৃতি তোমাব মনে পড়ে?”

সমগ্র নারী-জীবনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই তিনি শুনিলেন যে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে, তাঁহার আনন্দ-নিরানন্দ সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিতেছে। অসংলগ্ন অস্পষ্ট ভাবনার মেঘলোকে বহুদিনের তন্দ্রাচ্ছন্ন বেদনার বিদ্যুৎ যেন নড়িয়া উঠিল; বহুদিন-বিস্মৃত কবেকার যৌবনের লাঞ্ছিত জীবনের মূক বিদ্রোহ আজিকার দিনকে ঈষৎ সচকিত করিয়া তুলিল। কতদিন কত প্রতিবেশী রমণীর সঙ্গে তিনি ঘরকন্না, জীবন-মরণ কত কি লইয়া কত গল্প করিয়াছেন—সবাই দুঃখ করিত, কাঁদিত, কিছুই ভাল লাগে না বলিত, কিন্তু কৈ কেহই তো কোন দিন ভাবে নাই, কেন এই দুঃখ, কেন এই কান্না, কেন জীবনে এত জ্বালা?

আজ সহসা তাঁহার আপন পুত্রের মুখে তাঁহার নারী-জীবনের গোপন-ব্যথার কথা এই রকম ভাবে শুনিয়া পুত্র-গর্ব্বে তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। আজকালকার জগতে মার বেদনা কে বোঝে, কে বুঝিতে চায়? পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার মুখ, চোখ, কথা যেন তাঁহার বুককে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুই কি করতে চাস্?"

"আমি জানতে চাই—জানাতে চাই। আমাদের আজ শিখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সব মজুরদের শেখাতে হবে—তাদের বোঝাতে হবে—কেন জীবন এত নিদারুণ!"

অন্তরের আবেগে সে অনর্গল বকিয়া চলিতে লাগিল। পুত্রের মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া মা শুধু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন, "সত্যি! এ সব কি সত্যি?"

"নিশ্চয়ই! জগতে এমন লোকও আছে, যারা মানুষের কল্যাণ চায় এবং সেই মহা-অপরাধের জন্য তারা হাসি মুখে সব লাঞ্ছনা সব ক্ষতি সহ্য করে, কারাগারে বনের পশুর মত পচে মরে। আমি স্বচক্ষে তাদের দেখেছি—তারা এই মাটীর পৃথিবীর অমর সন্তান!"

কিন্তু এই সমস্ত লোকদের কাহিনী যতই তিনি শোনেন ততই তাঁহার মন ভয়ে ভরিয়া উঠে। তাহারাই তাঁহার পুত্রকে এই সমস্ত ভয়ানক কথা বলিতে শিখাইয়াছে, তাহারাই তাঁহার সন্তানকে মাতৃ-বক্ষ হইতে টানিয়া লইয়া কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য ভয়ঙ্কর পথে লইয়া চলিয়াছে।

"তোর যা ইচ্ছে তাই কর। তবে একটা কথা বলি—কখনও বেফাঁস কোথাও কিছু বলিস্ না। তুই জানিস্ না ওরা কি ভয়ানক লোক সব। ওরা সবাই সবাইকে ঘৃণা করে। আঘাত করাই ওদের একমাত্র আনন্দ। ওদের যদি তুই বোঝাতে যাস্, ওদের যদি ভাল কর্‌তে চাস্, ওবা তোকে অবিশ্বাস করবে, তোকে টুক্‌রো টুক্‌রো কবে জবাই করে তবে শান্তি পাবে। ওদেব তুই জানিস্ না—"

"আমি জানি ওরা কতদূর ঘৃণ্য। কিন্তু যেদিন আমি আমার অন্তরে সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছি, সেদিন থেকে এই পৃথিবী আমাব চোখে স্থন্দরতর হয়ে উঠেছে। ছেলেবেলা থেকে আমি মানুষকে ভয়ই করে এসেছি—যখন বড় হলাম তখন তাদের নীচতা দেখে তাদের ঘৃণাই করতে শিখলাম। তারপর জানি না, কেমন করে আমার সব ধারণা বদলে গেল! আজ আমি মানুষকে আর এক নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছি। আজ সকলের জন্যে, সকলের সব ক্ষুদ্রতার জন্যে শুধু আমার দুঃখ হয়! বেদনায় মন ভরে আসে। যেদিন থেকে আমি অন্তবে সত্যকে উপলব্ধি কবেছি সেদিন থেকে মনে হয়েছে, এই ক্ষুদ্রতা, এই নীচতাব সবখানির জন্যে তাবা দায়ী নয়!"

আপনার মনের মধ্যে যে সব বাণী জাগিয়া উঠিতেছিল, যেন তাহা শুনিবার জন্য সহসা পাভেল স্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর অস্ফুট স্বরে আপনার মনে বলিয়া উঠিল—"এমনি ভাবেই সত্য বেঁচে থাকে!"

রাত্রি সুগভীর হইয়া আসিয়াছিল। পাভেল শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রিত পুত্রের সম্মুখে আসিয়া অন্তরের দেবতার নিকট কল্যাণ কামনায় মাতার চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আবার নিঃশব্দে তাহাদের দুইজনের জীবন-ধারা বহিয়া চলে। কাছাকাছি থাকিয়াও তাহাদের মনে হয় যেন তাহারা বহুদূরে আছে।

একদিন বাহিরে যাইবার সময় পাভেল মাকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, শনিবার এখানে জনকয়েক লোক আসবে?"

"কারা?"

"কতক লোক আমাদের এই গাঁয়ের, আর কতক আসবে শহর থেকে।"

"শহর থেকে?—"বলিতেই মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"একি, কাঁদছো কেন?"

"কেন তা জানি না—কান্না আসে তাই কাঁদি!"

"তুমি ভয় পেয়েছ, বুঝি?"

কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া মা বলিলেন, "সত্যিই আমার ভয় করে, শহরের লোকগুলো—কে জানে কেমন তারা—"

মাতার মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে পাভেল বলিয়া উঠিল, "দেখো মা, এই ভয়ই হলো আমাদের সকল সর্ব্বনাশের মূল। যারা আমাদের পায়ের তলায় রাখে—তারা আমাদের এই ভয়-পাওয়ার সুবিধে নিয়েই আমাদের আরও ভয় দেখায়। মনে রেখো মা, যতদিন আমরা এমনি করে শুধু ভয় করেই থাকবো—ততদিন এঁদো পুকুরে শুকনো ডালের মত পচেই মরতে হবে। আজ সব ভয় দূরে ফেলে দেবার দিন এসেছে। আজ কি আর কান্না শোভা পায়?"

ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যাইবার সময় পাভেল বলিয়া গেল, "ভয়ই কর, আর যাই কর, তারা শনিবার এখানে আসবে।"

যাইবার সময় শুনিল মা কাঁদিয়া বলিতেছেন, "ওরে রাগ করিস্ নে—এ ছাড়া আর আমি কি করতে পারি বল।"

তিনদিন ধরিয়া মার মনে এক মুহূর্ত্তেরও শান্তি ছিল না। সেই অজানা আগন্তুকদের আগমন-আশঙ্কায় তাঁহার বুক ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠে। তাহাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের এক ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মার মনে জাগিয়া উঠে। তাহারাই তো তাহার পুত্রকে এই সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইতেছে।

শনিবার দিন সন্ধ্যাবেলা কারখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পোষাক বদলাইয়া বাহিরে যাইবার সময় পাভেল বলিল,

"দেখ, তারা যখন আসবে, তাদের বলো যে আমি একটু কাজে বেরিয়েছি। এক্ষুনি ফিরে আসবো—আর দেখো, মিছিমিছি ভয় করো না—তারা সবাই তোমার মত, আমার মত মানুষ—আর কিছু নয়!"

পুত্রের কথা শুনিয়া মা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

মার অবস্থা দেখিয়া পাভেল শান্তভাবে বলিল, "দেখছি, তোমাকে অন্য জায়গায় রেখে আসতে হবে।"

পুত্রকে ছাড়িয়া অন্য জায়গায় থাকার কথায় মা অন্তরে ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন,

"তাতেই বা কি লাভ? আমি এখানেই থাকবো!"

তখন নভেম্বর মাস শেষ হইয়া আসিতেছিল। সারা দিন ধরিয়া মুহ্যমান ধরণীর উপর দিয়া তুষারের ঝঞ্ঝা বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই মার মনে হইল যে পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার যেন তাঁহারই জানালার আশে পাশে আজ জমা হইয়া

আছে। সেই অন্ধকারে যেন অসংখ্য লোক, অদ্ভুত তাহাদের চেহারা, হামাগুড়ি দিয়া তাঁহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

এমন সময় বাহিরে বাঁশীর শব্দ হইল—করুণ, কোমল। সে স্বর যেন অন্ধকারের অরণ্যানী ভেদ করিয়া কাহার সন্ধানে চলিয়াছে। ক্রমশঃ শব্দটী আগাইয়া আসিতে আসিতে সহসা জানালার ধারে আসিয়া যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে দরজার নিকট পায়ের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। বিহ্বল হইয়া মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। প্রথমে একটা বৃহৎ টুপীওয়ালা মাথা দরজার ফাঁক দিয়া ঢুকিল, তারপর সেইটুকু ফাঁক দিয়া একখানি রোগা শরীর সোজাভাবে ঘরে আসিয়া নীরবে ডান হাতটী তুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,

"নমস্কার!"

মা নীরবে অভিবাদন গ্রহণ করিলেন।

"পাভেল এখনও ফেরেনি বুঝি?"

কোনও অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই আগন্তুক যুবকটী আপনার মনে ওভারকোটটী খুলিয়া রাখিয়া গা হইতে বরফ ঝাড়িয়া ঘরের চারিদিকে দেখিতে লাগিল।

"একি আপনাদের নিজেদের বাড়ী, না ভাড়া নিয়েছেন?"

"ভাড়া নিয়েছি।"

"তেমন সুবিধের বাড়ী নয় তো?"

সে কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া মা বলিলেন, "একটু বসো, পাভেল এক্ষুণি আসবে!"

"তাতে কি হয়েছে! বস্‌বো তো নিশ্চয়ই!"

আগন্তুকের কোমল কণ্ঠস্বর এবং সরল অমায়িকতায় মার মনে একটু সাহসের সঞ্চার হইল। যুবকটীর দিকে চাহিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করেন, নাম কি, কোথায় থাকে, কতদিনই বা পাভেলের সঙ্গে আলাপ। মা প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই সহসা যুবকটী প্রশ্ন করিয়া বসিল,

"তোমার কপালে কাটার দাগ কেন, মা?"

মানুষের কণ্ঠে যতখানি কোমলতা ও করুণা থাকা সম্ভব, ঠিক ততখানি করুণ-কোমলতায় আগন্তুক এই প্রশ্ন করিয়াছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাতে তিনি অপমানিত বোধ করিলেন। ক্রুদ্ধ স্বরে বলিতে গিয়া ঈষৎ সংযত হইয়া তিনি বলিলেন,

"তাতে তোমার কি প্রয়োজন?"

তেমনি সহজ ও নির্ব্বিকার চিত্তে যুবক বলিয়া উঠিল, "রাগ করো না মা! কেন জিজ্ঞেসা করলাম, জানো? যে মা আমাকে পালন করেছিল, তারও কপালে ছিল ঐ রকম একটা দাগ। তাঁর স্বামীটি ছিলেন মুচি আর সে ছিল ধোপানী। একদিন রাগের মাথায় জুতো-শেলাই-করা একটা যন্ত্র দিয়ে সে-লোকটা মার কপালে ঐ রকম দাগ করে দেয়। নিত্যই সে লোকটা মাকে মারতো আর রাগে আমার সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠতো!"

সহসা যুবকের এই কুণ্ঠাহীন আত্মপ্রকাশে তাহার উপর যে তিনি রাগিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না, রাগ করিনে বাছা তবে, তবে কিনা তুমি বড় শিগ্‌গির প্রশ্নটা করে ফেল্লে কিনা! আমার এই দাগ এ আমার

স্বামীর পুণ্য-স্মৃতি! তিনি এখন স্বর্গে—সে অনেক দিনের কথা—বাছা, তুমি কি তাতার?"

"এখনও তাতার হই নি!"

"তবে, তুমি?"

"আমি লিটল্ রাশিয়ান্—আমাব বাড়ী কেনিয়াভ শহরে।"

"কতদিন হল এখানে আসা হয়েছে?"

"একমাস হলো আপনাদের কারখানা দেখতে আম এখানে আসি। সেখানে কতকগুলি ভালো লোকেব সঙ্গে পরিচয় হয়। তাব মধ্যে আপনাব ছেলেও ছিল। এখানে হয়ত আবও কিছুদিন থাকতে হবে।"

আগন্তুকেব মুখে পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া মার অন্তর গলিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"একটু চা খাবে কি?"

"বাঃ, আমি একা একা খাবো কি করে? ওরা সবাই আসুক—তখন আপনার হাতের চা সবাই মিলে খাবো?"

আরও অনেকে আসিবে এই কথা মনে পড়িতেই মার মন আবার আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিল। মনে মনে অন্তর্যামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে প্রভু, তারা যেন সবাই এরই মত হয়!"

আবার বাহিরে পদশব্দ হইল। এবারে যে আসিল, সে নারী। অতি সামান্য পোষাক, মাঝামাঝি গড়ন—মাথায় এক রাশ ঘন কালো চুল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে বলিল,

"দেরী হয়ে গেছে বুঝি!"

লিটল রাশিয়ান বলিল, "না। হেঁটে এলে বুঝি?"

"নিশ্চয়ই। আপনি বুঝি পাভেলেব মা। নমস্কাব। আমাব নাম জানেন না তো? আমাব নাম নাটাশা।"

মেয়েটীব কণ্ঠস্ববেব পবম আত্মীযতায় মাব মন শান্ত হইল।

মেযেটীব গা হইতে ববফ ঝাডিযা দিতে দিতে লিটল্ বাশিয়ান জিজ্ঞাসা কবিল। "বাইবে ভযানক ঠাণ্ডা—না?"

"ওঃ—ঠাণ্ডা বলে ঠাণ্ডা। আব কি হাওযা দিচ্ছে, উঃ—"

ঠাণ্ডায় তুই হাত দিযা তুই কপোল ঘসিতে লাগিল। মা তাডাতাডি বলিযা উঠিলেন, "আহা, বাছা, একটু আগুন কবে দি, কেমন?" বলিয়াই তিনি বান্নাঘবে চলিযা গেলেন।

বান্নাঘবে আসিয়া মেযেটীব মুখ মনে কবিতেই মাব মনে হইল যেন মেয়েটী তাঁহাব বহুকালেব পবিচিত। আপনাব প্রবাসী কন্যা যেন বহুকাল পবে ঘবে ফিবিয়া আসিয়াছে। আগুন তৈযাবী কবিতে কবিতে মা শুনিতে লাগিলেন, পাশেব ঘবে তাহাবা কথা বলিতেছে—

মেযেটী জিজ্ঞাসা কবিতেছে, "তোমাকে কেমন বিষণ্ণ মনে হচ্ছে, নাখোদকা।"

লিটল্ বাশিয়ান উত্তবে বলে, "পাভেলেব মাব চোখ দেখে আমার নিজের মার কথা মনে পডছে। মনে হচ্ছে—তাঁবও ঠিক ঐ বকম চোখ ছিল। আমাব বিশ্বাস কি জানো, আমাব মা এখনও বেঁচে আছেন—"

"তুমি না বলেছিলে তোমাব মা মাবা গেছেন?"

"যে-মা আমাকে পালন করেছিল সে মাবা গিয়েছে। আমাব নিজেব গর্ভধারিণী—তাঁব কথা এখন আমাব মনে হচ্ছে—হয়ত এই

কিন্তু শহরের কোন্ অন্ধকার গলিতে মা আমার ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে —ভিক্ষে করে যা পায় তাই দিয়ে মদ খায়—"

"আঃ—ওরকম করে কেন ভাব্‌চো ?"

"জানি না। হয়ত বেহুঁস হয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছে। পুলিশ মারতে মারতে থানায় নিয়ে যাচ্ছে—।"

রান্নাঘরে মার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠে। আগুন তৈয়ারী করিয়া মা ঘরে আসেন। এমন সময় আবার পায়ের শব্দ। এবারে প্রবেশ করিল গাঁয়ের নামজাদা চোরের ছেলে নিকোলে। নিকোলেকে দেখিয়া মা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এখানে ?"

"পাভেল আছে ? এই যে তোমরা এসেছ—"

মা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দেখিলেন নাটাশা আগাইয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইল। তাহলে এও এ দলে আছে !

তারপরে আরও দুটী লোক আসিল—দুটী বালক। তাহাদের একটীকে তিনি আবার চিনেন। কারখানার দরওয়ানের ছেলে ইয়াকুব। অবশেষে আরও দুইটী পরিচিত লোককে লইয়া স্বয়ং তাঁহার পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিচিত লোক দুইটী তাঁহাদের কারখানারই কুলী ! সকলের মুখের দিকে চাহিয়া মার মনে হইল, ইহারা তো কেহই ভয়ানক নয় ! তবে পাভেল কেন তাঁহাকে মিছামিছি ওসব কথা বলিয়া ভয় দেখাইল ?

একটু আড়ালে পাইয়া ছেলেকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এদেরই ভয়ানক লোক বলে ?"

ঘাড় নাড়িয়া পাভেল বলিল, "এরাই ভয়ানক লোক !"

মমতায় সকলের দিকে চাহিয়া মা বলে, "মাগো, এরা যে সব দুধের বাছা!"

মা চা তৈবী করিতে লাগিলেন।

নাটাশা কথা বলিতে আরম্ভ কবিল। বলিল, "মানুষ কেন এত জঘন্য ভাবে জীবন যাত্রা পরিচালনা করতে বাধ্য হয়, তা বুঝতে হলে—"

লিটল্ রাশিয়ান বাধা দিয়া বলিল, "বল, মানুষ নিজে কেন এত জঘন্য হয়, তা বুঝতে হলে—"

"কি রকম ভাবে তারা জীবন আবম্ভ করে, সেটা দেখতে হবে প্রথমে—"

চা কবিতে করিতে সহসা মা বলিয়া উঠিলেন—"তাই দেখ্, বাছা তাই দেখ্!" সহসা সকলের কথা থামিয়া গেল। পাভেল বিস্মিত হইয়া কপাল কুঁচকাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছো, মা?"

অপ্রস্তত হইযা মা বলিলেন, "কিছু নয় বাবা, আমি নিজের মনে কথা বলছিলাম"—বলিয়াই তিনি চা পবিবেশন করিতে লাগিলেন। ছোট মেয়েটীব মত নাটাশা বলিযা উঠিল—"মাগো, তোমার বাড়ীতে তোমার ছেলে-মেয়েরা এসেছে—এতে আবার বাধার কি আছে? উঃ—বাবা—বড় ঠাণ্ডা—শিগ্গির দাও চা—"

নাটাশা এবং পাভেল হাসিয়া উঠিল। ব্যাপারটা চাপা দিবার জন্য লিটল্ রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "চমৎকার চা হয়েছে মা?"

"বা রে ছেলে, না খেয়েই বলে ভাল হয়েছে।" তারপর পুত্রের নিকটে গিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলেন, "তোদের কাজে বাধা দিলাম না কিরে?"

নাটাশা পড়িতে আরম্ভ করিল। অতি সন্তর্পণে মা কাপ আর ডিস নাড়িতে লাগিলেন—পাছে শব্দে তাহাদের কোনও অসুবিধা হয়। স্যামোভারেব অগ্নি-শিখার মথিত শব্দের সঙ্গে নাটাশার কণ্ঠস্বর মিশিয়া ঘরে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতেব সৃষ্টি করিল। নাটাশা পড়িতেছিল—প্রাচীনতম মানুষদের কাহিনী—যখন তাহারা বন্যপশু শিকার কবিয়া গুহায় গুহায় জীবন অতিবাহিত করিত—মা আনন্দিত চিত্তে সেই অপরূপ গল্প শুনিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে বিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—ইহার মধ্যে বে-আইনী কি আছে?

পাভেল নাটাশার পাশেই বসিয়াছিল। দলের মধ্যে সেই সব চেয়ে সুন্দর। নাটাশা বইএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল—মাঝে মাঝে হাত দিয়া ঝুলিয়া-পড়া চুলেব গোছাগুলি পিছন দিকে সরাইতে সরাইতে বিমুগ্ধ শ্রোতাদের দিকে চাহিয়া বইছাড়া দুই একটা কথা বলিতেছিল।

ঘরটার রূপ যেন বদলাইয়া গিয়াছে। যেন কোথা হইতে একটা অপরূপ স্বচ্ছন্দতা ফুলের মত অনাড়ম্বরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মার মন অজ্ঞাতসারে তাহাতে সায় দিয়া উঠিল। জীবনে তিনি সন্ধ্যার এই অপরূপ শান্তির স্পর্শ কখনও পান নাই। তাই আজিকার এই শান্ত সন্ধ্যার আনন্দ-স্পর্শ চরম দুঃখে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল—তাঁহার যৌবনের কোলাহল-ক্লেদাক্ত সন্ধ্যার কথা—নিঃশ্বাসে তাহাদের ভোড্‌কার তীব্র গন্ধ—মুখে কি কুৎসিত সব ভাষা—। এই সব, আরও অনেক কথা মার মনে জাগিয়া উঠিল। সহসা নিজের শতচ্ছিন্ন হৃদয়ের দিকে চাহিয়া নিজের জন্য এক অপরূপ করুণার বোঝা তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

মনে পড়িল, তাঁহার স্বামীর সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিন!—এক আড্ডায় তাঁহার সঙ্গে দেখা। উন্মাদ মাতাল হইয়া লোকটী হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া অন্ধকার দেয়ালে কোণ-ঠাসা করিয়া ধরিল—দেহের সমগ্র ভার দিয়া দেয়ালে ঠেলিয়া মদ্য-তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এই আমাকে বিয়ে করবি?"

মত্ত দানবের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে কি বৃথা চেষ্টাই না সেদিন করিতে হইযাছিল।

"চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, বলছি—নইলে জবাব দে আমার কথার—ন্যাকামো, ও সব ন্যাকামো খুব জানি—মনে মনে তো খুব খুসী—যাঃ, কাল তোদের বাড়ীতে ঘটক পাঠাবো বুঝলি?"

পরের দিন ঘটক আসিল! বিবাহ হইয়া গেল। সমস্ত দৃশ্য মনে করিতে, মার অন্তর হইতে একটী স্বগভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

......তখন আলোচনা তুমুল তর্কে পরিণত হইযাছে। প্রত্যেকেই তারস্বরে চেঁচাইতেছে এবং মার মনে হইল তাহারা সকলেই যেন রাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার কেহই কোন কুৎসিত কথা উচ্চারণ করিতেছে না এবং যে যেখানে ছিল সেইখানেই বসিয়া আছে।

মা শুনিতেছিলেন ছেলে বলিতেছে—"যারা আজ আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আমাদের চোখ বেঁধে রাখতে চাইছে তাদের আমরা জানিয়ে দিতে চাই, আমরা অন্ধ নই—পশুও নই। শুধু দুমুঠো অন্নের জন্যে এ জীবন নয়। আমাদেরও অধিকার আছে এই পৃথিবীতে মানুষের মতন মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার। আজ যারা

আমাদের এই দাসত্বে, এই প্রাণহীন জড়ত্বে, এই অবিরাম বোঝা দিয়ে বেঁধে রেখেছে, তারা জানুক যে তাদের বিদ্যাবুদ্ধি মেপে দেখবার মত শক্তি এখনও আমাদের লুপ্ত হয়নি। আর আত্মিক ধর্ম্মের কথা! আমরা এখনও সেদিকে তাদের ঢের উর্দ্ধে!……

মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তর্ক চলিল। বিদায়ের সময় নাটাশাকে কাছে লইয়া মা বলিলেন, "এই ঠাণ্ডায় অত পাতলা মোজায় কি চলে? একটা পশমের মোজা বুনে দেব, কেমন?"

আনন্দ-কলহাস্যের মধ্যে যে যাহার বিদায় গ্রহণ করিল।

পুত্রকে একান্তে পাইয়া মা বলিলেন, বড় ভাল লোক সব। লিটল রাশিয়ান ছেলেটীর মন বড় ভাল, আর মেয়েটী কেমন ফুটফুটে মেয়ে—ও কে রে?

ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে পাভেল উত্তর দিল, একজন শিক্ষয়িত্রী!

"খুব গরীব—না? এই ঠাণ্ডায় ওরকম পাতলা ছেঁড়া পোষাক পরে থাকলে যে অসুখ করবে—ওর কি আত্মীয়-স্বজন নেই?"

"আত্মীয়-স্বজন! আছে বৈ কি! তাঁরা সব মস্কো শহরে থাকেন। বাবা মস্ত বড় লোক—লোহার ব্যবসা আছে। ও এই আন্দোলনে যোগদান করেছে বলে ওর বাবা ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেবেলাটা আদরে যত্নে লালিতপালিত হয়েছে, যখনি যা চেয়েছে তাই পেয়েছে, আর আজ এই অন্ধকার রাত্রিতে এই ঠাণ্ডার মধ্যে চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে সে একলা চলেছে—"

মা অবাক হইয়া গেলেন। বলিলেন, "এই রাত্তিরে একা এখন চল্লো সেই শহরে?"

"হাঁ"

"ভয় করবে না ওর ?"

"না"

"আচ্ছা, এত রাত্তিরে যাবারই বা কি দরকার ছিল, ওতো অনায়াসে আজ রাত্তিরে আমার কাছে শুয়ে থাকতে পারতো ?"

"তা পারতো কিন্তু কাল সকালে যদি কেউ ওকে এখানে দেখতে পায় তাহলে বিপদ হবে !"

ভুলে-যাওয়া আশঙ্কার ছিন্ন সূত্র আবার মার মনে জোড়া লাগে। বলেন, "আচ্ছা, এতে বে-আইনী কি আছে ? এই তো আমি সব শুনলাম, এতে ভয় করবারই বা কি আছে ? কই, কেউতো একটাও অন্যায় কিছু করলো না !"

"আমরা যা করেছি, তাতে অন্যায় কিছু নেই, আমরা যা করবো, তাতেও অন্যায় কিছু থাকবে না। কিন্তু তবুও আমাদের জন্যে জেলের দরজা খোলাই রয়েছে। একথা তোমার জানা দরকার, মা !"

মার দুর্ব্বল দেহ কাঁপিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিল। বিহ্বলের মত তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্ করুন, তোরা কোনও রকমে বেঁচে যা !"

শান্ত কণ্ঠে পুত্র বলিল, "তোমার কাছে আজ আর লুকোবো না মা ! ভগবানও আমাদের বাঁচাতে পারবেন না। জেলে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের মুক্তি নেই। যাও রাত হয়েছে—আজ খাটুনিও হয়েছে অনেক—আমি ঘুমুতে চল্লুম—"

একা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া মা বাহিরের পথের দিকে চাহিয়াছিলেন। বাহিরে তখন গাঢ় অন্ধকারে ঝড়ে তুষারকণা উড়িতেছ।

বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা মার চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল, তুষার-ভবা এক বিরাট প্রান্তর! দুরন্ত বাতাস তুষাবের কণা লইয়া দুর্ম্মদ খেলায় বত। সেই তুষার আর ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া একা চলিয়াছে, এক ক্ষীণ-দেহা বালিকা। অবনত শাখার মত তাহাব সর্ব্বদেহ বাতাসে দুলিয়া উঠিতেছে। কখনও বরফে পা ডুবিয়া যাইতেছে, কখনও ঝড়ে ঘাসের মত বাঁকিয়া বরফের উপর পড়িয়া যাইতেছে আবাব উঠিতেছে, পাশে তাহাব গভীর দুর্গম বন ঝঞ্ঝা-আহত কবিয়া ক্রন্দন কবিতেছে। সামনে, ঐ দূরে প্রান্তরের শেষে ক্ষীণ উষালোকে জাগে শহর··

উর্দ্ধ আকাশের দিকে হাত তুলিয়া মা বলিয়া উঠেন, "রক্ষা করো ভগবান্।"

জপের মালার মত নিঃশব্দে দিনেব পর দিন চলিয়া যায়। প্রতি শনিবার পাভেলদের বাড়ীতে আড্ডা বসে। প্রতি সপ্তাহ যেন একটা সিঁড়ির এক একটা ধাপের মত। তাহার উপরের ধাপে যে কি আছে তখনও অদৃশ্য।

নূতন লোক আসে। পাভেলের ছোট্ট ঘর লোকে ভরিয়া উঠে। ক্রমে সপ্তাহে দুইবার কবিয়া সভা বসে।

মা বিস্ময়ে তাহাদের কথাবার্ত্তা শোনেন। মাঝে মাঝে তাহারা

গান গায়—কিন্তু তাহার সুর, ভাষা মার কাছে সব নূতন লাগে। সকলে মিলিয়া চাপা গলায় তাহারা এক রকম গান গায়। শুধু উপাসনা মন্দিরে মা সেই বকম গম্ভীর সুর শুনিয়াছিলেন।

মার আরও বিস্ময় লাগিত যখন দেখিতেন কথা বলিতে বলিতে সহসা তাহাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। বিশেষ করিয়া যেদিন তাহারা অপর কোন দেশের শ্রমিকদের কথা খবরের কাগজ হইতে পড়িত, সেদিন তাহারা আবও চঞ্চল, আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। চোখ দিয়া তাহাদের আনন্দ ঠিকরাইয়া পড়িত—ছোট ছেলেদের মত আনন্দে তাহারা সমস্ত ভুলিয়া যাইত। আনন্দে উত্তেজিত হইয়া কেহ চীৎকার করিয়া উঠিত। জয়, ফ্রান্সের শ্রমিকদের জয়!

কখনও বলিত, দীর্ঘজীবি হক ইতালীর কমরেড্‌রা!

বহুদূরের সেই সমস্ত অজানা সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে কায়মনে নতি জানাইয়া তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মার মনে হইত যে, তাহারা বিশ্বাস করে যে দূরে থাকিয়াও তাহারা এই অভিবাদন শুনিয়াছে, না দেখিয়াও তাহারা জানিয়াছে, রুষিয়ার এক কোণে এক বদ্ধ ঘরে কয়েকজন সহযাত্রী বন্ধু তাহাদের হৃদয় দিয়া বুঝিয়াছে।

লিটল রাশিয়ান বলিয়া উঠিত, "কমরেড, তাদের লিখে জানান দরকার যে, সুদুর রুষিয়ায়ও তাদের বন্ধুরা আছে, যারা তাদের মত এক আদর্শ ধরে চলেছে এবং তাদের জয়ে আজ আনন্দে উৎফুল্ল!"

তারপর তাহারা আনন্দোদ্ভাসিত মুখে জার্ম্মাণ, ইংরাজ, ইতালীয়ান, ফরাসী দেশের শ্রমিকদের কথা বলিত, যেন তাহারা সব অতি

নিকট বন্ধু, রহিলই বা তাহারা দূরে, ব্যক্তিগত পরিচয়ের সীমানার বাহিরে।

সেই ক্ষুদ্র ঘরে সেই কয়েকজন অজ্ঞাতনামা যুবকের আলোচনায় নিখিল বিশ্বের আর্ত্ত সর্ব্বহারাদের এক অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার অনুভূতি মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিত। এই নিবিড় অনুভূতির প্রেরণায় তাহারা সকলে একাত্ম হইয়া যাইত। তাহারই স্পর্শে মার অন্তর সহসা সচকিত হইয়া উঠিত। না জানিয়াও, না বুঝিয়াও সেই আনন্দময় যৌবনময় উন্মাদনার গতিবেগে আনন্দে তাঁহার মন সায় দিত।

একদিন লিটল রাশিয়ানকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, ভারি মজার লোক তোরা বাছা! তোদের সবাই বন্ধু, আর্ম্মেনিয়ানরা তোদের বন্ধু, য়িহুদীরা তোদের বন্ধু, জার্ম্মাণরাও তোদের বন্ধু। সবার দুঃখে তোরা কাঁদিস্, সবার সুখে তোরা হাসিস্।

অন্তরের আবেগে লিটল রাশিয়ান বলে, "সবার জন্যে আমরা, আমাদের জন্যে সবাই—মা! এই পৃথিবীতে আমাদের কোনও জাত নেই, কোনও আলাদা দেশ নেই! আমরা জানি শুধু শত্রু আর মিত্র। জগতের যত শ্রমিক আছে, তারা আমাদের মিত্র, আর যত ধনী আছে, যত আছে প্রভুত্বপরায়ণ ব্যক্তি সবাই আমাদের শত্রু! আমরা শ্রমিক সবাই এক মায়ের সন্তান। একই আদর্শ আমাদের সকলের বুকে। এক সূত্রে গড়ে তুলতে হবে এই বিশ্ব-জোড়া ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে। বুকের ভেতরে এই কথা মনে দেয় আলো, দেহে দেয় তেজ; দ্বিতীয় সূর্য্যের মত আলোয় ভরিয়ে তোলে এই অন্ধকার জীবন, জাগায় নতুন স্বর্গ। সে স্বর্গ কোথায় জানো মা? আমাদের এই বুকে, বঞ্চিত

মানুষের বুকে রয়েছে সে স্বর্গ! তাই, সে যেই হ'ক, যেখানেই থাকুক, যাই হ'ক তার নাম, সে যদি সাম্যবাদী হয়, তা হলে সে আমার বন্ধু, অন্তরের মিতা, যুগে যুগান্তরে।"

এই উন্মাদনা, এই শিশু-সুলভ উল্লাস, অন্তরের আদর্শে এই সুবিপুল বিশ্বাস ধীরে ধীরে দলের সকলের চিত্ত অধিকার করিতে লাগিল। প্রতিদিন সেই দৃশ্য দেখিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, সূর্য্যের মত প্রদীপ্ত রশ্মি লইয়া সত্য জাগিয়া উঠিতেছে—আকাশের সূর্য্যের মত তাহার অস্তিত্ব মা অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন।

নিকোলের বাবা চুরি করিয়া মাঝে মাঝে প্রায়ই শ্রীঘর বাস করিত। সেই সময় নিকোলে পরমোল্লাসে ঘোষণা করিত, "এখন দিন কতকের জন্যে আমার বাড়ীতে সভার অধিবেশন বসতে পারে। পুলিশ আমাদের বড়জোর চোর বলে সন্দেহ করবে।"

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা পাভেলের সঙ্গে কারখানার ছুটীর পর কোন না কোন একজন লোক আসিত। চুপি চুপি পাভেলের সঙ্গে কি পড়িত, তারপর কাগজ পেন্সিল লইয়া বই হইতে কি লিখিয়া লইত। এই কাজে তাহারা এতদূর মত্ত হইয়া থাকিত যে, কারখানা হইতে আসিয়া হাত মুখ পর্য্যন্ত ধুইত না। বই হাতে করিয়াই চা পান করিত। তাহাদের কথা মার কানে আসিয়া পৌঁছিত কিন্তু ক্রমশ তাহাদের কথা তাঁহার কাছে আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

মা প্রায়ই তাঁহার ছেলেকে বলিতে শুনিতেন, "এবার একখানা খবরের কাগজ চাই!"

যত দিন যায় মা দেখেন, চারিদিকের জীবন যেন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ছেলের দল যেন আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফুল ফোটার সময় বাগানে ভ্রমরদের অবিরাম ভিড়ের মত মার মনে হইল সহসা তাহাদের যাওয়া-আসা ঘোরাঘুরি যেন বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু লিটল রাশিয়ানকে মা যত দেখিতেন, ততই তাঁহার হৃদয় স্নেহে উথলিয়া উঠিত, তাঁহার মনে হইত, যেন কে একটী শিশু-কোমল হাতে তাঁহার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিতেছে। রবিবার দিন পাভেলের অবসব না থাকিলে, সে আসিয়া মার রান্নার জন্য কাঠ কাটিয়া উনুন ধবাইয়া দিত। কাজ করিবার সময় প্রায়ই সে শীষ দিত। গানের সুরের মত কোমল, করুণ।

একদিন ছেলেকে ডাকিয়া মা বলিলেন, আচ্ছা, "লিটল রাশিয়ান যদি আমাদের এখানে থাকে, তা হলে তো বেশ হয়? তোদের দুজনেরই সুবিধে হবে—ছোটাছুটী করতে হবে না?"

"নিজেব বোঝা বাড়িয়ে তোমার কি লাভ?"

"ঐ দেখো কি কথা! চিরকাল কিসের জন্যে এত বোঝা বয়ে বেড়ালাম আজও জানি না। তবে মনে হয় একজন ভাললোকের জন্যে যদি একটু বোঝা বাড়ে তো বাড়ুক!"

"তোমার যা ইচ্ছে কর মা! সে যদি থাকে, আমি খুব সুখীই হব।"

মার অনুরোধে লিটল রাশিয়ানকে পাভেলদের বাড়ীতেই থাকিতে হইল।

গ্রামের ধারে পাভেলদের ছোট্ট বাড়ীটি ক্রমশঃ সকলের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিল। নানা রকমের সন্দেহের দৃষ্টি বাড়ীর দরজাব আশে-পাশে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগিল। এই বাড়ীব ব্যাপারটা কি জানিবাব জন্য গ্রামের লোকদেব কৌতুহলেব আব সীমা পবিসীমা নাই। বাত্রি বেলা কেউ হয়ত পাঁচিল বাহিয়া জানালা দিয়া উঁকি দিয়া দেখে ঘবেব মধ্যে কি হইতেছে; কেউ বা দুষ্টুমি কবিয়া বাড়ীব কডা নাড়া দিয়া চলিযা যায়।

পাভেলের মা বাস্তায় বাহিব হইলে, লোকের প্রশ্নেব আর বিরাম থাকে না। একদিন গ্রামের সবাইখানার বুড়ো মালিক রাস্তায় পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বলি পাভেলেব মা, ব্যাপারখানা কি? তোমার বাড়ীতে রোজ কোথাকার সব ছোঁডাছুঁড়ীদের মেলা বসে—ফিস্‌ফাস্‌ করে সব কথা কয়, বলি ব্যাপারখানা কি? অত ফিস্‌ফাস্‌ করে কি কথা হয়? কৈ, আমার হোটেলে এসে তারা কথা বলাবলি করুক না? আর নির্জ্জন যায়গা যদি চাও—বাবা—গির্জ্জে আছে! হোটেলেও আসবে না, গির্জ্জেও যাবে না—এর মধ্যে নিশ্চয়ই গোলমাল আছে। ও সব ভাল বুঝি না তো! উপযুক্ত ছেলে, বিয়ে দাও, বিয়ে না দিলে উচ্ছন্নে যাবে।"

বাড়ীর কাছে কামারদের গিন্নী মেরিয়ার সঙ্গে দেখা। সে বলে, "বলি ছেলেকে একটু সাবধানে রেখো!"

"কেন?"

"কি তারা সব দল গড়েছে শুনছি? ওরা বলছিলো, ওসব ভাল নয়। চাবুক নিয়ে ওরা নিজেরা মারামারি করে নাকি?"

মার মুখ হইতে বাহিরের এই সমস্ত কথা শুনিয়া পাভেল আর লিটল রাশিয়ান হাসে।

একদিন বহস্যচ্ছলে মা বলিলেন, "গাঁয়েব মেয়েগুলো তোদেব ওপব ভাবী চটা। তোবা মদ খাস্ না, মারধোব করিস্ না, তবুও বিয়ে কববি না কেন? তোদের মত ছেলে ক'টা মেয়ে পায়? কিন্তু মেয়েগুলোব বাগ, তোবা তাদেব দিকে একবাব ফিবেও দেখিস্ না। ওবা কি বলে জানিস্, আমাদের বাড়ী যে সব মেয়ে আসে, তাদেব নাকি চবিত্র খাবাপ—"

পাভেল গম্ভীব ভাবে বলে, "তা তো হবেই।"

লিটল বাশিয়ান মাব কাছে আগাইয়া আসে। বলে, "কি জান মা? পানাপুকুবে সবই দুর্গন্ধ লাগে। বিয়ে-কবা যে কি জিনিষ মেয়েগুলোকে বুঝিয়ে বলতে পাবো না মা? হাড ক'খানা দেহে আছে, তাতে কি অসোয়াস্তি হচ্ছে তাদেব?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলেন, "তাবা কি জানে না? তবে তাবা কি কববে? এ ছাড়া আব উপায় কি? আচ্ছা তাদের ডেকে এনে তোবা বোঝাতে পাবিস্ না?"

পাভেল তেমনি গম্ভীব ভাবে উত্তব দেয়, "তাদেব যদি এখানে ডেকে আনি কি হবে জানো? কিছুদিন পবে দেখবে যে-যাব জোড়া বেঁধে চলে গেছে ঘব সংসাব কবতে—"

মাব চিন্তা আব বেশীদূব অগ্রসর হইতে পাবে না। পুত্রের গাম্ভীর্য্য তাঁহার অন্তবকে ব্যথিত কবিয়া তোলে।

একদিন বাত্রি বেলা মা শুইয়া শুনিতেছেন, তাঁহাব ছেলে আব লিটল রাশিয়ান কথা বলিতেছে। লিটল্ রাশিয়ান বলিতেছে, "তুমি তো জানো, আমি নাটাশাকে ভালবাসি—"

"জানি!"

"আচ্ছা, সে কি জানে যে আমি তাকে ভালবাসি ?"

"জানে ! এবং সেই জন্যেই সে ইদানীং এখানে আসা ইচ্ছে করে বন্ধ করেছে।"

লিটল রাশিয়ান বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে কি ভাবে। তারপর বলে, "আচ্ছা, আমি যদি তাকে সব কথা বলি ? যদি বলি আমি—"

"কেন বলবে ?"

"কেন ? কাউকে যদি তুমি ভালবাস, আর তাকে তা না জানাও—তা হলে তার মানে কি থাকে ?"

"এ থেকে তুমি কি মানে চাও ?"

"বাঃ"

"হাসি নয়, আন্দ্রি ! তুমি যা চাইছো তার সম্বন্ধে তোমার স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। ধরে নিলাম যে, সেও তোমাকে ভালবাসে। বেশ, তোমাদের দুজনের বিয়ে হলো। তারপর এলো ছেলে মেয়ে। সে রইলো তার ঘর-সংসার নিয়ে, তুমি রইলে তোমার ছেলেমেয়ের আহার সংস্থানেব ব্যবস্থা করতে ! সেই গড্ডলিকা স্রোত ! যে কাজের জন্যে এলে, যে আদর্শের জন্যে জীবন, তার কি হলো ? আমি বলি কি জানো ? যা মনে আছে, তা মনেই থাক্। ওকে কিছুই জানাবার কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু একথা তুমি কেন বলছো—সেদিন আইভানোভিচ যা বল্লেন, তা মানো না ? মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, চাই তার পরিপূর্ণ বিকাশ, দেহের এবং মনের ?"

"সে আমাদের জন্যে নয় ! তুমি আমি কেমন করে পাবো

পরিপূর্ণ জীবন? সে আমাদের জন্যেই নয়। ভবিষ্যৎকে যে ভালবেসেছে তাকে বর্তমানের সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া উপায় নেই, ভাই।"

"কিন্তু এ বড় কঠোর।"

"তা ছাড়া মুক্তি কোথায়?"

নিস্তব্ধ ঘরে শুধু ঘড়ির পেণ্ডুলামের উদাসীন গতি জীবন হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে এক একটী ক্ষণ অপহরণ করিয়া চলিয়াছিল। মা বিছানায় আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন। পাছে শব্দ হয়, তিনি পাশ ফিরিতে পর্য্যন্ত পারিতেছেন না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিটল রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "একি দুর্ভোগ, অর্দ্ধেক হৃদয় ভালবাসবে, অর্দ্ধেক হৃদয় ঘৃণা করবে। আচ্ছা, তাহলে, চুপ করে থাকতে হবে—"

একটু কোমল কণ্ঠে এবার পাভেল বলিল, "সেই ভাল হবে, ভাই—"

"তবে তাই হক বন্ধু। সেই পথেই হক আমাদের যাত্রা। কিন্তু যেদিন তুমি এর স্পর্শ পাবে সেদিন তুমিও বুঝবে এ কত কঠোর, কত কঠিন।"

"বন্ধু, সে আমি এখনি বুঝছি।"

"সত্যি?"

"হাঁ।"

বাহিরে ঝড় বাড়ীর পাঁচিলে আছাড় খাইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। ঘরে পেণ্ডুলাম তেমনি দুলিতেছে। বালিশে মুখ গুজিয়া শিশুর মত মা কাঁদিয়া উঠিলেন।

সাম্যবাদীদের সম্বন্ধে গ্রামে ক্রমশঃ প্রকাশ্য আলোচনা চলিতে লাগিল। তাহারা এক রকম নীল-কালিতে-লেখা কাগজ গ্রামের চারিদিকে ছড়াইতেছিল। এই সমস্ত কাগজে কারখানার শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা, সেণ্ট পিট্‌স্‌বার্গ এবং অন্যান্য শহরের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের ব্যাপার, তাহাদের উপর মালিকদেব অত্যাচারের কাহিনী এবং সর্ব্বশেষে তাহাদেব সকলের একত্র হইয়া এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আবেদন থাকিত।

যে সমস্ত লোক বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে, তাহারা এই সমস্ত কাগজ পড়িয়া রাগিয়া যাইত, বলিত, "যত সব বিপ্লবীর দল! ব্যাটাদের চোখ উপড়ে নেওয়া দরকার!"

ছোকরারাই সকলের চেয়ে বেশী আগ্রহে এই সমস্ত পড়িত। বলিত, এ সবই সত্যি!

ইহা ব্যতীত অধিকাংশ লোক, গুরুকর্ম্মভারে যাহাদের জীবন পঙ্গু হইয়া আসিতেছে, তাহারা অলস ঔদাসিন্যে ভাবিত, এতে কি হবে? অসম্ভব!

কিন্তু একটা কথা বিশেষভাবে সত্য হইয়া দেখা দিল যে, এই সমস্ত নীল-কালিতে-লেখা কাগজ গ্রামের চারিদিকে একটা নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল। কোনও সপ্তাহ কাগজ না আসিলে, তাহারা আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিত, কই এ সপ্তাহে তো পাওয়া গেল না, বোধহয় ছাপা বন্ধ করে দিয়েছে।

হঠাৎ আবার তাহার পরের দিন সেই কাগজ দেখা দিত। শ্রমিকদের মহলে আবার একটা সাড়া পড়িয়া যাইত।

সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সবাইখানা গুলোয়, কারাখানায় কারখানায় নতুন ধরণের সব লোক দেখা দিতে লাগিল। তাহারা লোক ধরিয়া সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহাদের চোখ দেখিলে মনে হয় যে, সর্ব্বদাই যেন তাহারা কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু মা জানিতেন এই সমস্তই তাঁহার ছেলের কীর্ত্তি। দেখিতেন পাভেলকে ঘিরিয়া অনবরত একদল লোক ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাতে প্রথম প্রথম মনে সাহস পাইতেন কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যত দিন যায়, ততই এক অনির্দ্দেশ্য ভয় তাঁহার মনকে পাইয়া বসিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মেরিয়া বাড়ী আসিয়া জানাইয়া গেল—আজ সন্ধ্যা বেলা পাভেলদের বাড়ী সার্চ্চ হইবে। চলিয়া যাইবার সময় সে বলিয়া গেল, "দেখ আমি কিছু জানিনা, আমি এখানে এসেছিলুম, সেকথাও কেউ যেন না জানে। মনে রেখো, আমি এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গ কিচ্ছু জানি না।"

কি এক অজানা আতঙ্কে মার সর্ব্বদেহমন শিহরিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে স্তূপীকৃত বইএর দিকে চাহিয়া মার মনে হইতে লাগিল সকল বিপদের মূল যেন সেই বই গুলোর মধ্যেই আছে। বইগুলি বুকে তুলিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিবেন, তাহার জন্য সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখন পাভেল আর লিটল রাশিয়ান আসিবে।

একটু বিলম্বে দুই বন্ধুতে বাড়ী ঢুকিতে না ঢুকিতেই মা দৌড়াইয়া গিয়া বলিলেন, জানিস্?

মার আতঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া পাভেল বলিল, "জানি, তোমার বুঝি ভয় করছে?"

"বুকের ভেতরটা আমার কি রকম করছে !"

লিটল রাশিয়ান মাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "ভয়ের কি আছে, মা ? ভয় পেলে কারুর কোন ও সুবিধে হবে না।"

উনুনের দিকে চাহিয়া পাভেল বলিল, "বাঃ, আজ বুঝি উনুনে আগুণই দাও নি ?"

স্তূপীকৃত বইএর দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, ঐ, ঐগুলোর জন্যে পারি নি—

দুই বন্ধুতে হাসিয়া উঠিল। রাশীকৃত বইএর ভিতর হইতে খানকতক বই বাছিয়া লইয়া মা দেখিলেন পাভেল বাহিরে উঠানে লুকাইয়া রাখিয়া আসিল। মাকে বসাইয়া লিটল রাশিয়ান উনুনে আগুণ দিতে দিতে বলিতে লাগিল, "এর মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু নেই, মা। গম্ভীর-মুখ-ওয়ালা কতকগুলো লোক আসবে—ঘরদোর হাঁটকিয়ে বিছানা তুলে, মই লাগিয়ে চারদিক সব দেখবে। তাদেরও যে এসব করতে ভালো লাগে তা নয়। তবে তাদের চাকরী তো বজায় রাখতে হবে ? হয়ত এমন ও হতে পারে যে, তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে, তারপর এখানে ওখানে পাঁচ জায়গায় ঘুরিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে—এইতো ব্যাপার !"

লিটল রাশিয়ানের কথা শুনিয়া মা আপনার অতর্কিতে বলিয়া ফেলিলেন, "তোরা কি রকম ভাবে যে কথা বলিস্ !"

'কেন মা ?'

'যেন কেউ তোদের কোনও অনিষ্ট কখনও করে নি !'

"তা নয় মা ! তবে কি জানো, এত অন্যায় সয়েছি, এত নির্য্যাতন সয়েছি যে, নির্য্যাতনে আর অত্যাচারে মনে রাগ হয় না।"

সে-রাত্রি সেই অজানা অতিথিদের আগমন উৎকণ্ঠায় কাটিয়া গেল। কিন্তু কেহই আসিল না।

কিন্তু তাহারা ভোলে নাই। ঠিক একমাস পরে একদিন মধ্যরাত্রে সহসা বাহিরে লৌহ-পাদুকার পদ-ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। পাভেল, নিকোলে এবং লিটল রাশিয়ান খবরের কাগজ বাহির করিবার পরামর্শ করিতেছিল। মা বিছানায় শুইয়া তন্দ্রামগ্ন অবস্থায় ছেলেদের কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতেছিলেন।

ঘরের দরজায় বাহির হইতে কে ধাক্কা মারিল। পাভেল জিজ্ঞাসা কবিল, কে ?

দরজা খুলিতেই দুইজন পুলিসের লোক পাভেলকে ধাক্কা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। পিছনে দীর্ঘাকৃতি একজন লোক মৃদু হাসিয়া বলিল, "যাদের জন্যে মশাইরা অপেক্ষা করছেন, তারা নিশ্চয়ই নয়, কি বলেন ?

মা যেখানে শুইয়াছিলেন, সেখানে একজন পুলিশের লোক আসিয়া মাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "হুজুর, এই সেই মা-টা আর এই পাভেল—ওর ছেলে!"

"এই বুড়ী ওঠ্, বাড়ীসব সার্চ্চ করতে হবে!"

মা উঠিয়া পুত্রের পাশে একধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভয়ে তাঁহার পা কাঁপিতেছিল।

পুলিশের লোকে ঘর ওলট-পালট করিয়া যেখানে যে বই পাইতেছিল, তাহা একবার দেখিয়া যেদিকে ইচ্ছা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে লিটল রাশিয়ান গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল, "বইগুলো ওরকমভাবে ছুঁড়ে ফেলবার কি দরকার ?"

কেহই তাহার কথার কোনও উত্তর দিল না। রাগে নিকোলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"বইগুলো ভালো করে বাখা হ'ক—"

ইন্‌স্পেক্টর নিকোলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া তাঁহার অনুচরদের বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, ওহে বইগুলো ঠিক করে রাখোতো!

মা পাভেলের কাণে কাণে বলে, নিকোলেকে চুপ করে থাকতে বল না!

মার দিকে চাহিয়া ইন্‌স্পেক্টর ধমকাইয়া উঠিল, "কাণে কাণে কি ফিস্‌ফাস্‌ হচ্ছে—চুপ! এ বাইবেল কে পড়ে?"

পাভেল বলিল, 'আমি'

"এ সব বই কার?"

পাভেল উত্তর দিল, "আমার!"

'হুঁ।'

সহসা নিকোলের দিকে তাঁহাব দৃষ্টি পড়িল। তাহাকে লিটল রাশিয়ান মনে করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশায়ের নাম বুঝি, আন্দ্রি নাখোদকা—'

দ্বিরুক্তি না করিয়া আগাইয়া আসিয়া নিকোলে বলিল, হাঁ!

লিটল রাশিয়ান পিছন হইতে হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া ইন্‌স্পেক্টরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আপনি ভুল করেছেন, আমার নাম আন্দ্রি নাখোদকা—

ইন্‌স্পেক্টর নিকোলের দিকে তর্জ্জনী তুলিয়া বলিলেন, সাবধান, বলছি—তারপর লিটল রাশিয়ানের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, এই নাখোদকা, এর আগে রাজনৈতিক অপরাধে পুলিশ তোমাকে কখনও ধরেছিল—

"তুবাব। কিন্তু তাবা নাখোদকা বলে ডাকতো না—তাবা 'মিঃ নাখোদকা বলতো—"

"যে আজ্ঞে, মিঃ নাখোদকা—নিশ্চয়ই মিঃ নাখোদকা—কাবখানায় এই সমস্ত কাগজ বিলি কোন্ বদমায়েসে কবছে বলতে পাবেন ?"

লিটল বাশিয়ান উত্তব দিবাব পূর্ব্বেই নিকোলে বলিযা উঠিল, 'বদমায়েস লোকদেব খবব আমবা বাখি না। এই জীবনে প্রথম আজ বদমায়েস লোকদেব দেখা পেলাম।'

কিছুক্ষণেব জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। মাব মুখ ভযে সাদা হইয়া আসিল। ইন্স্পেক্টব হুংকাব দিযা বলিলেন, 'এই কুকুবটাকে বাইবে নিয়ে যা।'

তুজন পুলিশেব লোক আসিয়া টানিতে টানিতে নিকোলেকে বাহিবে লইযা গেল।

খানিকক্ষণ ধবিয়া খোঁজাখুঁজি হইল কিন্তু কিছুই পাওযা গেল না। হাসিয়া ইন্স্পেক্টব বলিলেন, কিছু যে পাওয়া যাবে না, তা আমি জানতাম। বোঝা যাচ্ছে, এখানে একজন ঘাগী লোক নিশ্চয়ই আছে—

লিটল বাশিয়ানেব কাছে আসিযা ইন্স্পেক্টব গম্ভীর স্ববে বলিলেন, মিঃ আন্দ্রি অনিসিমভ্ নাখোদকা, আপনাকে গ্রেপ্তাব কবা হল।

'কেন ?'

"হুজুবকে যথাসময়ে তা নিবেদন কবা হবে।" তাবপব পাভেলের মাব দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, 'এই বুড়ী লিখতে পড়তে জানিস্ ?'

হঠাৎ লোকটার দিকে চাহিতেই মার মনে একটা কেমন প্রবল ঘৃণা জাগিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার কাঁপিতে ছিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'অত চেঁচাচ্চ কেন বাছা, জীবনে তুঃখ কষ্ট কি কিছু বোঝ না ?'

' মার দিকে চাহিয়া পাভেল বলিল, চুপ কর মা!

"এ সমস্ত ব্যাপারে মা দাঁত দিয়ে বুকের কথা চেপে রাখতে হয়" লিটল রাশিয়ান বলিয়া উঠিল।

মা যেন কাহারও কথা শুনিতে পাইতেছিলেন না। ইন্স্পেক্টরের নিকট আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, কেন তোমরা এ রকম করে লোকদের ছিনিয়ে নিয়ে যাও?

পুলিস অফিসার ধমকাইয়া উঠিলেন, চুপ কর্ বলছি!

তাবপব একজন পুলিশকে ডাকিয়া বলিলেন, বাইরেব কয়েদীকে ভেতরে নিয়ে আয়!

নিকোলেকে ঘবে আনা হইল।

"মাথা থেকে টুপী নামা—"

"হাত বাঁধা থাকলে কি করে টুপী নামাতে হয় জানি না—"

মা দেখিলেন, একটা কাগজে একে একে সকলে কি সই করিল। উত্তেজনাব প্রথম ঝোঁক মার কাটিয়া গিয়াছিল। উত্তেজনার পরিবর্তে তাঁহার অন্তরে একটা অসহায় শক্তিহীন বেদনা—যাহা বিশ বৎসর ধবিয়া তিনি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন—শুধু দিন কতকের জন্য যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, আবাব তাহা তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অবসন্ন করিয়া তুলিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন—এ তিক্ত লবণাক্ত জলের সঙ্গে তাঁহার বিশ বৎসরের পরিচয়।

তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া পুলিস অফিসার হাসিয়া বলিলেন, বড় আগে থাকতে কাঁদছিস্ বুড়ী! সব কান্না এখনি শেষ করে ফেললে কি হবে?

কাঁদিতে কাঁদিতে মা বলেন,—"মার চোখের জলের কি শেষ আছে ? তোমার যদি মা থাকেন, তিনি হয় ত তা জানেন !"

সার্চ্চ শেষ হইলে তাহারা চলিয়া গেল—সঙ্গে লইয়া গেল লিটল রাশিয়ান আর নিকোলেকে। বিদায়ের সময় বন্ধুর হাত ধরিয়া তাহারা বিদায় প্রার্থনা করিল।

চলিয়া যাইবাব সময় হাসিয়া অফিসারটী বলিলেন, "ভয় কি আবার দেখা হবে !"

তাহাবা চলিয়া গেলে পাভেল গম্ভীবস্বরে মাব দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখলে কি রকম অপমান কবে গেল—আমাকে ফেলে গেল—"

"দুঃখ কি, তোকেও নিয়ে যাবে—"

"নিশ্চয়ই—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা বলিযা উঠিলেন, আচ্ছা ছেলে তুই ; মাকে কি একটুও সান্ত্বনা দিতে নেই ! আমি একগুণ বল্লে তুই দশগুণ বাড়িয়ে বলিস্—

মাকে কাছে টানিয়া লইয়া পাভেল বলিল—"মাগো তোমাকে মিথ্যে বলে প্রতারণা করবো না ! তোমাকে এসব সইতে হবে !"

ক্রমশঃ পাভেল সম্বন্ধে গ্রামের লোকদেব ধারণা বদলাইতে লাগিল। প্রায়ই কারখানার বৃদ্ধ লোকেরাও পাভেলের বাড়ীতে আসিয়া কোনও সমস্যা হইলেই তাহার সঙ্গে পরামর্শ করে। বলে, "ওহে, তুমি তো অনেক লেখাপড়া করেছ—এ ব্যাপারটা কি করা যায় বলতো ?"

তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, মা এই লেখাটা নিয়ে তোমাকে এক্ষুণি শহরে যেতে হবে!

শহর থেকে আমবা একখানা খবরের কাগজ বের করছি, এ লেখাটা কালকের কাগজে বেরুনোই চাই!

কালবিলম্ব না কবিয়াই মা যাইবাব জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই প্রথম তাঁহাব ছেলে তাঁহার উপরে তাহার কাজের ভার দিয়াছে। জীবনে এই প্রথম তাঁহার পুত্র তাঁহাকে আপনার অন্তরের কথা খুলিয়া বলিল এবং তাঁহাদেব অন্তরঙ্গতার মধ্যে গ্রহণ করিল। পুত্রের কোনও কাজে তিনি যে লাগিয়াছেন এই চিন্তায় আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হইয়া মা কাজ সাবিয়া বাড়ী ফিবিলেন।

"শাশাঙ্কা বলে একটী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। ভাঁরী ভালো মেয়ে—সে তোকে অভিবাদন জানিয়েছে আর তোদের সেই আইভান ওভিচ্ লোকটীও দেখলুম ভারী সদাশয—"

"ওদের যে তোমাব ভাল লেগেছে, জেনে সুখী হলাম!"

সোমবার দিনও শরীর তেমন সুস্থ না হইয়া উঠায় পাভেল কারখানায় যায় নাই। দুপুর বেলা হঠাৎ ফিডিয়া হাফাইতে হাফাইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, কারখানার লোকেরা সব কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে—এখনই তোমাকে সেখানে যেতে হবে—সে কি হুলুস্থুল ব্যাপার!

ফিডিয়া পাভেলেরই একজন ভক্ত।

পাভেল তখনি উঠিয়া পোষাক পড়িতে লাগিল।

মেয়েরাও সব এক জোট হয়ে তুমুল চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিয়েছে।

হঠাৎ মেয়েদের কথা শুনিয়া মার মনে হইল, তাঁহারও হয়ত যাওয়া কর্ত্তব্য। পুত্রের দিকে চাহিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, তা হলে আমি ও যাব, নিশ্চয়ই যাব, কেমন ?

পাভেল গম্ভীরস্বরে বলিল, এসো।

পুত্রের পাশে পথে চলিতে চলিতে মার মনে হইল যেন কি একটা বিরাট ঘটনা এখনি ঘটিবে এবং তাহারই মধ্যে যে পুত্রের পার্শ্বে তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছেন, সেই এক গোপন গর্ব্বে তাঁহার সর্ব্বদেহ আজ উল্লসিত হইয়া উঠিল।

কোনও রকমে লোকের ভিড় ঠেলিয়া তাঁহারা যখন জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন রাইবিন বক্তৃতা দিতেছিল। জনতাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিতেছিল, আমাদের আজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে, কয়েকটা পয়সার জন্যে নয়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের জন্যে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। ম্যানেজারের থলির পয়সার মত আমাদেরও পয়সা ঠিক তেমনি গোল কিন্তু সেই সঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পয়সায় মাখানো আছে আমাদের বুকের রক্ত !

জনতা একস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ঠিক বলেছ, রাইবিন্ !

পাভেল ভিতরে আসিতেই সকলেই তাহার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে লোক আসিয়া ক্রমশঃ জনতা আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছিল। প্রত্যেকেই আজ তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। এতদিন ধরিয়া যে-সমস্ত অপমান তাহারা নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে, যে-কথা এতদিন প্রকাশহীন হইয়া তাহাদের ক্লান্তজীবনে মূক হইয়া পড়িয়াছিল, আজ সহসা তাহা জাগিয়া উঠিয়াছে। আশঙ্কার পাষাণ-বাধা দূর করিয়া আজ কথার পাগলা

ঝোরা নামিয়া আসিযাছে। সেই সমস্ত ক্রুদ্ধ ধ্বনি আর হৃদয়-ভাঙ্গা কলোচ্ছ্বাস ঊর্দ্ধাকাশে সম্মিলিত হইয়া যেন এক বিরাট-পক্ষ বিহঙ্গমের মত তাহাদের ছাইয়া রহিল।

কথা বলিতে গিযা পাভেলেব আজ মনে হইল, সে নিজেকে আজ এই জনতাব মধ্যে উৎসর্গ করিয়া দিযা যাইবে। যে-সত্যেব আবির্ভাব স্বপ্নকে সে এতদিন অন্তরে সংগোপনে লালন-পালন কবিয়াছে, আজ বুঝি তাহা মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিবে।

বিপুল উল্লাসে সে গর্জ্জিযা উঠিল, "হে বন্ধু সহযাত্রী, এই আমবা এই হাতে গড়েছি গির্জ্জা আব কারখানা, আমরা ভেঙ্গেছি লোহা, গড়েছি নগব; এই হাত, এই আমাদের হাত, টাকশালে গড়েছে টাকা, কারখানায় গড়েছে যন্ত্র, গড়েছে সভ্যতার হাজার রকম খেলনা। যে শক্তি পৃথিবীর মুখে তুলে দেয় অন্ন, বুকে দেয় আনন্দ, সে শক্তিব জীবন্ত মূর্ত্তি আমরা। সকল কালে এবং সকল দেশে এই আমরাই এগিয়ে গিয়ে কাজে হাত দিয়েছি প্রথম; কিন্তু সকল কালে সকল দেশে আমরাই থেকে গেছি জীবনের শেষে। কে চায় আমাদেব আনন্দ? কে চায় আমাদের কল্যাণ? মানুষ বলে কে ভাবে আমাদের? কেউ না!"

জনতার মধ্য হইতে একজন কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, কাজের কথা বল হে!

তাহার উত্তরে আর একজন বলিয়া উঠিল, চুপ্ কর্, অসভ্য!

একজন বলিল, লোকটা সাম্যবাদী, কিন্তু বোকা নয়!

যাই হোক্, খুব জোর গলায় স্পষ্ট কথা বলতে পারে কিন্তু—আর একজন বলে!

পাভেল জনতাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া আবার বলিয়া চলিল, "আজ সময় হয়েছে বন্ধু, তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার, যে-শক্তি তার অদম্য লোভে আমাদের শ্রমে বেঁচে থাকতে চায়। সময় এসেছে আত্মরক্ষার এবং আজ আমাদের একথা ভাল করে বুঝতে হবে যে, আমরা ছাড়া আমাদের আর কেউ সাহায্য করবে না। সকলের জন্যে আমরা প্রত্যেকে, আমাদের প্রত্যেকের জন্যে সবাই—এই হোক আজ আমাদের সব চেয়ে বড় নীতি।"

মন্ত্র-মুগ্ধ জনতা যেন সহস্র-মুখ দিয়া এই বাণীর আস্বাদ সম্মিলিত ভাবে ভোগ করিতেছিল।

পাভেল বলিয়া উঠিল, "আমরা এক্ষেত্রে এখনি ম্যানেজারকে ডেকে মুখোমুখী সকল কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—"

জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই, ম্যানেজারকে এখানে ডেকে আনান হোক—

অবশেষে ঠিক হইল যে পাভেল, সিজর ও রাইবিন গিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। এমন সময় পিছন হইতে শোনা গেল—ম্যানেজার স্বয়ং আসছেন—

দুইপাশ হইতে ভিড় আপনিই সরিয়া গেল। দীর্ঘাকৃতি এক ব্যক্তি জনতার ভিতর দিয়া গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া যেখানে পাভেল, সিজর ও রাইবিন দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একবার চোখ তুলিয়া সকলকে যেন এক সঙ্গে দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ভিড়ের মানে কি ?

কয়েক সেকেণ্ডের মত সকলি নিস্তব্ধ। সিজর মাথা হেঁট করিয়া রহিল, ম্যানেজার আবার বলিলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও!

সিজব ও রাইবিনকে দেখাইয়া পাভেল বলিল, আমাদের বন্ধুরা আমাদের এই তিনজনের ওপব ভার দিয়েছে, চাঁদার হুকুম তুলে নেবার জন্যে আপনাকে বলতে।

পাভেলের দিকে না চাহিয়াই ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

বেশ জোব গলায় পাভেল উত্তর দিল, আমরা মনে করি এরকম ভাবে চাঁদা আদায় করা অন্যায়!

"—ওঃ, এই যে জলা যায়গাটা পরিষ্কার করবার জন্যে চেষ্টা হচ্ছে, তোমরা মনে কর যে এতে শুধু মজুরদের ঠকান হচ্ছে? তাদের স্বাস্থ্য ভালো কববাব যে চেষ্টা হচ্ছে, সে তোমরা ভাবতে চাও না, না?"

পাভেল বলিল, ঠিক তাই!

রাইবিনের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল, তো-াবও কি এই মত?

হাঁ

তারপর সিজবের দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের স্বরে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল, বন্ধু, তোমারও এই মত?

নিশ্চয়ই!

পাভেলের সর্ব্বাঙ্গ দৃষ্টি দিয়া যেন পরিমাপ করিয়া লইয়া ম্যানেজার আবার বলিলেন, "তোমাদের দেখে তো মনে হয় যে একটু আধটু বুদ্ধি শুদ্ধি তোমাদের আছে? তোমরা এ ব্যবস্থার মধ্যে কিছু ভালো দেখতে পেলে না, কেমন?"

পাভেল তেমনি জোর গলায় উত্তর দিল, যদি কারখানার মালিক তাঁর নিজের খরচে এই জলাভূমি পরিষ্কার করে দিতেন, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতাম না।

ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

"বলি, কারখানাটা কি দানছত্র? ও সব চলবে না বলছি—আমি হুকুম দিযে যাচ্ছি এক্ষুণি সকলকে কাজে লাগতে হবে—"

আব কোনও কথা না বলিয়া তিনি ধীবে জনতার ভিতব দিয়া বাহিরের দিকে চলিলেন। একটা রুদ্ধ প্রতিবাদের গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিতে তিনি একবার ফিরিয়া দেখিলেন। জনতার মধ্য হইতে কে একজন স্পষ্ট স্বরে বলিযা উঠিল, হুজুব একা কাজে হাত দিন্ গে যান—

আব একবাব পিছন ফিবিয়া স্পষ্ট স্বরে তিনি হুকুম দিলেন, পনেরো মিনিটেব মধ্যে কাজে হাত না দিলে, প্রত্যেককে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ম্যানেজার চলিয়া যাইতেই জনতাব মধ্যে অস্পষ্ট গুঞ্জন পুনরায় চীৎকারে পরিণত হইল। চারিদিক হইতে পাভেলকে উদ্দেশ্য করিয়া নানারকমের প্রশ্ন হইতে লাগিল।

"এখন তা হলে আমরা কি করবো, পাভেল?"

পাভেল সেই সহস্রকণ্ঠের মিলিত প্রশ্নেব উত্তরে জানাইল, "আমাব মতে, কমরেডরা, তোমাদের উচিত যতক্ষণ না চাঁদার হুকুম তুলে নেওয়া হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের ধর্ম্মঘট করে থাকা।"

চারিদিক হইতে উত্তেজিত কণ্ঠে নানা কথা আবার জাগিয়া উঠিল,—

মনে করেছ আমরা বোকা?

নিশ্চয়ই আমাদের ধর্ম্মঘট করা উচিত!

ধর্ম্মঘট?

একটা কোপেকের জন্যে?

কেন না? নিশ্চয়ই ধর্ম্মঘট।

যদি আমাদের সবাইকে তাড়িয়ে দেয়—

কিন্তু কারখানা চালাবে কাদের দিয়ে?

যদি নতুন লোক নিয়ে আসে?

বিশ্বাসঘাতকের দল—তাদের আমরা—

পাভেল মার পাশে আসিয়া নীরবে ক্ষিপ্ত জনতার উন্মাদনা শুনিতেছিল। সকলেই নিজেদের চীৎকার লইয়া ব্যস্ত—পাভেলের দিকে তখন কাহারও দৃষ্টি নাই।

জনতার সেই দোদুল্যমান অবস্থা দেখিয়া রাইবিন পাভেলকে ডাকিয়া বলিল, "এদের দিয়ে ধর্ম্মঘট করা চলে না। একটা পয়সার মায়া ত্যাগ করতে যেমন এদের বুকে বাজে, এরা অন্তরে আবার তেমনি কাপুরুষ।"

পাভেল নীরবে সমস্ত কথা শুনিতেছিল আর তাহার মনে হইতেছিল এতক্ষণ ধরিয়া সে যে সমস্ত কথা বলিয়াছে—বহুদিনের শুষ্ক মৃত্তিকায় জল-কণার মত যেন তাহা কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোনও চিত্তে তাহার কথা বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই, ভাবিতে তাহার অন্তর শিহরিয়া উঠিতেছিল। ক্রমশঃ যে-যাহার একে একে ঘরে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। যাইবার সময় প্রত্যেকে পাভেলের নিকট আসিয়া তাহার বক্তৃতার প্রশংসা করিল, এবং তাহারই সঙ্গে জানাইল, ধর্ম্মঘট করিয়া বিশেষ কোনও সুবিধা হইবে না এবং প্রত্যেকে নিজেকে বাদ দিয়া অপর সকলকে দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গেল।

পাভেল যে শুধু হতাশ হইল তাহা নয়, সে নিজেকে ভগ্নাবহভাবে

আহত মনে করিল। সহসা তাহার মনে হইল, সে যেন একা, তাহার বন্ধু-বান্ধব কেহ নাই। এতদিন ধরিয়া আপনার অন্তরে সে যে-সত্যকে নানা চিন্তা ও অনুরাগের মহিমায় অপরূপ করিয়া সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, আজ যখন তাহাকে সে অন্তরের সংগোপন-লোক হইতে বাহিরে বাণীরূপ দিল, তাহার আশঙ্কা হইল যে, হয়ত সেই সত্যকে সে যে-ভাষায় রূপ দিল—তাহা প্রাণহীন, অনুরাগহীন—নহিলে লোকে তাহার কথা শুনিল না কেন? হয়ত সে সত্যকে এমন দারিদ্র্যের আবরণে আজ লোক-চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে যে, লোকে তাহার সৌন্দর্য্য বুঝিতেই পারিল না। এই প্রকাশের দৈন্যের জন্য সে আপনাকেই ধিক্কার দিতে লাগিল।

মা, সিজব, আব রাইবিনেব সঙ্গে সে বাড়ী ফিবিল। সারা পথ সে গম্ভীর ও বিষণ্ন হইয়া রহিল। চলিতে চলিতে বৃদ্ধ সিজব মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, বুঝলে নিলোভনা, এখন আমাদের মত বুড়ো লোকদের সরে পড়া দবকাব। নতুন লোক সব আসছে—নতুন তাদেব জীবন। আমরা চিরদিন হাত জোড় করে মাটীতে বুক দিয়ে হেঁটে চলে এসেছি—এক মুহূর্ত্তের জন্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনি। কিন্তু এরা—হয় এরা নিজেদের বুঝতে পেরেছে, নয়ত এরা আমাদের চেয়েও মারাত্মক ভুল করছে—কিন্তু যাই করুক—এদের সঙ্গে আমাদের কোথাও যেন কোনও মিল নেই। দেখলে—এই ছোড়া, ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বল্লো ঠিক যেন ম্যানেজারের সমকক্ষ—"

তারপর তাহার বাড়ীর নিকট আসিয়া পাভেলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, এখন তা হলে আসি পাভেল! মজুরদের জন্যে তুমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ—ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

সিজব ও চলিয়া গেল।

বাড়ী আসিয়া পাভেলের অশান্তি যেন আরও বাড়িয়া গেল। তাহাব সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল, আজ সেই জনতার মাঝখানে সে যেন কি হারাইয়া ফেলিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে মা তখন ঘুমাইতেছিলেন—সে আপনাব মনে পড়িতেছিল—এমন সময় বাহিবে কিসেব পদশব্দ শোনা গেল। পদশব্দে মাব ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—পাভেল ফিবিযা দেখিল, দবজার সম্মুখেই পুলিশেব লোক।

পাভেল মাব কানে কানে বলিল, আমাকে গ্রেফতাব কববাব জন্যে এসেছে, বুঝেছ?

মাথা নত কবিয়া ধীবে মা বলিলেন, বুঝেছি। সভায় বক্তৃতা শুনিয়াই মার মন বলিয়াছিল নিশ্চয়ই পুলিশে এবার তাহাকে ধবিবে কিন্তু তবুও মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যে-কথায় এত লোকে সায় দেয় সে কথার জন্য নিশ্চযই তাহাকে বিশেষ কোনও শাস্তি হয়ত দেওয়া হইবে না।

পুলিশের লোক আসিয়া পাভেলের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। পুত্রকে একবার আলিঙ্গন কবিবার জন্য মার সর্ব্ব-দেহ-মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কোথা হইতে প্রবল অশ্রুর বন্যা তাঁহার হৃদয়ের দ্বারে আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু পুলিশের লোকগুলির দিকে চাহিয়া আজ সে অশ্রুর জোয়ার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চক্ষুর দ্বার প্রান্তে আসিয়া ঠেকিয়া যাইতেছিল।

পাভেলকে তাহারা ধরিয়া লইয়া গেল। মা নীরবে দাঁড়াইয়া

দেখিলেন। একান্ত শান্ত সংযত কণ্ঠে শুধু একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে কিছু চাই ?

পুত্র স্থির ভাবে বলিল, না !

প্রত্যুত্তরে শুধু বলিলেন, সবার উপরে যিনি, তিনি রইলেন তোর সঙ্গে !

শূন্য অন্ধকার ঘরে একলা মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। আপনার মনে কতক্ষণ যে তিনি কাঁদিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। সেই শূন্য অন্ধকারে, সেই অবিরাম অশ্রুধারায়, মার মনে আজ স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল, কত অসহায়, কত দুর্ব্বল তিনি ! আপনার অসহায়তার কথা যত ভাবেন, ততই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, পুলিশের লোকগুলোর চেহারা। সত্যকে জানিতে চায় এই অপরাধে যাহারা তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়া গেল তাহাদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আক্রোশ এবং ঘৃণা ধীরে ধীরে গুটীর সূতার মত মার মনের সঙ্গে জড়াইয়া যাইতেছিল।

রাত্রিশেষে তখন বাহিরে বর্ষা নামিয়াছে। বর্ষার জলধারার শব্দে মার মনে হইতেছিল, বাড়ীর চারিদিকে যেন কাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অতি কুৎসিত তাহাদের মুখ—মুখে যেন চক্ষু নাই !

কখনও আপনার মনে বলিয়া উঠেন—আমাকেও কেন তারা ধরে নিয়ে গেল না ?

বাহিরে রাত্রিশেষে বর্ষার কর্দ্দমাক্ত পথে আর একদিনের প্রভাত নামিয়া আসিতেছিল। সহসা কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বাহিরে আবার পদশব্দ হইল। মা উঠিয়া বসিলেন।

জলে ভিজিয়া রাইবিন ঘরে প্রবেশ করিল। বলিল, "পাভেলকে ধরে নিয়ে গেছে না? আমার ওখানেও তাঁরা দেখা দিয়েছিলেন। সারা বাড়ী ওলট-পালট করে সার্চ্চ করলো; প্রাণের আনন্দে যা খুশী তাই আমাকে গালাগাল দিল কিন্তু দয়া করে আমাকে আর ধরে নিয়ে গেল না। এমনিই হয়! ম্যানেজার গিয়েই পুলিশকে টিপে দিয়েছে—

"সে তোমাদের সকলের জন্যে জেলে গেছে—তোমাদের সকলের উচিত পাভেলের পক্ষে দাঁড়ান!"

"আপনি যা বলছেন, তাই হয়ত হওয়া উচিত কিন্তু সে রকম কিছুই হবে না। আজ হাজার বছর ধরে আমাদের পরস্পরকে অসীম দুঃখের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। সারা গায়ে আমাদের কাঁটা। কেউ কারুর কাছে এলেই আগে কাঁটা এসে গায় বেঁধে। যতদিন না আমরা সেই সমস্ত কাঁটার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবো, ততদিন আমাদের একসঙ্গে কোনও কাজে মেলা অসম্ভব।"

রাইবিনের কথা মার মোটেই ভাল লাগিত না। মা লক্ষ্য করিতেন যে, দলের অন্য সব ছেলেরা যেমন আশার কথা, আনন্দের কথা বলে রাইবিন কোনও দিন সে রকম কোনও কথা বলিত না।

রাইবিন চলিয়া গেল কিন্তু তাহার কথায় মার মন আরও অশান্ত হইয়া উঠিল। ইদানীং তিনি রান্নাবাড়া আর করিতেন না, এমন কি চাও খাইতেন না, শুধু সন্ধ্যার দিকে কয়েক টুকরা রুটী খাইতেন। কয়েক দিন আগেও যেখানে সন্ধ্যাবেলা ঘর মানুষে আর কথায় সরগরম হইয়া থাকিত, সেখানে এখন কেউ আসে না, সাড়া শব্দ নাই।

একা ঘরে বিষণ্ণ অন্তরে মার দিন কাটে। মাঝে মাঝে রাইবিন আসিত কিন্তু তাহার কথাবার্ত্তা মার মোটেই ভাল লাগিত না।

একদিন এমনি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে বসিয়া আছেন। বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত হইল। বাহিরে করাঘাত হইতেই মার হৃদয় চমকাইয়া উঠিল। দরজা খুলিতেই দুইটী মূর্ত্তি ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। একজনকে মা জানিতেন—তাহার নাম সামোলভ, পাভেলেরই কর্ম্ম-সহচর। আর একজন গলার কোটের 'কলার' উল্টাইয়া এবং চোখের ভ্রূর নীচে এমনভাবে টুপী টানিয়া দিয়াছিল, যে তাহার মুখই দেখা যাইতেছিল না।

অভিবাদনের কোনও আড়ম্বর না করিয়াই সামোলভ মাকে বলিল, "ঘুমুচ্ছিলেন না কি? তাইতো ঘুম ভাঙ্গালাম! এটিকে চিনতে পারছেন কি? এই সেই আইভানোভিচ যার কাছে পাভেলের লেখা এনে দিয়েছিলেন!"

মাথা হইতে টুপী খুলিয়া আইভানোভিচ মাকে অভিবাদন করিল। তাহাকে দেখিয়া মার অসহায় চিত্ত যেন কতকটা শান্ত হইল।

আইভানোভিচ বলিল, "আমরা একটু দরকারে এসেছি আপনার কাছে। আপনি হয়ত জানেন না যে ভ্যাসিলি পরশু দিন জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তার সঙ্গে পাভেল আর লিটল রাশিয়ানের দেখা হয়েছিল। তারা দুজনেই আপনাকে অভিবাদন জানিয়ে দুঃখ করতে বারণ করে পাঠিয়েছে। পাভেল কি বলে পাঠিয়েছে জানেন, জীবনের রাজপথে মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই পথের মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্যে এই জেলগুলোর দরকার হয়। এখন আসল কাজের কথা! জানেন কালকে কতলোক আবার গ্রেফতার হয়েছে?"

"তাতো আমি কিছুই জানি না। আরও লোক গ্রেফতার হয়েছে?"

"পাভেলকে নিয়ে উনপঞ্চাশ জন লোক সব শুদ্ধ গ্রেফতার হয়েছে। এবং এখনও আজকালের মধ্যে আরও জনদশেকের গ্রেফতার হবার সম্ভাবনা আছে। সামোলভ খুব সম্ভবত আজকালের মধ্যেই ধরা পড়বে।"

এই সংবাদ শুনিয়া মা একটু আশ্বস্ত হইলেন, তাহলে সে সেখানে একলা নাই। আপনার অজ্ঞাতে মা বলিয়া ফেলিলেন, "অত লোককে যখন ধরেছে তখন নিশ্চয়ই তাদের বেশী দিন ধরে রাখবে না?"

আইভানোভিচ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ঠিক বলেছ মা। এই সময় যদি আমরা একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে পারি তাহলে পুলিশকে রীতিমত ঠকান যায়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে, কারখানায় আমাদের লেখা প্রচার যদি এখন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পুলিশের লোক ভাববে যে নিশ্চয়ই পাভেল আর তার সঙ্গে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরই ছিল এসব কীর্ত্তি! এবং তখন জেলে তাদের উপর হয়ত দুর্ব্যবহার বাড়তে পারে।"

মার মন আতঙ্কে দুলিয়া উঠিল, বলিলেন, "কি করে তারা বুঝবে যে এ সব পাভেলের কাণ্ড?"

"অনেক সময় পুলিশের লোকও যে-সব কথা ধরে নেয়, তা ঠিকই হয়। তারা ভাববে পাভেল যখন বাইরে ছিল, তখন কারখানায় নিত্য বই বিলোনো হত। এখন পাভেল আর বাইরে নেই, কারখানায়ও বই বিলি আর হচ্ছে না। অতএব সোজা বোঝা

যাচ্ছে যে পাভেলই এই সমস্ত বই বিলি করতো। এবং তারা যখন এটা বুঝতে পারবে তখন জ্যান্ত ওদের ধরে ধরে খাবে।"

পাভেলের নির্য্যাতনের আশঙ্কায় মার বুক শুকাইয়া আসিল। বলিলেন, "তবে, তবে কি হবে?"

সামোলভ বলিল, "সেই জন্তেই তো আমরা এসেছি। এখন আমাদেব সমস্যা হচ্ছে যে, আমাদের কাজ বন্ধ করা একদম চলবে না। কাবখানায় ঠিক আগেকাব মত আমাদের বই বিলি করতেই হবে। তাতে আমাদের কাজও এগোবে, জেলে তারাও পুলিশের নির্য্যাতনের হাত থেকে বাঁচবে।"

আইভানোভিচ বলিল, "কিন্তু এই কাজের ভার নেবে এমন একজন লোকও বাইবে নেই। হাতে আমাদের বেশ ভাল ভাল বই তো আছে। তাব দায়িত্ব আমি নিজে নিতে পারি কিন্তু আসল সমস্যা হচ্ছে যে কারখানার ভেতরে কেমন করে সেগুলো গোপনে বিলি করা যায়! আজকাল আবার কারখানায় কড়াকড়ি নিয়ম হয়েছে—গেটে সকলকে আগে সার্চ্চ করে তবে ঢুকতে দেয়।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মা স্পষ্টই বুঝিলেন যে তাঁহাকে দিয়াই কোনও কাজ ইহারা করাইয়া লইতে চাহিতেছে। যদি পুত্রের কোনও কাজে বা উপকারে নিজেকে লাগান যায়, সেই সম্ভাবনার আশায় মার মনে কোথা হইতে এক নূতন শক্তি দেখা দিল। বলিলেন, তাহলে, এখন আমরা কি করতে পারি?

সামোলভ উত্তরে বলিল, "মেরিয়ানা বলে একটা খাবার ফিরিওয়ালী আছে, আপনি তাকে চেনেন?"

"চিনি। কিন্তু তাকে দিয়ে—"

"তার সঙ্গেই বন্দোবস্ত করুন। সে কোনও রকমে কারখানার ভেতরে গিয়ে বই বিলি করুক—আমরা অবশ্য এর জন্যে তাকে পয়সা দেবো।"

কি মনে করিয়া মার এ পন্থা ভাল লাগিল না। গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন, "সে মাগীকে দিয়ে এসব কাজ হবে না—সে যে বকবক করে—এখনি সে সকলকে সব কথা বলে দেবে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর সহসা উল্লসিত হইয়া মা বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, আমি নিজেই একাজ করবো। তোমাদেব বইগুলো সব আমাকে দাও। আমি নিজেই যাব কারখানায়। মেরিয়ানাকে বলবো আমাকে সঙ্গে নিতে—তার মোট আমি বইবো। তারই লোক হয়ে কারখানায় মজুরদের কাছে আমি খাবার বেচতে যাব—আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে, পেটের জন্যে তো একটা যা হক কিছু কাজও আমাকে করতে হবে। সেই বেশ হবে, কেউ সন্দেহ করবে না।'

পরমোল্লাসে তাহারা তিনজনেই চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই ঠিক!

একটা গোপন-গর্ব্বে মার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল, বলিলেন, "তারা জানুক যে, আমার পাভেলকে তারা বন্দী করে রেখেছে বটে কিন্তু তার হাত জেলের লোহার গরাদ পেরিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত এসেছে—"

সামোলভ বলিয়া উঠিল, এটা যদি আমরা করতে পারি, তা হলে জেলে গিয়ে মনে করবো যে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছি।

কল্পনায় মা ভাবিতেছিলেন—তিনি কারখানার ভিতরে বই বিলি করিতেছেন। পুলিশের লোকেরা বুঝিবে যে তাঁহার পুত্র এই সমস্তের

জন্য দায়ী নয় এবং সে মুক্ত হইবে। ভাবিতে ভাবিতে মার সর্ব্ব শরীর আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছিল।

মার দিকে চাহিয়া আইভানোভিচ বুঝিল যে, তিনি পুত্রের কথাই ভাবিতেছেন। আশ্বাস দিবার জন্য চলিয়া যাইবার সময় সে বলিল, পাভেলের কথা ভেবে আপনি মন খারাপ করবেন না। জেল থেকে যখন সে বেরিয়ে আসবে, দেখবেন সে আরও কত ভালো হয়ে গেছে। কারাগারই হচ্ছে আমাদের বিশ্রামের যায়গা—পড়ার ঘর। বাইরে থাকলে কাজের ভিড়ে তো সে সব আর হয় না। জানেন মা, আমি তিনবার জেলে গিয়েছিলাম। অবশ্য খুশী হবার মত কর্ত্তাদের কাছে কিছুই পাইনি কিন্তু এই তিনবারে আমার নিজের অনেক উন্নতি হয়েছে—

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মা বলিলেন, তা দেখতেই পাচ্ছি, কথা বলতে গেলে তোমার দম আটকে আসে—

"সে সব অন্য কারণে মা! আচ্ছা, এখন সে সব কথা থাক্! তাহলে, এই বন্দোবস্তই ঠিক রইলো। কালই আপনার কাছে বইগুলো পাঠিয়ে দেবো। আবার চাকা ঘুরুক—তলায় তার যাক পিষে হাজার হাজার যুগের জমাট-বাঁধা অন্ধকার। জয় হক চিন্তার স্বাধীনতার! চির-অক্ষয় আর চির-সুন্দর হয়ে থাক মার অন্তর! আসি তা হলে!"

দরজার কাছে আসিয়া সামোলভ বলিল, আমার নিজের মার কাছে এ সব কথার বিন্দুমাত্রও উচ্চারণ করতে পারি না।

তাহার অন্তরের ব্যথা বুঝিতে পারিয়াই মা বলিলেন, দুঃখ করো

না বাছা, একদিন সবাই বুঝবে, আমার মত একদিন সবাইকেই বুঝতে হবে।

তাহারা বিদায় লইলে মা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিলেন। বাহিরে বর্ষার অশান্ত ছন্দে তাঁহার অন্তর হইতে ভাষাহীন এক অপূর্ব্ব প্রার্থনার সুর জাগিয়া উঠিল। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র ঘরকে সচকিত করিয়া যে-সমস্ত লোক একদিন তাঁহার অন্তরে নব সুর ধ্বনিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সকলের মিলিত চিন্তা আজ বাণীহীন প্রার্থনায় তাঁহার অন্তরকে ভরিয়া তুলিল। সামনের ক্রুশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে হইল, সেই ক্রুশের মধ্য দিয়া অনবরত তাহারাই যাতায়াত করিতেছে। মাগো, একরাশ ফুলের মত সুন্দর, পবিত্র, শিশুর মত মুখ, কিন্তু কি উদাসীন শিশু সব !

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়াই মা সোজা মেরিয়ানার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

মেরিয়ানা আপনিই বকিয়া চলিল, "দুঃখ করিস্ না বোন্। আগে চুরি করার জন্যে লোককে ধরে নিয়ে যেতো—আজকাল নিয়ে যায় সত্যি কথা বললে। পাভেল হয়ত অন্যায় কিছু বলে থাকবে কিন্তু যাই বলিস্ বোন্ সকলের হয়ে তো সে দাঁড়িয়েছিল, সকলের হয়ে তো সেই কথা বলেছিল। এখন অবিশ্যি সকলের উচিত তাকে দেখা। তা বোন্, তোর সঙ্গে দেখা করবো করবো আমিই মনে করছিলাম কিন্তু যে কাজের ভিড়, গিয়ে আর উঠতে পারি নি।

এই বাজার থেকে জিনিষ আনছি, ভাঙছি, আবার ফিরি করতে বেরুচ্ছি। সে আবার এক ঝকমারী! ব্যাটারা সব ঝুড়ি থেকে চুরি করবার মতলবে থাকে। সাবধানে ফিরতে হয়! তারপর তাতেও কি শান্তি আছে? দুচার পয়সা জমিয়ে রাখ, কোন্ সময় কোন্ হারামজাদা এসে তাও চুরি করে নিয়ে যাবে! একা থাকার এই বিড়ম্বনা! তাও আবার বলি বোন, লোক নিয়ে থাকা আরও বিড়ম্বনা।"

মা দেখিলেন মেরিয়ানাকে না থামাইলে সে থামিবে না। বলিলেন, "বুঝলি বোন্ আমি এসেছি কিছু সাহায্যের জন্যেই ; বোঝোইতো দিন চলে না—আমাকে তোমার সঙ্গী করে নাও, তোমার সঙ্গেই খাবার ফিরি করবো।"

মার দুরবস্থার কথা শুনিয়া মেরিয়ানার দয়া হইল। বলিল, "আচ্ছা তাই হবে। একদিন তুই বোন্ আমাকে আমার স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছিস্! মনে আছে তোর? আজ আমি তোকে তোর দুঃখ থেকে একটু বাঁচাতে পারবো না?"

পরের দিনই কারখানার ভিতরে মেরিয়ানার যায়গায় মা খাবারের ঝুড়ি লইয়া উপস্থিত হইলেন। মেরিয়ানা কারখানার ভার মার উপর দিয়া নিজে বাজারে ফিরি করিতে আরম্ভ করিল।

নূতন খাবারওয়ালীর সঙ্গে মজুরদের অল্পকালের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। পাভেলের মা বলিয়া অনেকে আসিয়া সহানুভূতি

জানায়, দুঃখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, তাইতো খাবার ফিরি করে বেড়াতে হচ্ছে ?

কিন্তু কেউ কেউ আবার পাভেলের মা বলিয়া তাঁহাকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দেয়। এই সব ধর্ম্মঘট, গণ্ডগোল, তাহারা আদৌ পছন্দ করিত না। একজন একদিন বেশ নির্ম্মমভাবে মাকে শুনাইয়া দিল, আমি যদি এদেশের শাসন-কর্ত্তা হ্তাম, তা হলে তোমার ছেলেকে ফাঁসী দিতাম। লোকদের ক্ষেপিয়ে বেড়ান কত মজার ব্যাপার যাদু বুঝতে পারতেন !

খাবার লইয়া কাবখানার ভিতরে বসিয়া আছেন, সহসা দেখেন দুইজন পুলিশের লোক সামোলভকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। পিছনে পিছনে প্রায় শতখানেক মজুর চলিয়াছে। কেহ পুলিশের লোককে গালাগাল দিতেছে, কেহ বা ঠাট্টা করিতেছে কিন্তু সবাই ক্রুদ্ধ।

একজন সামোলভকে উদ্দেশ্য কবিয়া বলিয়া উঠিল, তা হলে একান্তই বেড়াতে চল্লি ভাই !

আর একজন চেঁচাইয়া বলিল, এমনি করেই ওরা আমাদের সম্মান করে !

তাহার উত্তরে আর একজন বলিয়া উঠিল, সম্মান করে না ? আমরা যখনি বেড়াতে যাই, তখনি সঙ্গে দেয় আমাদের বডি-গার্ড।

সামোলভ মার কাছে আসিতেই মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গোপন অভিবাদন স্বরূপ তিনি মাথা নত করিলেন।

এই সমস্ত যুবক যখন হাসিমুখে কারাগারের দিকে যাত্রা করিত, মার মন তখন মাতৃ-সুলভ এক অপরূপ করুণায় ভরিয়া উঠিত। সঙ্গে সঙ্গে মজুররা নানাভাবে তাহাদের অন্তরের বিক্ষোভও

জানাইত। মা গোপন-গর্ব্ব অনুভব করিতেন, এ সবই তাঁহার ছেলের প্রভাব।

কারখানায় খাবার বিলি হইয়া গেলে মা সোজা মেরিয়ানার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাহার কাজে কর্ম্মে সহায়তা করিয়া যখন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার আর কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। আইভানোভিচের বই দিয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহারও দেখা নাই। আপনার মনে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়ান—কোথাও যেন একটু বিশ্রামের স্থান নাই।

বাহিরে নিঃশব্দে জানালার উপর বরফ আসিয়া পড়িতেছিল। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় মা শুনিলেন দরজায় কে খুব সন্তর্পণে করাঘাত করিতেছে। দরজা খুলিতে দেখিলেন একটী বলিষ্ঠ ধরণের মেয়ে। ভাল করিয়া দেখিতে তিনি চিনিতে পারিলেন, শাশাঙ্কা। মাঝে দুই একদিন দেখিয়াছিলেন কিন্তু কেমন করিয়া হঠাৎ সে এত মোটা হইয়া গেল তাহা মা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। সেই সঙ্গীহীন নির্জ্জনতার মধ্যে একজন সাথী পাইয়া তাঁহার অন্তর যেন একটু শান্তি লাভ করিল।

"এসো, এসো, এতদিন তো তোমায় দেখিনি। কোথায় ছিলে?"

"বাঃ, আপনি জানেন না, আমিও যে জেলে গিয়েছিলাম। নিকোলের সঙ্গে এক সঙ্গে জেলে ছিলাম। আপনার নিকোলেকে মনে আছে?"

"মনে আছে বৈ কি! আইভানোভিচের কাছে শুনলাম সে ছাড়া পেয়েছে কিন্তু তোমার সম্বন্ধে সে তো কিছু বলে না—"

"বলে আর কি হবে, তাই সে বলেনি। কিন্তু দেখুন, আমি

একেবারে ভিজে গেছি। আইভানোভিচ আসবার আগেই পোষাকটা একটু বদলাতে হবে -তার আগে শুনুন, আমিই বইগুলো এনেছি—

আকুল আগ্রহে মা বলিয়া উঠিলেন, কৈ ?

জামার বোতাম খুলিতেই তাহাব সর্ব্বদেহ হইতে পাতলা কাগজেব পার্শ্বেল চাবিদিকে ছড়াইয়া পড়িল—ঝড়ো হাওয়ায় যেমন গাছেব শুকনো পাতা ঝরিয়া পড়ে।

মা হাসিয়া ফেলিলেন। "ওমা তাইতো বলি, কোথাও কিছু নেই মেয়েটা হঠাৎ এত মোটা হল কি করে? এই বোঝা বয়ে সারা পথ নিশ্চয়ই হেঁটে এসেছ?"

"নিশ্চয়ই!" ভারমুক্ত হইতেই আবার শাশাঙ্কাকে তন্বুদেহা যুবতীটীর মত দেখাইল। মা এইবার লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার মুখ চোখ যেন বসিয়া গিয়াছে, সর্ব্বদেহে ক্লান্তি মাখা!

"আহা বড্ড কষ্ট হয়েছে, না? বসো, এক্ষুণি চা আর রুটী তৈরী করে দিচ্ছি।"

"বাঃ, আপনি কেন করতে যাবেন, আমি করে নিতে পারি না?"

রান্নাঘবে গিয়া দুইটী নারী জ্বলন্ত আগুণের সম্মুখে আপনাদের সুখ দুঃখের কথা বলিতে লাগিল।

"সত্যিই, মা, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যাই বলি না কেন, কারাগার মানুষের খানিকটা শক্তি অপহবণ করে নেয়। সব চেয়ে ভয়ানক জিনিষ কি জানেন, যখন কাজ করবার জন্তে মন উৎসুক, সেই সময় বাধ্য হয়ে পঙ্গু হয়ে বসে থাকতে হয়। বাইরে কত কাজ রয়েছে, একটু জ্ঞানের অভাবে লাখ লাখ লোক মরে আছে। আমরা জানি, আমরা খানিকটা পারি তাদের

সেই অভাব মেটাতে কিন্তু সেই সময় মন যখন চায় দিতে তখন তারা খাঁচাব জন্তুব মত আমাদের রাখে ধরে। সে যে কি যন্ত্রণা! সমস্ত মন শুকিয়ে যায়।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, এ সমস্তেব পুরস্কাব কে দেবে? আমাব বিশ্বাস ঈশ্বব একদিন না একদিন এব পুরস্কার দেবেন! তোমবা তো আবাব ঈশ্ববেও বিশ্বাস কব না?

খাড নাড়িয়া শাশাঙ্কা বলিল, না!

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া মা বলিয়া উঠিলেন, আমিও তোমাদের বিশ্বাস কবি না। কি আশ্চর্য্য লোক তোমবা! তোমরা এখনও নিজেদেব জানোনা। তোমবা যে-বকম ভাবে জীবন চালাও, ঈশ্ববে বিশ্বাস না থাকলে কি তা কখনও সম্ভব হয়?

হঠাৎ বাইরে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুইজনেই চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শাশাঙ্কা উঠিয়াই মার কাণে চুপি চুপি বলিল, "যদি দেখেন যে পুলিশের লোক, তাহলে তাদের সামনে দেখাবেন যে আপনি আমাকে চেনেন না। আমি রাত্রে পথ ঠিক করতে না পেবে ভুল বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি এবং হঠাৎ মূর্চ্ছা যাই—আপনি আমার জামা খুলতেই এই সমস্ত বই দেখতে পেয়েছেন।"

শাশাঙ্কার মনোভাব বুঝিয়া করুণ কোমল স্বরে মা বলিলেন, ও সব কথা বলবার কি দরকার?

কিন্তু পুলিশের লোকের বদলে আসিল, আইভানোভিচ, সর্ব্ব শরীর জলে ভেজা এবং কোনও রকমে যেন শেষ শ্বাস গ্রহণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই বলিয়া উঠিল, "মাগো, সামোভারে আগুন

দাও! ওঃ ওর চেয়ে ভালো জিনিষ জগতে আর নেই! এই যে শাশাঙ্কা, তুমি আগে থাকতেই উপস্থিত দেখছি—"

মার দিকে চাহিয়া আইভানোভিচ বলিয়া চলিল, "এই যে মেয়েটী দেখছেন, পুলিশের পায়ে কাঁটার মত ইনি লেগে আছেন। জেলের ইন্‌স্পেক্টর ওকে অপমান করে, তাতে ও বেঁকে বসলো যে যদি ইন্‌স্পেক্টব ক্ষমা না চায়, তাহলে জেলে না খেয়ে ও আত্মহত্যা করবে। আটদিন ক্রমান্বয় এক ফোঁটা জলগ্রহণ করলো না—অবস্থা এ রকম হয়ে উঠলো যে, এই যায় এই যায়।"

বিস্ময়ে শাশাঙ্কার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আট দিন কিছু না খেয়ে রইলি কেমন করে?

শাশাঙ্কা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কি করব? আস্পর্দ্ধা! অন্যায় করে ক্ষমা চাইবে না?

"যদি মরে যেতিস্, পাগলী?"

"তা কি করব! অবশ্য সে ক্ষমা চাইলো। বিন্দুমাত্র অপমান আর কারুর সহ্য করা উচিত নয়!"

ক্রমশঃ কথাবার্ত্তায় রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছিল। শাশাঙ্কা বিদায় গ্রহণের জন্য উঠিতেই, মা বলিয়া উঠিলেন, "সে কি এই পরিশ্রমের পর এই রাত্রে কোথায় যাবে?"

আইভানোভিচ বলিল, "ওকে এখনি শহরে যেতে হবে। দিনের আলোয় রাস্তায় ওকে মুখ দেখালে চলবে না!"

"এই রাতে, একলা যাবে? কি লোক তোরা—"

শাশাঙ্কা উঠিয়া দাঁড়াইল। মা দরজা পর্য্যন্ত তাহাকে পৌছাইয়া দিলেন। যাইবার সময় কি মনে করিয়া শাশাঙ্কা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অতি মৃদুস্বরে মাকে বলিল, "মাগো, তোমার হাতটা দাও, একটা চুমু খাবো?"

শাশাঙ্কাকে জড়াইয়া ধরিয়া মা তাহার কপোলে চুম্বন করিলেন। শাশাঙ্কা চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ মা নীরবে জানালার কাঁচের ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আহা বাছা আমার কি করে শহরে পৌছবে।

আইভানোভিচও এতক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। মার কথায় সায় দিয়াই সে বলিল, "এবার জেল থেকে এসে ওর শরীর একদম ভেঙ্গে গিয়েছে। আগে ওর শরীর খুব ভালই ছিল। ওর মুখ দেখলে আমার কিন্তু মনে হয় যেন ওর ক্ষয় রোগ ধরেছে।"

"ওর কে আছে?"

"মস্ত জমিদারের মেয়ে। কিন্তু, বলে যে বাপ নাকি ভয়ানক পাজী। আপনি আর একটা ব্যাপার বোধ হয় জানেন যে, ওদের দুজনের বিয়ে হবে!"

কার সঙ্গে?

"কেন, পাভেল আর শাশাঙ্কা ওরা দুজনে দুজনকে ভয়ানক ভালবাসে। তবে বিয়ে ওদের আর ঘটে উঠছে না! ও যখন থাকে জেলে সে তখন থাকে বাইরে, আবার ও যখন বেরিয়ে আসে, দেখে সে জেলে গেছে।"

"কই, আমাকে পাভেল তো কিছুই বলে নি!"

হঠাৎ মেয়েটার প্রতি মার অন্তরের সমস্ত নিরুদ্ধ স্নেহ উথলিয়া উঠিল। মনে হইল, তাঁহারই স্নেহের পুত্রবধূকে অসহায় ভাবে

এমনি করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এবং সেই সঙ্গে রাগ হইল আইভানোভিচের উপর। বলিলেন,

"তোমার উচিত ছিল ওব সঙ্গে যাওয়া!"

"অসম্ভব! কাল সকালে এখানে আমাকে পর্ব্বত-প্রমাণ কাজ কবতে হবে। সকাল থেকে এই হাঁপানি নিয়ে ঘুরতে ঘুবতেই প্রাণ যাবে।"

আইভানোভিচেব কথা যেন মা ভাল করিয়া শুনিতে পাইলেন না। তিনি তখন শাশাঙ্কার কথাই ভাবিতেছিলেন।

আপনার মনেই বলিয়া উঠিলেন, কি সুন্দর মেয়ে! কিন্তু মনে মনে তাঁহাব ভয়ানক অভিমান হইতেছিল যখন ভাবিতে-ছিলেন যে, পুত্রের যে-সংবাদে তিনি সকলেব চেয়ে সন্তুষ্ট হইতেন, সেই সংবাদ পুত্র ছাড়া আর একজনের কাছে শুনিতে হইল।

মার অবস্থা বুঝিয়া আইভানোভিচ বলিল, "সত্যিই বড় ভালো মেয়ে। আমি বুঝতে পাবছি তার জন্যে আপনার মনে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই হতভাগ্য বিপ্লবীদেব সকলের জন্যে যদি আপনি এমনি করে দুঃখ করেন—তাহলে মা, একটা হৃদয়ে কুলোবে না। যাক্, এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাক্।"

কেমন করিয়া মা কারখানায় বই লইয়া যাইবেন, সেখানে কাহার কাছে কি ভাবে বইগুলো দিবেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মাকে তাহা বুঝাইতে লাগিলেন। এত পরিষ্কারভাবে সমস্ত ব্যাপারটা সে মাকে বুঝাইয়া দিল যে মা লোকটার বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া অবাক হইলেন।

সকাল বেলা চলিয়া আসিবার সময় আইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ধরুন, পুলিশের লোক যদি জানতে পেরে আপনাকে

ধরে ফেলে এবং জিজ্ঞেস করে, এ সমস্ত বই কোথা থেকে পেলে—তখন কি বলবেন ?"

মা হাসিয়া উত্তর দিলেন—"বলবো—যেখানেই পাই না, তোমাদের তাতে কি।"

"তাতে তো তারা শুনবে না—তাদের ধৈর্য্য বড় বেশী ; তারা যতক্ষণ না উত্তর পাবে, ততক্ষণ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে।"

"আমি কিছুতেই বলবো না।"

"তারা ধরে নিয়ে গিয়ে আপনাকে জেলে রাখবে।"

"তাতে কি ? তা হলে জীবনে ভাববো যে অন্ততঃ একটা কাজেও লাগলাম। আমার এ জীবনে কি দরকার ? কেই বা আমাকে চায়।"

"কিন্তু জেলে ভয়ানক কষ্ট।"

"জেলে যারা যায়, তারা প্রত্যেকেই তো সে কষ্ট সহ্য করে। হয়ত যারা জীবনকে বুঝেছে, তাদের মনে তত কষ্ট লাগে না। কিন্তু আজ আমার মনে হয় যে, আমিও যেন একটু একটু করে জীবনকে বুঝছি।"

উল্লাসে আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, "যদি তাই বুঝে থাকেন, তাহলে আজ আপনাকেও সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন।"

দুপুর বেলা আইভানোভিচের নির্দেশ মত মা বুকের ভিতরে কাগজের বাণ্ডিলগুলি ভরিয়া লইলেন। এমনভাবে সেগুলি লইলেন, যেন বহুকাল ধরিয়া তিনি সেই কাজেই অভ্যস্ত।

আধ ঘণ্টার মধ্যে খাবারের ঝুড়ি লইয়া কারখানার দরজায় হাজির। দুইজন পুলিশের লোক ফটকে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক মজুরের সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাদের কারখানায় ঢুকিতে দিতেছিল। মাঝে মাঝে মজুরগুলো প্রহরীদের উপর বিরক্ত হইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলে, পকেটে কি দেখছো—মাথার ভেতরে দেখো!

পুলিশের লোক রাগে কোনও সময় উত্তর দেয়, মাথায় দেখবো কি? মাথায় তো শুধু উকুন আর পোকা!

মজুরদের কাছ থেকে উত্তর আসিতে বিলম্ব হয় না। একজন বলিয়া উঠে, মানুষ শীকাব করার চেয়ে উকুন বাছোগে, পুণ্যি হবে।

এমন সময় খাবারের ঝুড়ি লইয়া আসিয়া খাবারওয়ালী বলে, "আমাকে আর জ্বালাস্ নে বাবা, একে বুড়ো মানুষ তারপর এই বোঝা, আর দাঁড়াতে পাবি না। পিঠ ভেঙ্গে পড়লো বাবা!"

কোনও সন্দেহ না করিয়া প্রহরীবা বলিয়া উঠিল, যা, বুড়ী, যা!

যথাস্থানে বসিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া মা একবার চারিদিক দেখিয়া লইলেন। মাকে দেখিয়াই দুটী লোক আগাইয়া আসিল। দুই ভাই। বড় ভাইএর নাম ভাসিলি, ছোট ভাইএর নাম আইভান।

ভাসিলি আগাইয়া আসিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—বলি মোহন-ভোগ এনেছ?

এই সাঙ্কেতিক কথাই আইভানোভিচের কাছে মা শুনিয়াছিলেন। উত্তরে তিনিও সঙ্কেতে বলিলেন, আজ নেই, কাল আনবো।

দুই ভাইই সঙ্কেতের অর্থ বুঝিল। আইভান আহ্লাদে চীৎকার করিয়া বলিল, সত্যিই তুই মা মাথার মণি! ভাসিলি আগাইয়া আসিয়া হাঁড়ির ভিতর হইতে এক বাণ্ডিল কাগজ তুলিয়া লইয়াই

বুকের ভিতরে পুরিল। আইভান বুটের পা-ঢাকা চামড়ার ভিতর আরও কতকগুলি লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দূরে মজুরদের আসিতে দেখিয়া মা অনভ্যস্ত স্বরে হাঁকিতে লাগিলেন—চাই গরম ঝোল, টাটকা মাংসের রোষ্ট চাই!

মজুররা যথারীতি তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সময় বুঝিয়া ভাসিলিও গায়ের জামাটা আঁট করিয়া পরিয়া কারখানার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মজুরদের খাবার দিতে দিতে মা আনন্দে ভাবেন, তাঁহার এই প্রথম অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া পুত্র কত না আনন্দিত হইবে। একটা অনাস্বাদিত আনন্দের পুলক তাঁহার সর্ব্বদেহকে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিল। মনে হইতেছিল, কি একটা পাখী প্রভাতে প্রথম জাগিয়া ডানার ঝাপট দিতে দিতে আনন্দ-সঙ্গীত গাহিতেছে। মজুররা খাবার চায়। আনন্দের ঝোঁকে জোরে জোরে মা বলেন, আরও আছে, আরও আছে!

কারখানার কাজ সারিয়া মেরিয়ানার বাড়ী হইয়া যখন সন্ধ্যায় মা বাড়ী ফিরিলেন, তখন তাঁহার মনে হইতেছিল যেন সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া কে তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন করিতেছে। সে কি অপূর্ব্ব পুলক!

চা তৈয়ারী করিয়া খাইতেছেন এমন সময় বাহিরে পায়ের শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি দরজার সামনে আসিয়া কোনও রকমে দরজা খুলিতেই দেখেন, অন্ধকারে লিটল রাশিয়ান দাঁড়াইয়া! একা!

অতি-পরিচিত স্নেহ-মাখা কণ্ঠস্বরে শুনিলেন লিটল রাশিয়ান ডাকিতেছে, মাগো!

তাহাকে দেখিয়া একদিকে যেমন তাঁহার অন্তর আনন্দের

আতিশয্যে ভরিয়া উঠিতেছিল, অন্যদিকে তাহাকে একা দেখিয়া এক নিদারুণ নৈরাশ্য তাঁহাকে মুহ্যমান করিয়া তুলিল। আন্দ্রির বুকে মুখ রাখিয়া তিনি শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন।

আদরে মাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, মার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে, তাহার অপরূপ কোমল করুণ কণ্ঠস্বরে লিটল রাশিয়ান বলে, "কাঁদিস্ নে মা! এমনি করে আমাকেও কাঁদাস্ নি! বিশ্বাস কর, শিগ্‌গিরই পাভেল ছাড়া পাবে। তার বিরুদ্ধে তারা কিছুই পায় নি। আর আমাদের সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তারা কেউই একটা কথাও বার করে নি।"

ধীরে মাকে বিছানার উপর বসাইয়া লিটল রাশিয়ান বলিয়া চলিল, "মাগো, আসবার সময় পাভেল তোমার কথা বল্লো। সেখানে সে দিব্যি আরামে আছে। একেবারে এক দঙ্গল লোক। এখান থেকে আর শহর থেকে নিয়ে প্রায় শত খানেক লোক ধরেছে। চার পাঁচজন করে একটা ঘরে রেখেছে। জেলের ওয়ার্ডাররাও দেখলুম মন্দ লোক নয়। বেশী কাজটাজ তেমন কিছুই দেয় নি। কিন্তু মুস্কিল হবে নিকোলের। সব সময়েই মারমূর্ত্তি হয়ে আছে। ওকে তারা কিছুতেই শিগ্‌গির ছেড়ে দেবে না। তবে পাভেল শিগ্‌গিরই ছাড়া পাবে। এখন বলত মা তুমি কেমন ছিলে?"

লিটল রাশিয়ানের কথা শুনিয়া মার মন স্নেহে ভরিয়া উঠিল। আদরে তাহার মাথায় হাত দিয়া মা বলিলেন, তুই জানিস্ না তোকে আমি কত ভালবাসি!

"সে কি জানি না মা! শুধু আমি কেন, তোমার স্নেহে আমরা সবাই ধন্য!"

"না, না, আমি তোকে সকলের থেকে আলাদা করে ভালবাসি। যদি তোর মা থাকতেন, তাহলে সবাই তাঁর হিংসে করতো!"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া লিটল রাশিয়ান বলে, "হয়ত আমার মা এখনও এই পৃথিবীর এক কোণে কোথায় বেঁচে আছেন!"

"জানিস্, আমি আজ কি করেছি?" বলিয়া আত্ম-তৃপ্তির আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে মা কারখানার সমস্ত ঘটনা বলিলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া লিটল রাশিয়ান চীৎকার করিয়া উঠিল, এই ত চাই মা! তুমি হয়ত জানো না যে, এতে পাভেলের এবং তার সঙ্গে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের কি উপকারই না হবে!

লিটল রাশিয়ানের উৎসাহে মার অন্তর পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দ গদগদ স্বরে বলিয়া চলিলেন, "সারাজীবন শুধু এই কথাই ভেবেছি, হে প্রভু, এ জীবন কিসের জন্যে দিলে? শুধু কি মার খেতে আর মুখ বুজে ভূতের বোঝা বইতে? এই সংসারের খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসা ছাড়া আর কিছু জানতাম না। স্বামীকে ছাড়া আর কারুকেই দেখতে পেতাম না। কেমন করে আমার পাভেল মানুষ হয়ে উঠলো তাও জানি না। তখন আমার একমাত্র চিন্তা আর কর্ত্তব্য ছিল—আমার দানবটীর যথাসময়ে খাদ্য সরবরাহ করা—যাতে সে আমাকে প্রহার না করে তার জন্যে সর্ব্বদাই তার সেবায় থাকা। কিন্তু তবুও প্রহার করতে একদিনও সে কার্পণ্য করে নি। স্ত্রীকে যেমন সাধারণত লোকে প্রহার করে সেরকম নয়, সে আমাকে প্রহার করতো, যেমন দুর্ব্বল শত্রুকে মানুষ প্রহার করে। কুড়ি বছর ধরে আমি এই জীবন যাপন করে এসেছি। তারপর যখন সে মারা গেল, পাভেলের দিকে চাইলাম। মাগো, সেও তখন এই

ব্যাপারে ডুবে গেছে। জীবনের সব-শেষ আশ্রয় তাকে হারাবার আতঙ্কে দিনরাত যে কেমন করে কাটে, সে আর কাকে জানাবো? তারপর একদিন বুঝলাম, আমাদের স্ত্রীলোকের এই ভালবাসা এ ঠিক আসল ভালবাসা নয়! যে জিনিষ আমাদের দরকার, আমরা শুধু তাকেই ভালবাসি। আর তোরা? তোরা যাদের ভালবাসিস্ তাদের সঙ্গে তোদের দরকারের কোনও সম্পর্ক নেই! যে লোককে জানিস্ না তার জন্যে তোরা হাসতে হাসতে কারাগারে যাস্, যে লোককে চিনিস্না তার জন্যে চলেছিস্ কোথায় দূর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে! মেয়েগুলো রাত্রির ঠাণ্ডায় চলেছে মাইলের পর মাইল, পেটে নেই খাবার, গায়ে নেই জামা! কার জন্যে? কিসের জন্যে? আমি বুঝি, তারাই সত্যি ভালবাসতে জেনেছে—আর আমি আজও সেরকম ভালবাসতে পারলাম না—আমি শুধু ভালবাসি আমার অন্তরের প্রিয় যারা তাদের।"

মার মনের রুদ্ধ অর্গল যেন বহুদিন পরে অতর্কিতে আজ খুলিয়া গিয়াছিল। তাই কথার বন্যায় তাঁহার হৃদয়ের তটভূমি বারেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

লিটল রাশিয়ান মার কথার উত্তরে বলিল, "তুমিও পার মা এমনি ভালবাসতে। কাছের যারা তাদের সবাই ভালবাসে। কিন্তু হৃদয় যাদের বড়—দূরও তাদের কাছে নিকট। তুমি জানোনা, কতখানি মাতৃত্ব তোমার হৃদয়টুকু জুড়ে আছে।"

"তাই যেন হয়, আমি যেন এইরকম ভাবে সকলকে ভালবেসে একদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে হয়ত তোকে আমি আমার পাভেলের চেয়েও ভাল-

বাসি। পাভেল কি-এক রকমের! কোন দিন কোন কথা সে আমাকে বলে না। শুনলাম সে শাশাঙ্কাকে বিয়ে করতে চায়—অথচ আমাকে একবারও জানায় নি!”

লিটল রাশিয়ান বাধা দিয়া বলিল, “কে তোমাকে বল্লে সে বিয়ে করতে চায়? অবশ্য এ কথা ঠিক যে তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে কিন্তু শাশাঙ্কা চাইলেও পাভেল কিছুতেই বিয়ে করবে না—কখনই না!”

পুত্রের এই কঠোর জীবন-সাধনার গর্ব্বে মার অভিমান-আহত অন্তর সকল ব্যথা ভুলিয়া বলিয়া উঠিল, “এই দেখ্, তোরা কি আশ্চর্য্য রকমের লোক! আপনাদের তোরা কি রকম করে বিকিয়ে দিয়েছিস্!”

“পাভেলের কথা বলো না মা! জগতে সে এক অসাধারণ লোক। লোহা দিয়ে তার বুক তৈরী!”

আবার মার অন্তরে দুলিয়া উঠে কথার তরঙ্গ। বলেন, “আজ দেখি হঠাৎ যেন সব বদলিয়ে গেছে। সকলে সকলকে অন্য ভাবে দেখতে শিখছে। মনের আজ চোখ ফুটেছে। সে চোখ মেলে আজ যেন নতুন করে এই পুরাণো পৃথিবীটাকে দেখছে—দেখছে আর একই সঙ্গে তার হচ্ছে আনন্দ আর বিষাদ। আজ আমি অনেক জিনিষ বুঝি, তবুও মনে হয় অনেক জিনিষ এখনো বোঝবার বাকি পড়ে রয়েছে। কিন্তু আমি তোদের বুঝেছি। বুঝেছি তোরা দুঃখী মানুষদের জন্যে এই দারুণ দুঃখের জীবন আপনা থেকে বেছে নিয়েছিস্। যে-সত্যের জন্যে তোরা আজ মাথায় বজ্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিস্ তাও বুঝি। বুঝি, যতদিন পৃথিবীতে একদল লোক থাকবে, যারা শুধু টাকা জমিয়ে রাখবে—আর একদল লোক শুধু

দু'মুঠো অন্নের জন্যে উদয়াস্ত খেটে মরবে, ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আর কেউ পাবে না। এক এক দিন রাত্রিবেলায় যখন হঠাৎ এই সব মনে পড়ে, তখন আমার অতীত জীবনের কথা আপনা থেকে মনে ভেসে ওঠে—দেখি, আমার সমস্ত শক্তি পথের কাদার মত কে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে—আমার এই বুককে কে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছে। সেই পেছনের দিকে চেয়ে আজকের এই সব কথা মিলিয়ে দেখলে—তৃপ্তি পাই! মনে হয়, জীবনের আর একটা আলাদা রূপ আছে—।"

অতি নিম্নস্বরে লিটল রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা মা, ঠিক কথা!"

"ঠিক কিনা জানি না। আমি যে আজ কি বলছি তা আমি নিজেই ভাল করে বুঝি না। সারা জীবন আমি চুপ করে কাটিয়ে দিয়ে এসেছি। আমি যে বেঁচে আছি, প্রাণপণে সবার কাছ থেকে সেই কথাই লুকিয়ে এসেছি। আজ কেন মনে হয়, সব জিনিষের সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ আছে—সকলের জন্যে আমার দুঃখ হয়, মনে হয় সকলকে ভালবাসি।"

উত্তেজনায় তখন মার সর্ব্বদেহ কাঁপিতেছিল। ছোট ছেলের মত মার হাত দুখানি লইয়া লিটল রাশিয়ান নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "আচ্ছা, মা, একটা কথা বলি, তুমি যদি নিকোলেকে আমাদের মত ভালবাস, তাহলে বড় ভাল হয়! আমাদের মধ্যে ওর সব চেয়ে দরকার তোমার স্নেহের। চুরি করে বাপ প্রায়ই জেলে আটক থাকেন। জেলে ও যে-ঘরে আটক ছিল তার জানালা থেকে ওর বাপ যে-ঘরে আটক আছে তা দেখা যায়। মাঝে মাঝে

দুজনের চোখাচোখি হতো। সেই অবস্থায় জেলে বসেও বাপ তাকে উদ্দেশ্য করে গালাগাল দিতো। লোকটা ইঁদুর, বেড়াল, কুকুর এই সব ভালবাসে কিন্তু নিজের ছেলেকে একদম দেখতে পারে না।”

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, “মা-টা গেল পালিয়ে, বাপ রইলেন মদ আর চুরি নিয়ে!”

লিটল রাশিয়ান বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া নিঃশব্দে মন্ত্র পড়িয়া মা আপনার শয্যায় গেলেন।

পরের দিন সকাল-বেলা যথারীতি মাল-পত্র লইয়া মা কারখানার ফটকে উপস্থিত হইতেই পুলিশের লোক আগাইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়া!

জিনিষ-পত্র নামাইয়া রাখিয়া মা দাঁড়াইলেন। প্রহরীরা আসিয়া থালাবাসন নাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিল। একজন পিঠে ও ঘাড়ে টোকা মারিয়া দেখিল।

“আমার খাবার যে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, ছেড়ে দে বাবা আমাকে!”

কিছুই অনুসন্ধানে মিলিল না দেখিয়া বিজ্ঞের মত একজন পুলিশের লোক বলিল, “আমি বলছি পেছনের পাঁচিল থেকে বইগুলো ছুঁড়ে দিয়েছে!”

বৃদ্ধ সিজব মার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া চাপা গলায় বলিল, “শুনেছ, নিলোভনা?”

মা—

"কি ?"

"আবার সেই সব বই দেখা দিয়েছে। রুটীতে যেমন করে চিনি ছড়িয়ে দেয় তেমনি কবে আবার কারা সেই সব বই কারখানার ভেতরে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে! মিছেমিছি কতকগুলো নিরীহ লোককে ধরে জেলে বেখে দিলে! আমাব ভাইপোটাকে ধরে নিয়ে গেছে—তোমার ছেলেকেতো নিয়েছেই। কৈ, তাতে এ সব তো বন্ধ হলো না! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ তাদের কাজ নয়!"

মার নিকট অগ্রসর হইয়া সিজব বিজ্ঞেব মত দাড়ি নাড়িয়া বলিল, "লোক ধবে কি করবি? আসল ব্যাপার তো লোক নয়—এসেছে নতুন মন! নতুন তার ভাবনা! মানুষের ভাবনাকে তো আর মাছি মশার মত ধরা যায় না?"

কারখানার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একদিনে কারখানার ভিতরকার আবহাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে। মজুররা চারিদিকে জটলা করিয়া উত্তেজিত ভাবে কি সব বলাবলি করিতেছে। পুলিশের লোক দেখিলেই চুপ হইয়া যাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষদের মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে—তাহারা অনবরত পুলিশের লোকের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে। সকলের চেয়ে একটা বিষয়ে মার দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়িল—মজুররা যথাসম্ভব সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া কারখানায় আসিয়াছে।

দূরে আইভান ও ভাসিলির মূর্ত্তি দেখা দিল। মা হাঁকিলেন, চাই গরম ঝোল আর টাটকা মাংসের রোষ্ট চাই-ই!

হাসিতে হাসিতে আইভান মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আজকে গরম গরম কিছু আছে না কি? কালকের গুলো বেশ ছিল!"

আনন্দে মার শত-রেখাঙ্কিত মুখ বিকশিত হইয়া উঠে। আইভান আজ 'আপনি' বলিয়া মার সঙ্গে কথা বলিতেছিল। মার কাছে আগাইয়া আসিয়া চুপি চুপি আইভান বলে, দেখছেন, কি রকম একদিনে সব বদলে গেছে! ওষুধ ধরেছে!

দূরে তিনজন মজুর দাঁড়াইয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে আলোচনা করিতেছিল। একজন দুঃখ করিয়া বলিতেছিল, আমি একখানাও দেখতে পেলাম না—বড় আফশোসের কথা!

দ্বিতীয় ব্যক্তিটী বলিতেছিল, তুই তো দেখতে পেলি না—আমি দেখতে পেলেই বা কি করতাম—আমি তো আর লেখাপড়া জানি না!

তৃতীয় ব্যক্তিটি একবার চারিদিক চাহিয়া বলিল, "দেখ, একটা কাজ করা যাক্! চল আমরা 'বয়লার' ঘরে যাই! সেখানে এখন কেউ নেই। সেখানে আমি তোদের পড়ে শোনাব। আমি একখানা বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি!"

সমস্তই মা শুনিলেন। বুঝিলেন মানুষের লিখিত ভাষার কি মূল্য! চক্ষুর সম্মুখে দেখিলেন, চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সেদিন বাড়ী ফিরিয়াই অন্তরের পরিপূর্ণ আনন্দে মা লিটল রাশিয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, "কারখানার কতকগুলো লোক দুঃখু করছিলো তারা পড়তে জানে না। আমি এককালে একটু আধটু পড়তে জানতাম—কিন্তু আজ বোধ হয় সব ভুলে গেছি!"

কালবিলম্ব না করিয়াই লিটল রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "আজ থেকেই আবার তাহলে শিখতে আরম্ভ করে দাও না কেন?"

"এই বয়সে? হাঁরে, আমার সঙ্গেও তুই ঠাট্টা করবি?"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া টেবিল হইতে একখানি বই লইয়া গম্ভীর মুখে একটা অক্ষরের উপর আঙুল দিয়া লিটল রাশিয়ান জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বল তো, এ অক্ষরটা কি ?

"এ" (A)

মা হাসিয়া বলিলেন—"আর" (R)

"আর এটা ?"

মা কিন্তু মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল লিটল রাশিয়ান যেন তাঁহাকে লইয়া একটু দুষ্টুমী করিতেছে। কিন্তু তাহার শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মার সে ধারণা বদলাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি সত্যিই এই বুড়ো বয়সে তুই আমাকে লেখাপড়া শেখাতে চাস্ ?"

"নিশ্চয়ই। একদিন যখন পড়তে শিখেছিলে, তখন নিশ্চয়ই একটু চেষ্টা করলেই পারবে। এতে ভোজবাজী কিছু নেই আর যদিই বা থাকে, তাতো ভালই।"

"কিন্তু কথায় যে বলে ঠাকুরের দিকে চেয়ে থাকলেই সাধু হওয়া যায় না।"

"মা। কথায় কি না বলে ? ধর, লোকে যে কথায় কথায় ছড়া কাটে, যত কম জানবে, তত মজাতে ঘুমুবে—সেটা কি ঠিক ? যারা পেট দিয়ে ভাবে, তারাই এই সব ছড়া মানে। কেন না তাদের পেট চায় মনকে লাগাম দিয়ে রাখতে কিন্তু মন কি লাগাম মানে ? আচ্ছা, এটা বলো তো কি ?

"এস" (S)

"দেখ দেখি, কেমন সহজেই মনে পড়ছে—আর এটা ?"

ঝুলিয়া-পড়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অতীতের বিস্মৃতির গর্ভ হইতে এই সমস্ত একদিনের পরিচিত অক্ষরগুলির নাম মনে করিতে দৃষ্টি-পীড়া ঘটিতেছিল। প্রথমে সেই জন্য মার চোখে জল দেখা দিল। তারপব কখন হৃদয়ের অশ্রুধারা তাহার সহিত মিশিয়া সমস্ত দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া দিল। মা কাঁদিযা ফেলিলেন।

"জীবনেব পাঠ আজ শেষ হয়ে এলো আর এখন আমি বসেছি বর্ণ-পরিচয় নিয়ে!"

মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য লিটল রাশিয়ান বলিল, "কিন্তু সে তো তোমাব দোষ নয় মা! তুমি তো আজ বুঝেছ যে কি জীবন তুমি যাপন করতে কিন্তু আজও হাজার হাজার লোক আছে যারা সেই রকম জীবনই যাপন করে অথচ তারা তার গর্ব্ব করে। তাদের জীবনে কি লাভ? আজকে কোন রকমে কাজ সারা হল, তারা খেলো আব ঘুমুলো; কাল এলো, কোন রকমে কাজ সারলো, খেলো আবার ঘুমুলো! এমনি করে তারা চলেছে বছরের পর বছর—খাওয়া আর খাটা, খাটা আর খাওয়া! তারপর এলো ছেলেমেয়ের দল! প্রথম প্রথম তাদের একটু ভালো লাগলো। তারপর তারা এত খেতে আরম্ভ করলো যে তাদের ধরে ধরে পাঠালো খাটুতে। এমনি করে তারাও চল্লো খাওয়া আর খাটা, খাটা আর খাওয়া নিয়ে। জীবনে তাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আনন্দের সেই অপূর্ব্ব ক্ষণ আসে না, যা নিমেষে দেয় বুককে দুলিয়ে। কেউ বেঁচে থাকে ভিখিরীর মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে; কেউ বা থাকে চোর হয়ে—এর-তার জিনিষ ছিনিয়ে নিয়ে। এই সব মানুষের মধ্যে সেই আসল মানুষ যার সাহস আছে,

মনের আর দেহের—এই সব শেকল ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। সেই মানুষ তুমি মা, তুমি চলেছ সেই শেকল ছিঁড়তে! কিসে তোমার বাধা?"

"আমি? আমি এই বয়সে?"

"কেন না? মানুষের এক ফোঁটা চেষ্টা ব্যর্থ হয় না। বৃষ্টির বিন্দুর মত সে কোথায় কোন্ বীজকে ফুটিয়ে তোলে গোপনে! তারপর যখন তুমি পড়তে শিখবে—।"

সহসা কথা বলিতে বলিতে সে আপনার মনে হাসিয়া উঠিল। তারপর ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্য্যন্ত লম্বালম্বা পা ফেলিয়া পায়চারী করিতে করিতে সে আবার বলিল—

"তোমাকে লেখাপড়া শিখতেই হবে। পাভেল ফিরে এসে তোমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে, কেমন হবে বলো তো?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, "পাগলা ছেলে আমার, তোরা কি বুঝবি, এ বুড়ো বয়সের কি গ্লানি! তোদের এখন সবই সম্ভব। বয়স কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে আমার, কখন শেষ হয়ে গেছে মনের শেষ শক্তিটুকু, এখন এই অবেলায়—"

সন্ধ্যাবেলা কার্য্যান্তরে লিটল রাশিয়ান চলিয়া গেল। মা একলা বসিয়া আছেন—এমন সময় দরজায় কে ধাক্কা দিল।

উঠিয়া দরজা খুলিবার পূর্ব্বে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

"আমি রাইবিন!"

দরজা খুলিতেই গম্ভীরভাবে রাইবিন ঘরে প্রবেশ করিয়া

ততোধিক গম্ভীরভাবে বলিল, "একদিন আপনি এই ঘরে বিনা পরিচয়ে বহুলোককে আসতে যেতে দিতেন—আজ আর পরিচয় দিয়ে ঢুকবো কেন? আর কেউ নেই এখানে?"

"না"

"ওঃ! আমি ভেবেছিলাম এখানে হয়ত লিটল রাশিয়ানের দেখা পাবো। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দেখলুম, জেলখানা মানুষকে নষ্ট করতে পারে না। মানুষকে নষ্ট করে—তার নিজের গড়া বোকামী।"

রাইবিনের এই সব গম্ভীব কঠোর কথা মার ভাল লাগিত না। তাহার কণ্ঠস্বর, কথার ভঙ্গী এবং সর্ব্ব বিষয়ে একটা বিতৃষ্ণা আর রাগ—মার মনে তাঁহার স্বামীর পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত। তিনিও ছিলেন এই রকম কঠোর, রুক্ষ, সবার উপর ক্রুদ্ধ, কিন্তু অধিকাংশ সময় মৌনী। এই লোকটার সেই সমস্ত স্বভাবই আছে, প্রভেদ শুধু, কথা কয় বেশী। কিছু না কিছু প্রতিবাদ করার তাগিদ যেন তাহার মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে।

মার কাছে বসিয়া সে বলিয়া চলিল, "একলা আছেন, আসুন একটু কথা বলা যাক্। একটা দরকারী কথা আপনাকে বলা প্রয়োজন। আমি মনে মনে একটা মত তৈরী করেছি।"

রাইবিনের কথা শুনিয়া মা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। রাইবিন তেমনি কঠোর রুক্ষস্বরে বলিয়া চলিল, "এ জগতে টাকা না হলে কিছু হয় না। জন্মাতেও টাকা দরকার, মরতেও টাকা দরকার। বই ছড়াতেও টাকা লাগে। কিন্তু এ সব টাকা আসে কোত্থেকে?"

রাইবিনের প্রশ্নের ভঙ্গীতে মা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কোনও

অজানা বিপদের আশঙ্কায় তিনি রাইবিনের মুখের দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "সে আমি কি করে জানবো?"

"আমিও কি জানি ছাই! আমার আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কববাব আছে। এ সমস্ত বই লেখে কে? নিশ্চয়ই শিক্ষিত লোকেবা—আমাদেব মনিব শ্রেণীর লোকরা। তারাই এই সমস্ত বই লিখে আমাদেব ছড়াতে দেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, তারা পয়সা খবচ করে যে-সমস্ত বই লেখে, তাতে তাদেরই বিরুদ্ধে সমস্ত লেখা থাকে। এখন আমাব প্রশ্ন হচ্ছে যে, তারা কেন পয়সা খবচ কবে আপনাদের ক্ষতি আপনাবা করে?"

এ ধবণেব কোনও কথাবার্ত্তা মা আজ পর্য্যন্ত শুনেন নাই। তিনি বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা কবিলেন, "আমি তো কিছুই জানি না। তোমার কি মনে হয়, তাই বল, আমি শুনি!"

"হু! আমারও মনে যখন এই প্রশ্ন মাথা তুলে উঠেছিল, তখন আমিও এই বকম বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সর্ব্ব-শরীরেব ভেতর দিয়ে যেন বরফের তরঙ্গ বয়ে গেল—"

"কিন্তু, তুমি কি বলতে চাও? কি তোমার মনে হয় বলো, বলো?"

"সব জোচ্চুরী! ধাপ্পাবাজী! আমি ঠিক কিছুই জানিনা বটে, কিন্তু আমার মনে হয়, এসব আমাদের প্রভুদের ধাপ্পাবাজী। নিশ্চয়ই প্রভুরা কোনও নূতন প্যাঁচে আমাদের ফেলবার চেষ্টায় আছেন। এই প্যাঁচের হাত থেকেই তো আজ মুক্ত হতে চাই—সেই জন্যইতো চাই সত্য! আর আমি বুঝি একমাত্র সেই সত্যকেই। দয়াময় প্রভুদের প্যাঁচে পড়তে আমি চাই না। কোন্‌দিন দেখবো যে

তাঁরাই আমাদের কোণঠাসা করে ফেলেছেন আর আমাদের হাড়ের ওপর দিয়ে চলেছেন তাঁদের ঈপ্সিত পথে যেমন করে মানুষ চলে সাঁকোর ওপর দিয়ে।"

এতদিন যে-সমস্ত কথা মা শুনিয়া আসিয়াছেন সহসা বাইবিনের এই কথায় সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। কোন কিছু বুঝিতে পারার যেটুকু আনন্দ মা অন্তরে সঞ্চিত করিয়াছিলেন, সহসা যেন তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল। বেদনায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তবে, তবে কি হবে? পাভেলও কি বোঝে না এ সব? এই কি সত্যি? না, না, মানুষের জীবন নিয়ে শিক্ষিত লোকেরা কখনও এরকম জঘন্য খেলা খেলতে পারে না।"

"আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যারা সাক্ষাৎভাবে এই আন্দোলন চালাচ্ছে তারা হয়ত সত্যি বলেই এ সমস্ত বিশ্বাস করে। কিন্তু তাদেরও পেছনে আর একদল লোক হয়ত আছে, যারা নিশ্চিন্ত মনে এই সব কল ঘোরাচ্ছে।"

দীর্ঘ শতাব্দীর পুঞ্জীভূত সন্দেহে বলিষ্ঠ সেই প্রৌঢ় কৃষকের অন্তর একান্ত আত্মনির্ভরের সহিত গর্জ্জিয়া উঠিল, "না, না, মনিবদের সঙ্গে কোনও সংস্পর্শে কোনও কল্যাণ আসবে না, আসতে পারে না।"

উদ্বেগে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কি করতে চাও?"

"আমি? আমি চাই প্রথমত মনিবদের আওতা থেকে সকল রকমে দূরে থাকতে। আমি এখান থেকে, এই শহর থেকে দূরে চলে যাব কৃষিয়ার গ্রামে গ্রামান্তরে। আমার মন চেয়েছিল এদের দলে মিশে এদের সঙ্গে কাজ করতে। আর আমি কাজও করতে পারি অনেক। লিখতে জানি, পড়তে জানি, সবার ওপরে জানি

লোকে কি চায়। কিন্তু তবুও এই দল ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আমি এ সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না—তাই আমি চলে যেতে চাই। আমি জানি গাঁয়ের লোকেরা একেবারে অন্ধকারে ডুবে আছে—সব স্বার্থপর পাজী বদমায়েস। জানি, জীবনে পেট ভরে তারা খেতে পায় না। তাই নিজেদের কামড়াকামড়ি করে খায়—তবু আমি যাব তাদের মধ্যে। কেউ যদি সঙ্গে না যায়, একলা যাব। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে জাগিয়ে তুলবো তাদের। বলবো, তাদের মুক্তির সংগ্রামের ভার তাদেরই নিজের হাতে নিতে হবে। তারা এগিয়ে আসুক, তারা বুঝুক! তাহলেই একটা পথ আপনা হতে একদিন বেরিয়ে পড়বে। তাদের মুক্তির আর কোনও পথ নেই, তাদের কল্যাণের আর কোনও পন্থা নেই! আর আমার মনে হয়, এইটিই একমাত্র সত্য।"

স্তম্ভিতভাবে মা বলিলেন, "তখনি তোমাকে তারা গ্রেফতার করে ধরে রেখে দেবে।"

"জেলে যাব, আবার বেরিয়ে এসে তাদের দলের সামনে এসে দাঁড়াব, আবার যাব—"

"যাদের দরজায় দরজায় ঘুরবে সেই কৃষকরাই তোমাকে মারবে।"

"হয়ত তারা তাই করবে। একবার, দুবার, তিনবার তাই করবে। তারপর তারাও একদিন বুঝবে যে, আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে না। ক্রমশঃ তারাই আমার কথা শুনতে শিখবে। তাদের বলবো, আমি যা বলছি, ইচ্ছে না যায় ত বিশ্বাস করো না, কিন্তু যা বলি তা শোনো।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল

দেহখানি একবার দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, "এতে আমাব নিজের কোনও আনন্দ নেই। বহুদিন এখানে কাটালাম, অনেক কিছুই দেখলাম, শিখলাম। এখন মনে হচ্চে—যা কিছু শিখেছি, যা কিছু বুঝেছি সে শুধু নিজেব মনেব ভেতব পুষেই বেখেছি। নিয়ত মনে হয়, যে শিশুকে জন্ম দিয়েছি—তাকে খেতে না দিতে পেরে মেবে ফেলছি।"

একান্ত সকরুণ ভাবে চাহিযা মা বলেন, "তুমি মরবে, বাইবিন।"

"আপনি জানেন বাইবেলে যীশুখৃষ্ট বীজ সম্বন্ধে কি বলেছেন? বলেছেন, তোব মৃত্যু নেই, আব একদিন আবাব তুই নবজন্ম লাভ কববি। আচ্ছা অনেকক্ষণ বকলাম—এখন যাই হোটেলে গিযে একটু আড্ডা দি। লিটল বাশিযান এলে আমাব কথা বলবেন—বলবেন আমি কালই চলে যাব। বিদায।"

বাইবিন চলিয়া গেল। দবজা বন্ধ কবিযা মা ঘবেব মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন। ঘবেব চারিদিকে শুধু অন্ধকার, আর অন্ধকার। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপনা হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, "চিবদিনই আমি রইলাম এমনি অন্ধকাব বাত্রিব মধ্যে।"

গভীব বাত্রে লিটল বাশিয়ান ফিবিয়া আসিল। মা তাহাকে রাইবিনেব কথা সমস্ত বলিলেন।

"ভালই তো। যাক্ না সে গ্রামে গ্রামে। সেখানে জাগিয়ে তুলুক সত্যের অমব বাণী। এখানে তাব ভাল লাগলো না।"

"কিন্তু সে যে-সমস্ত কথা বলছিল! বলছিলো, যাদের কথায় তোরা চলছিস্ তারাই তোদের ঠকাচ্ছে।"

"আসল কথা কি জানো মা, টাকা। টাকার যে কি অভাব তা আর কি বলবো! এক রকম বলতে গেলে আমাদের এই দল পবের

দয়ার ওপর বেঁচে আছে। ধরো, নিকোলয় আইভানোভিচ মাসে পঁচাত্তর রুবেল উপায় করে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে আমাদের পঞ্চাশ রুবেল দেয়। আরও অনেকে এইরকম করে আমাদের দলটীকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে। দরিদ্র ছাত্ররা না খেয়ে দিনের পর দিন পয়সা জমিয়ে আমাদের কিছু কিছু পাঠায়। মাঝে মাঝে প্রভুদের কাছ থেকেও সুবিধে পেলেই সাহায্য নিতে হয়। আমাদের উপরিওয়ালাদের মধ্যেও আবার অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের দিয়ে তাদেরই কাজ পরোক্ষভাবে গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় যে না আছেন, তা নয়! কেউ কেউ আবার আমাদের ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যারা শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে চলবে।"

লিটল রাশিয়ানের সহজ ও প্রাণভরা কথা মার শুনিতে বড় ভাল লাগিত। তাহার কথা শুনিলেই মার বিশ্বাস হইত যে নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে কোনও কল্যাণ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং সমস্তই নির্দ্ধারিত পথে চলিয়াছে।

লিটল রাশিয়ান আপনার আবেগে বলিয়া চলিল, "কি জানো মা, মাঝে মাঝে মনে এক একটা অদ্ভুত ভাব আসে। মনে হয় যে, এই বিশ্বশুদ্ধ লোককে আঁকড়ে ধরি। মনে হয়, যত দূরে যাই, যেখানে যাই, সেখানেই আছে অন্তরের মিতা। জগতে যেন সবাই সবার বন্ধু, সবারই অন্তরে একই আলোর শিখা জ্বলছে।—কারুর সঙ্গে কারুর দেখা নেই, কোনও কথার পরিচয় নেই, তবুও মনে হয়, সবাই যেন সবাইকে জানে, বোঝে। দুর্জ্জেয় পাহাড়ের বুক থেকে পরিচয়হীন

কত ঝরণা বেরিয়ে প্রান্তরে এসে নদীর জলে মিশে, কত বিভিন্ন তট দিয়ে সেই সব নদী আবার এক বিরাট মহাসমুদ্রে এসে এক হয়ে মিশে যায়। তেমনি আমাদের সকলের হৃদয় থেকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সুর জেগে উঠছে। কারুর সঙ্গে কারুর পরিচয় নেই, কিন্তু একদিন দেখবো সেই সমস্ত সুরের ধারা কখন অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে এক মহাপ্রাণ সমুদ্রে এসে মিশেছে। যখন মনে হয় যে কোনও একদিন এই মহা-আদর্শ সম্ভব হয়ে উঠবে তখন আনন্দে অধীর হয়ে উঠি। এত আনন্দ হয় যে আপনা থেকে কেঁদে ফেলি।"

মা নিশ্চল হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন—পাছে কোনও রকমে বাধা পায় বলিয়া মা জোরে নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিতেছিলেন না। লিটল রাশিয়ানের কথা শুনিতে তাঁহার ভাল লাগিত এবং সর্ব্বমনপ্রাণ দিয়া তিনি তাহার কথা শুনিতেন—শুনিতে শুনিতে মনে হইত তাঁহারই হৃদয়ের মূক অংশ যেন আজ ঐ যুবক শিশুর কথায় জাগিয়া উঠিয়া কথা কহিতেছে। একদিন সারা পৃথিবীতে মানুষ এক সঙ্গে ছুটী পাইবে সকল বেদনার বন্ধন হইতে, সকল অতৃপ্তির অশান্তি হইতে, সকল দৈন্যের প্রাণঘাতী লজ্জা হইতে। পৃথিবীব্যাপী এই মহামহোৎসবের কাহিনীর মধ্যে মা যেন জীবনের একটা সুসঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া পাইতেন।

লিটল রাশিয়ান বলিয়া চলিল, "কিন্তু এই কল্পনা থেকে জেগে উঠে যখন চারিদিকের পৃথিবীকে দেখি, দেখি চারিদিকে পাঁকের পোকার মত মানুষ গ্লানিতে ডুবে আছে—সবাই বিরক্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত—রাস্তায় কাদার মত মানুষের জীবন পথে পড়ে রয়েছে, উদাসীন পথিক দু'পায়ে চটকে চলেছে—মনে অবিশ্বাস আসে,

ঘোরতর সন্দেহ জাগে—এই মানুষ? দুঃখের বিষয়, মনে আঘাত লাগলেও, এই মানুষকেই করতে হবে অবিশ্বাস, এই মানুষকেই করতে হবে ঘৃণা। ভালবাসতে প্রাণ চায়—কিন্তু ভালবাসবো কাকে? বনের পশুর মত যে মানুষ বারে বারে তোমাকে অপমান করে, তোমাব আত্মাকে অপমান করে, তোমার মানুষের বুকে তুলে দেয় পা, তাকে ক্ষমা কবা যায়? তাকে ক্ষমা কবা উচিত নয়! অপমানকে প্রশ্রয় দেওয়া মহা-পাতক। বিশেষ কিছু ক্ষতি কবলো না, মনে করে—আজ আমি যদি অপমানিত হয়ে কোনও প্রতিকার না কবি, তাহলে কাল সেই অপমানকাবী পরমোৎসাহে আবার আর একজনকে অপমান করবে। এমনি করে অপমানের ধারা বয়েই চলবে—সেই জন্যই মানুষের বিচারে শ্রেণী-বিভাগ এসেই পড়ে—"

তিনবার মা পুত্রের সঙ্গে কাবাগারে দেখা করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনবাবই ব্যর্থ মনোরথ হন। অবশেষে একদিন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইয়া তিনি জেলখানার দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহারই মত আরও বহুলোক সমবেত —সবাই বিমর্ষ, বিরক্ত। জেলের প্রহরী একে একে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে এবং এক একজন করিয়া গিয়া দেখা করিয়া আসিতেছে। অবশেষে একটা মোটা পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া মাকে ডাকিয়া জেলের ভিতরে লইয়া গেল।

একটী ক্ষুদ্র আধ-অন্ধকার ঘরে কয়েদীর বেশে পুত্রকে দেখিয়াই মা কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কথা বলিতে গিয়া সহসা কোনও

কথা না আসায় মৃদু হাসিয়া ফেলিলেন। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কেমন আছিস্ পাভেল,—"

পাভেল মার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ও রকম করো না মা, আমি তো বেশ ভালই আছি—"

এমন সময় প্রহরী জানাইল, "দেখ মেয়ে, অত কাছাকাছি দাঁড়ালে তো চলবে না—একটু সরে দাঁড়িয়ে কথা বল।"

মা প্রহরীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। সাধারণ স্বাস্থ্যালাপের পর মা সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতদিন তোকে জেলে রাখবে? জানিনা কেন যে ওরা তোকে জেলে রেখেছে! সেই সব বই কাগজপত্র তো তেমনি আবার কারখানায় কারা ছড়াচ্ছে?"

সহসা পাভেলের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, "তাই নাকি? সত্যি?"

প্রহরী গর্জ্জিয়া উঠিল, "ও সব কথার আলোচনা এখানে চলবে না!" শুধু ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর অন্য কোনও কথা বলার হুকুম নেই।

"আচ্ছা, তাই হবে। ঘরের কথাই জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি করো মা?"

মা সহসা বলিয়া উঠিলেন—"আমিই এই সব কারখানায় নিয়ে যাই—এই মাংস, খাবার, মেরিয়ানার বদলে, আরো অনেক জিনিষ।"

মার চোখের দিকে চাহিয়া পাভেল ব্যাপার বুঝিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাহার বুক স্ফীত হইয়া উঠিল। কোনও রকমে জোর করিয়া উচ্ছ্বাস বন্ধ করিয়া পাভেল বলিল, "আমার মা-মণি! ভাল, যাহক একটা কাজ পেয়েছ—তেমন একলা বোধ হয় না তো—"

প্রহরীর সাবধানতা ভুলিয়া মা বলিয়া ফেলিলেন, "কাবখানায় কাগজ বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তাবা আমাব ঘবও সার্চ্চ কবে—"

প্রহবী গজ্জিযা উঠিল, আবাব সেই কথা!

"আচ্ছা মা, ও কথা আব তুলো না!"

এমন সময ঘডি দেখিয়া প্রহবী জানাইল, "সময় হয়ে গেছে।"

চলিয়া যাইবাব সময় পাভেল মাকে আলিঙ্গন কবিতেই মাব চোখ দিয়া নিরুদ্ধ অশ্রুব বন্যা নামিয়া আসিল।

বাডীতে আসিযা মা লিটল বাশিয়ানকে সকল কথা বলিলেন। তাহাব তিনদিন পবে একদিন সন্ধ্যাবেলায লিটল বাশিয়ান ও মা গল্প কবিতেছিলেন—এমন সময, মুখে বসন্তেব দাগ লইযা নিকোলে আসিযা উপস্থিত হইল। ঝডেব মত অন্ধকাব মুখ, যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব উপব সে বাগিয়া গিয়াছে।

ঘবে প্রবেশ কবিয়াই সে বলিল, "সোজা জেল থেকে আসছি। পথে যেতে যেতে দেখলাম তোমাদেব এখানে আলো জ্বলছে—তাই ঢুকে পডলাম—"

আগে মা নিকোলেকে দেখিতে পাবিতেন না। তাহাব কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, মুখেব চেহাবা দেখিলেই মার কেমন ভয় হইত—হঠাৎ হিংস্র জন্তুকে সামনাসামনি দেখিলে পথিক যেমন আতঙ্কিত হইয়া উঠে। কিন্তু আজ তাঁহাব নিকোলেকেও ভাল লাগিল। আদব কবিয়া লিটল রাশিয়ানেব দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, দেখচিস্ এণ্ড্রাসা, নিকোলে কি রকম রোগা হয়ে গেছে। হাঁবে, পাভেল যে এখনও ছাড়া পেলো না?"

"ছাড়াতো পায়নি দেখছি! আমাকেই যে কেন ছাড়লো, তাও

ঠিক জানি না। একদিন একেবারে ক্ষেপে গিয়ে ওয়ার্ডারকে বল্লাম, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি, নইলে এখানে আমি একটা খুন করে বসবো, হয়ত বা নিজেকেই খুন করবো! পরের দিন দেখি তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।"

লিটল রাশিয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "ফিডিয়া কেমন আছে? সেখানে বসে এখনও কবিতা লিখছে!"

"ঐ, ওকে আমি একদম বুঝতে পারি না। খাঁচার ভেতর তাকে পুরে রেখেছে তবুও সে গান গায়। আগে যাও বা কিছু বুঝতাম এখন আর কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু এইটুকু বুঝছি যে বাড়ীতে পা দিতে আর মন চাইছে না।"

সমবেদনায় মা বলিয়া উঠিলেন, "সত্যিই তো, বাড়ী যেতে মন চাইবে কেন? সেখানে আছে কে? কেউ তো বসে নেই ওর জন্তে উনুন জালিয়ে!"

পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া ধূমকুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া নিকোলে উদাস কণ্ঠে বলিল, "বাড়ী! শূন্য ঘর পড়ে আছে, ঠাণ্ডা, হিম! বেশ দেখতে পাচ্ছি মেঝেতে আরসুলা সব ঠাণ্ডায় শাদা হয়ে গিয়ে গাদা গাদা পড়ে আছে—ইঁদুরগুলোও বোধ হয় দেখবো ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মেঝেতেই পড়ে আছে। কোথায় যাব? আজকের রাত্তিরের মত আমাকে এখানে শুতে দেবেন?"

মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বাঃ, সে তোমার বলতে হবে কেন? নিশ্চয়ই, তুমি এখানে শোবে!"

তারপর যে কি বলিতে হইবে, মা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না। নিকোলে আপনার মনে বলিয়া চলিয়াছিল, "যে দিনকাল

পড়েছে, ছেলেরা লজ্জায় আব বাপ-মাদের কথা উল্লেখ করতে চায় না!"

সহসা মা ক্রুদ্ধ হইয়া নিকোলের দিকে চাহিতেই সে নিজের উক্তি ব্যাখ্যা কবিয়া বলিল, "আমি আপনার বা পাভেলের কথা বলছি না। আপনাব পরিচয় দিতে পাভেল কোনও দিন লজ্জিত হবে না। আমি আমার ও আমাব মত যারা তাদের কথা বলছি। আমার বাবার নাম উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা হয় আর সেই জন্যেই আমি কখনও আব ও-বাড়ীতে পদার্পণ করবো না। আমি জানবো আমার বাপ নেই, মা নেই, ঘর নেই, পৃথিবীতে আমি একা। আমাকে পুলিশ নজরে নজবে বেখেছে, তা না হলে আমার ইচ্ছে—আমি স্বেচ্ছায় সাইবেরিয়ায় চলে যাই—সেখানে নির্ব্বাসিতদের পালাবার ব্যবস্থা করবার অনেক কাজ আছে। তা যদি না হয়, তা হলে একটা জিনিষ প্রথম করা দরকার—"

উৎসুক হইয়া লিটল রাশিয়ান জিজ্ঞাসা করিল, কি?

"আমার মনে হয় কতকগুলো লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার!"

"বটে? এই জীবন্ত মানুষকে খুন করবার অধিকার তুমি কোথা থেকে পেলে?"

"কেন, যাদের হত্যা করতে চাই, তারাই আমাকে সে অধিকার দিয়েছে। তারা যদি আমাকে লাথি মারে, আমারও অধিকার আছে তাদের লাথি মারবার। আমাকে ছুঁয়ো না, আমিও তোমাকে ছুঁতে চাই না। লোকালয় ছেড়ে দূরে চলে যাব—সেখানে কেউ আমাকে আঘাত করতে পারবে না, আমিও কাউকে আঘাত করবো না।

সেখানে কোনও নির্জ্জন বনে এক নদীর ধারে গাছের শুকনো ডাল দিয়ে এক কুঁড়ে ঘর তৈরী করবো—সেইখানে থাকবো একলা—"

লিটল রাশিয়ান মাথা নাড়িয়া বলিল, "বেশতো, তাই কবো না কেন ?"

"এখন তা করা অসম্ভব !"

"কেন ?"

"এই যে-সমস্ত পাজী লোকদের থেকে দূবে যেতে চাইছি, আমি বেশ বুঝি, তারাই কেমন করে আমাকে টেনে রেখেছে তাদের সঙ্গে—মনে হয় আমরণ তাবা আমাকে এমনি আকর্ষণ করে রাখবে। ঘৃণার কাঁটা-বেড়া দিযে আমাব সমস্ত মনকে তারা ঘিরে রেখেছে। মুক্তি নেই, আমি জানি মুক্তি নেই ! আমি এই সমস্ত লোকদের ঘৃণা করি, সেই জন্যেই আমি তাদের ফেলে যেতে পারি না। তারা আমার জীবনকে কণ্টকিত করেছে—আমি কেন তাদের ভয়ে পালিয়ে যাব ? আমিও পদে পদে তাদের জীবনকে বিষাক্ত করে তুলবো—ঐ গরমভ—কি বদমায়েস লোক ! লুকিয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ করছে—আমার বাবাকেও তাব দলে নেবার ফিকিরে আছে—"

সহসা নিকোলে উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন বিশ্বের সমস্ত লোক তাহার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া তাহাকে আঘাত করিতে আসিতেছে। তাহাকে শান্ত করিবার জন্য লিটল রাশিয়ান বলিল, "আমি বুঝছি, তোমার অন্তরে আজ কি ব্যথা জেগেছে—"

"আমার অন্তরে ব্যথা জেগেছে কিন্তু তোমার কি জাগেনি ? হয়ত আমার ব্যথার চেয়ে তোমাদের ব্যথা আরও মহৎ আরও বৃহৎ—কিন্তু আসলে আমরা সবাই পাজী ! আমাদের পরস্পরের

মধ্যে একমাত্র বন্ধন হচ্ছে ঘৃণা কবাব, ক্ষতি কবার, আঘাত কবাব এবং আহত হওয়াব—কি বল ?"

তাহাব কথায় বাধা দিয়া লিটল বাশিয়ান বলিল, "আজ আব কোন তর্ক নয়। বুক চুঁয়ে যখন বক্ত পড়ে, আমি জানি তখন তর্ক করাব চেয়ে নির্ম্মমতা আব কিছু নেই, ভাই।"

লিটল বাশিয়ানেব কোমল সুগভীব কণ্ঠস্ববে নিকোলে সহসা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলিল, "সত্যিই আজ আমার সঙ্গে তর্ক কবাই অসম্ভব।"

"আমাব মনে হয়, আমাদেব প্রত্যেকেব মধ্যে দিয়ে এই বক্ত-ঝবা নৈবাশ্যেব ঝড় বয়ে গেছে—নয় ত বা যাবে—, আমবা প্রত্যেকেই খালি পায়ে কাঁচেব ওপব দিয়ে হেঁটে যেতে বাধ্য হয়েছি—আজ তুমি যেমন অন্ধকাবে একটুকু নিঃশ্বাসেব জন্যে হাঁফিয়ে উঠছো—তেমনি একদিন আমবা সবাই অন্ধকারে কেঁদেছি—"

"আমি ও-সব কিছু শুনতে চাই না—আমাব খালি মনে হচ্ছে, আমাব মনেব মধ্যে যেন অনববত পিঞ্জবেয় পো'বা বাঘ গর্জ্জে গর্জ্জে উঠছে—সে চাইছে—"

ধীব স্থিব শান্তভাবে লিটল বাশিয়ান বলিল, "আমি তোমাকে বিশেষ কিছুই বলতে চাই না—শুধু এইটুকু জানিয়ে দিতে চাই যে একদিন সমগ্রভাবে না হক, অধিকাংশভাবেই তোমার এ মনোভাব দূব হয়ে যাবে। ছোট ছেলেদের অসুখের মত, কতকটা হামেব মত, এও এক রকম মানুষেব মনের রোগ। দুর্ব্বল আর শক্তিমান, অল্পবিস্তর আমরা সবাই এ রোগে ভুগি। যে-মুহূর্ত্তে মানুষ আপনাকে চিনতে আরম্ভ করে, অথচ জীবনকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, বুঝে উঠতে

পাবে না জীবনে তাব স্থান কোথায়, ঠিক সেই ক্ষণেই এই রোগ মনকে পেয়ে বসে। তখন মনে হয় পৃথিবীতে কেউ আমার প্রাপ্য আমাকে দিল না, কেউ বুঝলো না আমাব অন্তরের গভীব ব্যথার কথা, সবাই যেন আছে শুধু আমাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলবাব জন্যে। তারপব দিন যাবে—বুঝবে, তোমাবও বুকে যে ব্যথা বাজে, আব সবারও বুকে তেমনি ব্যথা বাজতে পাবে—তখন বুঝবে, জীবনেব সঙ্গে তোমার যোগসূত্র কোথায় এবং এই বোঝাব সঙ্গে সঙ্গে তুমি আপনার অতীত উক্তিব জন্য আপনাব কাছেই লজ্জিত—হাঁ, লজ্জিতই হবে। ছোট্ট তোমাব বাঁশী, সামান্য তাব সুব ; মহামহোৎসবেব বিবাট ঐক্যতানে তোমাব সেই ছোট্ট বাঁশীব সুব সবাব সুবেব ওপব স্পষ্ট হয়ে বেজে উঠলো কিনা—তা শোনবাব জন্যে গির্জ্জের চূড়োয় বসে থেকে কি লাভ ? কিন্তু একদিন দেখবে, উৎসবের ঐক্যতানে তোমাবও বাঁশী সুব মেলাচ্ছে—স্বাতন্ত্র্যেব গর্ব্ব আর তার নেই—সবাব সুরে সুর মিলিয়ে কখন সে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে—সেই হবে তার সার্থকতা—বুঝলে ?"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নিকোলে বলিল, "হয়ত বুঝি ! কিন্তু বিশ্বাস করি না।"

মা আসাতে তাহাদের তর্ক সহসা থামিয়া গেল। একটা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের মুখের দীর্ঘকৃষ্ণ ছায়া দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিকোলে বলিল, "কতদিন হল আয়নাতে মুখ দেখিনি ! উঃ ! কি কুৎসিত আমার মুখ !"

স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া লিটল রাশিয়ান বলিল, "তাতে কি যায় আসে ?"

একান্ত ধীরে ধীরে নিকোলে বলিল, "শাশাঙ্কা একদিন বলেছিল, মুখই হচ্ছে মনের আয়না!"

বাধা দিয়া লিটল রাশিয়ান বলিল, "মিথ্যে কথা! শাশাঙ্কার নাক চ্যাপ্টা, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে, কিন্তু তবুও তো তার মন নক্ষত্রের মত সুন্দর!"

চা আসিতে উভয়ের বচসা থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চা-পান করার পর নিকোলে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানকার ব্যাপার কি রকম চলছে?"

লিটল রাশিয়ান সোৎসাহে তাহাদের দলের কার্য্যাবলী বলিতে লাগিল—কেমন করিয়া ধীবে ধীরে তাহারা সাম্যবাদের নীতি অনুসারে শ্রমিকদের সংহত করিয়া তুলিবাব চেষ্টা করিতেছে।

বিরক্ত হইয়া নিকোলে বলিয়া উঠিল, "ওরে বাপ্ রে, ওরকম ভাবে ধীরে সুস্থে মেপে যুকে চল্লে তো অনন্তকাল বসে থাকতে হবে—"

নিকোলের কথার ভঙ্গীতে মা মনে মনে ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। লিটল রাশিয়ান একটু ভৎ‍ৰ্সনার স্বরে উত্তর দিল—"মানুষের জীবন তো ঘোড়া নয় যে তাকে চাবুকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে—"

ঘাড় নাড়িয়া নিকোলে বলিল, "তা জানি না, কিন্তু আমার অত ধৈর্য্য নেই। আমি কি করি?"

"আমাদের মত তোমাকেও অপেক্ষা করতে হবে—নিজে শিখতে হবে, অপরকে শেখাতে হবে—সেই হবে আমাদের কাজ।"

"কিন্তু যুদ্ধ করবো কখন?"

"কখন যে রণ-তূর্য্য বেজে উঠবে সে জানি না। কিন্তু প্রথমে

আমাদের তৈরী করতে হবে মস্তিষ্ককে, তারপর গড়তে হবে হাতকে—”

ব্যঙ্গের স্বরে নিকোলে বলিল, “আর তোমাদের হৃদয় ?”

“মাথার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও গড়ে তুলতে হবে নিশ্চয়ই !”

সেদিন রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বিছানায় শুইয়া মা আপনার মনে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “এ জগতে, হে প্রভু, যত লোক আছে, প্রত্যেকেই তারা কাঁদে প্রত্যেকের আলাদা স্বরে—কবে এমনি উঠবে আনন্দের স্বর ?”

লিটল রাশিয়ান আপনার বিছানায় থাকিয়া মার অন্তরের এই সকরুণ আবেদন শুনিতে পাইল। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে সে বলিল, “মা গো, সে সময় আসতে আর দেরী নেই ! বুঝি তার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।”

প্রতিদিন আসিত, নূতন নূতন লোক লইয়া, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া। মার ভাল লাগিত। সন্ধ্যা বেলায় আসর বসিত। লিটল রাশিয়ান সকলকে নানা বিষয় পড়িয়া শোনাইত। নিকোলে একধারে বসিয়া শুনিত। খবরের কাগজে শ্রমিকদের উপর কোনও অত্যাচারের খবর শুনিলে, সে গম্ভীরভাবে লিটল রাশিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিত—

“তাহলে, দোষ কার ? নিশ্চয়ই জারের !”

তাহার সেই অসাধারণ গাম্ভীর্য্যে লিটল রাশিয়ান হাসিয়া উত্তর

দিত—"অপরাধ তার যে প্রথম বলেছিল—এটা আমার। তবে সে লোকটা কয়েক হাজার বছব আগে মারা গেছে—এখন তার সঙ্গে ঝগড়া করে কি লাভ বলো ?"

"কিন্তু তার ভূত যাদের ঘাড়ে চড়ে এখন সেই সব কথা বলায তারা কি ?"

এই সব সময় নিকোলেকে আলাদা করিয়া লিটল বাশিয়ান জীবনের জটীল সমস্তাব কথা বুঝাইতে চেষ্টা কবিত। কিন্তু কখন যে আবার তাহাব মাথা গরম হইয়া যাইত তাহাব কোনও স্থিবতা ছিল না।

এক একবার বিশ্ব সংসারেব উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিত—"শক্ত জমিতে ফসল গজাতে হলে—যেমন একহাত মাটী উপড়ে ফেলতে হয় —তেমনি একবাব এই পৃথিবীটাকে আগাগোড়া চষে ফেলা দরকার !"

সেই সময় মা বলিয়া উঠিলেন, "গরমভও একদিন তোদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলছিল !"

নিকোলে গর্জ্জিয়া উঠিল—কে ?

"গরমভ !"

"ব্যাটাব আজকাল বদমায়েসী বেড়েছে—"

অতি সরলভাবে মা বলিলেন, "প্রায়ই রাত্তিরে আমার জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে !"

নিকোলে যেন এই সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করিতেছিল—"তা না হলে সময় কাটবে কি করে ?—আচ্ছা……"

নিকোলে কাহারও কোনও কথা না শুনিয়া রাগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—

সে চলিয়া গেলে মা সভয়ে বলিলেন, "নিকোলেকে দেখলে আমাব কেমন ভয় কবে—ও যেন একটা গবম উনুনের মতো—যা পায় তাই পুড়িয়ে ফেলে—"

গম্ভীবভাবে ঘবেব মধ্যে পায়চাবি কবিতে করিতে লিটল বাশিযান বলে—"ওব সামনে গবমভেব কথা আলোচনা কবা ঠিক নয়—"

সেদিন কাবখানাব ছুটি ছিল। সন্ধ্যাবেলা বাহিব হইতে ঘুবিয়া আসিযা সহসা বাড়ীব মধ্যে একটী অতি পবিচিত কণ্ঠস্বব শুনিয়া মাব চিত্ত আনন্দে নৃত্য কবিয়া উঠিল। দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ কবিতেই তিনি শুনিলেন, পাভেল কথা বলিতেছে।

ছুটিয়া ঘবেব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া আনন্দোদ্ভাসিত আননে মা পুত্রকে জড়াইয়া ধবিযা বলিয়া উঠিলেন, ওঃ, এতদিনপবে ছুটি পেলি।

মার পাণ্ডুব মুখেব দিকে চাহিয়া পাভেলেব চোখের কোণে সহসা জল দেখা দিল। এতদিন পবে মাতৃ-গর্ব্বে তাহাব সর্ব্ব-দেহ-মন উথলিয়া উঠিতেছিল। কম্পিত-কণ্ঠে সে শুধু বলিল, মাগো, মা আমাব!

এতদিন পবে যেন পুত্র আবাব মাকে ফিরিয়া পাইল, মা যেন এতদিন পরে পুত্রকে হৃদয়-ভবিয়া দেখিল। পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা বলিলেন, "আমি তো তোকে জন্ম দিই নি—তুইই আমাকে জন্ম দিয়েছিস্—আমি আর তোর জন্যে কি করতে পেরেছি বল্?"

পাভেল তেমনি বিহ্বলভাবে বলিল, "তুমি আমাদের সাধনার পথে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছ। তোমাকে কি বলবো মা, আজ আমার কত আনন্দ! যে আমাকে জগতে এনেছে—জগৎ-চলার পথে তাকেই পাশে পাওয়া—জানো না মা, জগতের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য!"

আনন্দে মার বাক-রোধ হইয়া আসিতেছিল। বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া মা বলিলেন, "ঐ দুষ্ট ছেলে এণ্ড্রয়াসা, আমাকে এরি মধ্যে অনেক জিনিষ শিখিয়েছে—ওর কাছে আমি চির-ঋণী।"

বন্ধুর দিকে চাহিয়া পাভেল বলিল, "আমি ওর কাছেই সব শুনেছি—"

"মাগো, এণ্ড্রয়াসা বুড়ো বয়সে আমাকে বলে কি না লেখাপড়া শিখতে হবে—"

"তাইতে বুঝি তুমি ওর কাছে অভিমান দেখিয়ে লুকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে?"

"মাগো, লুকিয়ে কি পড়বার জো আছে? তাও একদিন দুষ্টু ছেলে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেল্লে—"

মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। দুই বন্ধুতে বহুদিন পরে আবার প্রাণ ভরিয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিল।

দুইটী কণ্ঠের বাদ প্রতিবাদে সেই ঘর আবার ভরিয়া উঠিল।

রাশিয়ার গ্রামে বসন্তের আবির্ভাবলগ্ন আগাইয়া আসিতেছিল। চারিদিক হইতে বরফ গলিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছিল এবং তাহার

স্থলে কর্দ্দমাক্ত দেহে পৃথিবী আর এক নূতন রূপে জাগিয়া উঠিতেছিল। যত দিন যায়, তত বাড়ে কাদা। চিমনীব ধোঁয়া আর কাদার গন্ধে গ্রামের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

পাভেল এবং তাহার সহযাত্রী বন্ধুগণ 'মে' দিবস উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। প্রত্যহই আবাব তাহাদের দেখা হয়; আবার আলোচনা চলে দীর্ঘ বাত্রি ধবিয়া। মা এখন অনেকটা সঙ্কোচহীন হইয়া সেই সমস্ত আলোচনায় যোগদান করেন। আইভানোভিচ তাহার স্বাভাবিক হাস্য-রসের অবতারণা দ্বারা মাঝে মাঝে সাম্যবাদী-দের এই রস-হীন আলোচনায় একটু সুরের বৈচিত্র্য আনিয়া দেয়। একদিন গম্ভীর ভাবে ঘরে প্রবেশ কবিয়া সমবেত বন্ধুদের আহ্বান করিয়া বলিল, সহযাত্রী বন্ধুগণ, বর্ত্তমান বাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া একটা নূতন যুগ আনা অতি গুরুতর ব্যাপার—

সহসা আইভানোভিচেব এই বিষণ্ন স্বরে সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আইভানোভিচ বলিয়া চলিল—"কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনকে দ্রুতগতিতে সম্ভবপব করিয়া তুলিতে হইলে অবিলম্বে আমার এক জোড়া বুটের প্রয়োজন—আর সেলাই করিয়াও ইহার সদ্ব্যবহার করা যায় না এবং শ্রমিকদের মুক্তি না দেখিয়া আমার এই জগৎ হইতে অন্য কোনও গ্রহে যাইতে বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নাই।"

একদিন আইভানোভিচের কথা উল্লেখ করিয়া পাভেল লিটল রাশিয়ানকে বলিল, জানো, আন্দ্রি, যাদের বুকে যত তীব্র ব্যথা তাদের মুখে হাসি, তত বেশী।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বাভাবিক শান্তভাবে লিটল রাশিয়ান বলিল, তাহলে এতদিনে সমগ্র রাশিয়া হেসে ফেটে পড়্তো—

নাটাশাও আসিত। সেও এবার কারারুদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু অন্য কারাগারে ছিল। মা লক্ষ্য করিতেন যে যতক্ষণ নাটাশা থাকিত ততক্ষণ লিটল রাশিয়ান খুব হাসিত, সকলকে ক্ষেপাইয়া দুষ্টমি করিত এবং বিশেষ করিয়া নাটাশাকে হাসাইতে কত না চেষ্টা করিত। সে চলিয়া গেলে সে আপনার মনে শীষ্ দিতে দিতে সারা ঘর শুধু পায়চারী করিয়া বেড়াইত।

শাশাঙ্কা যখনই আসিত, তখনই তাহাকে বিশেষ ব্যস্ত দেখাইত। তাহার মুখ সর্ব্বদাই বিষণ্ণ গম্ভীর। একদিন পাভেল তাহাকে ঘর হইতে ডাকিয়া রান্নাঘরের সম্মুখে লইয়া গোপনে কি বলিতেছিল; রান্নাঘরে থাকিয়া মা তাহা সমস্তই শুনিতে পাইলেন—

মেয়েটী জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "নিশান কি তোমার হাতেই থাকবে?"

"নিশ্চয়ই"

"একি একেবারে ঠিক হয়ে গেছে?"

"নিশ্চয়ই, এ অধিকার—"

"আবার যাবে কারাগারে?" পাভেল কোন উত্তর দিল না। শাশাঙ্কা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"ওটার ভার অন্য আর একজনের ওপর দিলে হতো না?"

বেশ জোর করিয়া পাভেল উত্তর দিল, না।

"কিন্তু একবার ভেবে দেখো—তোমার প্রভাব কতখানি! তুমি আর লিটল রাশিয়ান হলে এখানকার বিপ্লব আন্দোলনের প্রাণ। তুমি যদি এবার কারারুদ্ধ হও তাহলে তোমায় কোন্ দূর দেশে পাঠিয়ে দেবে—"

শাশাঙ্কার কথায় মার অন্তর ক্ষণে ক্ষণে সচকিত হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল তাঁহার অন্তরে কে যেন বিন্দু বিন্দু করিয়া হিম বর্ষণ করিতেছে।

"না—সে যাই হক—আমি স্থির করেছি, সেদিন আমার হাতেই থাকবে পতাকা—"

"যদি আমি নিজে তোমার কাছে ভিক্ষে চাই—আমি—"

শুনিতে পাইলেন যে পাভেল সহসা উত্তেজিত হইয়া একান্ত কঠোর ভাবে বলিতেছে—

"তোমার এরকম কথা বলা উচিত নয়! তুমি, তুমি কেন এর মধ্যে আসছো?"

একান্ত নিম্ন স্বরে শাশাঙ্কা বলিল, আমি তো মানুষ!

পাভেল যেন আপনার অসহায়তা গোপন করিবার জন্য আরও দ্রুতগতিতে বলিল, "মানুষ তা জানি, খুব ভাল মানুষই! তুমি জানো তুমি আমার কত প্রিয়, তাই সেই সুবিধে বুঝে—"

সহসা শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, আচ্ছা তাহলে বিদায়!

রান্নাঘরে বসিয়া পায়ের শব্দে মা স্পষ্টই বুঝিলেন যে শাশাঙ্কা ছুটিয়া চলিয়া গেল। একটা ভারী বোঝা যেন মার বুকে চাপিয়া বসিল। কথাবার্তার মধ্যে আসল ব্যাপার কি তিনি তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শুধু এইটুকু বুঝিয়াছেন যে, সম্মুখে আর একটা ভীষণতর বিপদ কিছু আসিতেছে। তাঁহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া শুধু এই প্রশ্ন জাগিতেছিল, পাভেল কি করিতে চায়?

ঘরের মধ্যে তখন গরমভকে লইয়া পাভেল ও লিটল্‌ রাশিয়ানের আলোচনা হইতেছিল। ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত পায়চারি

করিতে করিতে একান্ত চিন্তিতভাবে লিটল রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, গরমভকে নিয়ে কি করা যায়? গ্রামের লোক হয়েও এই রকম আমাদের পেছনে লাগবে?

পাভেল গম্ভীবভাবে বলিল, "একটা কাজ করা যাক্। তাকে গিয়ে স্পষ্টই বলি একাজ ছেড়ে দিতে—"

"তাহলে সে আগে তোমাকেই ধরিয়ে দেবে—"

এমন সময় ঘরের মধ্যে আসিয়া মাথা নত কবিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাভেল, আবার তুই কি করতে চলেছিস্?"

"কবে? কখন?"

"পয়লা মে, পয়লা মে!"

"ওঃ! তুমি শুনেছ বুঝি? কিছু না—আমি আমাদের দলের সামনে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রায় বেরুবো—আমার হাতে থাকবে আমাদের পতাকা। অবশ্য এর জন্যে পুলিশে আবার আমাকে গ্রেফতার করতে পারে।"

সহসা মার মনে হইতে লাগিল যেন তাহার চোখ জ্বলিতেছে, মুখের ভিতর শুকাইয়া আসিতেছে। কম্পিত হস্তে তিনি পুত্রের হাত ধরিলেন।

"তুমি বুঝছো না মা! এ আমাকে করতেই হবে! এ যে আমার আনন্দ!"

কোনও রকমে ধীরে মাথা তুলিয়া মা বলিলেন, "কৈ, আমি তো কিছু বারণ করছি না!" চোখ তুলিয়া পুত্রের চোখের দিকে চাহিতেই মুখ নত করিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মার হাত ছাড়িয়া দিয়া মৃদু তিরস্কারের সুরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া

পাভেল বলিল, "এ সম্বন্ধে তোমার এ রকম কাতর হওয়া উচিত নয় মা! তোমারও উচিত আনন্দ করা! কবে ছেলেরা এমন মা পাবে, যারা হাসিমুখে ছেলেদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।"

লিটল রাশিয়ান গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রের আলাপ শুনিতেছিল। পাভেলের কথায় সে বলিয়া উঠিল, "খুব হয়েছে! আর বেশী বক্তৃতা করতে হবে না!"

মা মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কৈ আমি তো তোকে কিছুই বলিনি। আমি তোর কাজে বাধা দিতে চাই না। তবে কি করবো, পোড়াচোখে জল আসে—মা হয়েছি যে!"

পাভেল আরও উত্তেজিত হইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া রূঢ় স্বরে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "ভালবাসা! স্নেহ! জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যারা দেয় বাধা, তারাও বুঝি এমনি ভালবাসে!"

পাভেলের কণ্ঠস্বরে মা ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র তাঁহার অন্তরে আরও রূঢ় আঘাত করিবে। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "ভুল বুঝিস্ না বাছা! আমি কি তাই বলছি! আমি বুঝছি বৈ কি! নিশ্চয়ই, তোর সঙ্গীদের জন্যে তোর একাজ করাই উচিত!"

"না, তুমি বোঝ নি! আমার সঙ্গীদের জন্যে নয়, এ আমি একান্ত আমার জন্যেই করছি! শুধু তাদের জন্যে যদি হতো তা হলে আমি পতাকা না নিলেও পারতাম। কিন্তু আমার মন চাইছে—এ আমাকে করতেই হবে—"

আবার চোখে জল ভরিয়া আসিতেই মা তাড়াতাড়ি চোখের জল লুকাইবার জন্য রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। আধ-ভেজান

দরজার মধ্য হইতে তিনি শুনিতে লাগিলেন—পাভেল ও লিটল রাশিয়ানে ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে—

"ওঁকে আঘাত করে খুব কৃতিত্ব হলো, না পাভেল?"

পাভেল উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোমার কোনও অধিকার নেই এ রকম ভাবে প্রশ্ন করবার!"

"তা হলে আমি কিসের তোমার কমরেড—যদি বোকামীর হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার অধিকার আমার নেই? কেন মাকে বলতে গেলে এসব কথা?"

"আমি চাই মানুষ সর্ব্বদাই স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কথা বলবে। যখন সে মনে করবে হাঁ—তখন তাকে স্পষ্ট করে বলতেও হবে, হাঁ! এর মধ্যে আর কোনও কথা নেই!"

"কিন্তু ওঁকেও তুমি এ রকম ভাবে কথা বলবে?"

"নিশ্চয়ই—ওঁকে কেন—প্রত্যেক লোককেই বলবো! যে ভালবাসা, যে-বন্ধুত্ব জড়িয়ে চলার পথে আনে বাধা, সে-ভালবাসা, সে-বন্ধুত্ব আমি চাই না!"

"সাধু! সাধু! কিন্তু হে মহাবীর, শাশাঙ্কার সঙ্গে যখন কথা বল্লে তখন তো এ সুরে সব কথা বলো নি?"

"নিশ্চয়ই বলেছি!"

"যে ভাবে তুমি মার সঙ্গে কথা বল্লে? কখ্খনই না! আমি স্বকর্ণে সমস্ত শুনি নি—কিন্তু আমি বেশ বুঝছি তুমি সেখানে কণ্ঠস্বরে কত কোমলতা এনে দিলে—সে সুরই আলাদা! আর বুড়ো মার সম্মুখেই যত তোমার বীরত্ব! তোমার এ রকম বীরত্বের মূল্য এক কাণা কড়িও না।

রান্নাঘরে বসিয়া মার মনে হইল বোধ হয় এই ব্যাপার লইয়া পাভেল ও লিটল রাশিয়ানের মধ্যে কলহ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া তাঁহার উপস্থিতির কথা জানাইবার জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে আপনার মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন,

"উঃ! কি ঠাণ্ডা। বসন্ত এলো তবুও একি ঠাণ্ডা!" আপনার মনে রান্নাঘরের জিনিষ-পত্রগুলি অকারণে নাড়াচাড়া করিয়া শব্দ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "উঃ, কি দিনকালই পড়েছে! দিন দিন ঠাণ্ডা বাড়ছে কিন্তু মানুষগুলো হচ্ছে দিন দিন গরম।"

মা শুনিলেন, তাঁহার কথার ফল ধরিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর লিটল রাশিয়ান বলিতেছে—"শুনতে পেয়েছ মার কথা? বুঝলে কি কিছু? তোমার কথার চেয়ে ওতে ঢের বেশী মানে আছে।"

কম্পিত দেহে ঘরে প্রবেশ করিয়া মা দুজনকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের একটু চা দেবো কি?"

কেহই কোনও উত্তর দিল না। কথা বলিতে মার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। তাহা লুকাইবার জন্য তিনি আপনার মনে বলিলেন, "উঃ, ঠাণ্ডায় মরে গেলুম।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকবার পর পাভেল নিঃশব্দে উঠিয়া মার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, রাগ করেছ মা—মণি! আমায় ক্ষমা করো—আমি এখনও সেই ছোট্ট পাভেল—তেমনি বোকা!

পাভেলের মাথা বুকে টানিয়া লইয়া এক অপূর্ব্ব বেদনার স্বরে মা বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে আর আঘাত দিস্‌নে। ভগবান তোর চিরকল্যাণ করুন—এই আমার একমাত্র কামনা। জানি—তোর জীবন শুধু তোরই কিন্তু তুই কি জানবি মার বুকের জ্বালা? অসম্ভব! অসম্ভব! তোদের সকলকে দেখলেই আমার কান্না পায়—মনে হয় তোবা সবাই আমারই রক্ত-মাংস! তোদের জন্যে যদি আমি না কাঁদবো—তবে তোদের জন্যে কাঁদবে কে? আজ এই তোরা আছিস্‌—কাল হয়ত নিরুদ্দেশ হয়ে যাবি—আবার তোদের মতন নতুন ছেলে সব আসবে—তারাও যাবে তোদের পেছনে পেছনে—এমনি করে দলের পব দল তোরা চলেছিস্‌ পিছনের সর্ব্বস্ব ফেলে। আমি কি জানি না—এর চেয়ে সুন্দর, এর চেয়ে পবিত্র শোভাযাত্রা জগতে আব নেই?"

একটা অপূর্ব্ব বেদনা-বিহ্বল আনন্দ আজ সহসা মার অন্তরে অভূতপূর্ব্ব এক বিরাট ভাব-রসের উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিল। সহসা আর মার কোনও কথা জোগাইয়া উঠিতেছিল না, শুধু এই অপ্রকাশের মৌন পীড়নে তাঁহার সর্ব্ব-দেহ ক্ষণে ক্ষণে দুলিয়া উঠিতেছিল। এতদিন যে-নয়নে শুধু নির্য্যাতনের গ্লানি স্তূপাকারে জমা হইয়াছিল, আজ কোথা হইতে বেদনার ইন্ধনে সহসা সেখানে সহস্র বহ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিল।

পাভেলের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মা মৃদু হাসিয়া লিটল রাশিয়ানকে বলিল, আর তোকেও বলি এণ্ড্রয়াসা, তুই ওর চেয়ে ঢের বয়সে বড়—তোর কি উচিত ওর সঙ্গে এই রকম জোর দেখিয়ে চেঁচিয়ে তর্ক করা—

ঘাড় সোজা করিয়া লিটল রাশিয়ান বলিল, "চেঁচাব না—আলবৎ চেঁচাবো! আরও জোরে চেঁচাবো—এবং প্রয়োজন হলে একদিন ওকে রীতিমত প্রহারও করবো—"

মা অগ্রসর হইয়া লিটল রাশিয়ানের দুটী হাত সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে আমার দুষ্ট ছেলে!

পাভেলের দিকে চাহিয়া গম্ভীর মুখে লিটল রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "ওহে বীরপুরুষ, তুমি শুনো না—জানেন মা, ওকে কতখানি ভালবাসি! তবে ও আজকাল নতুন জামা পরেছে কিনা! ওর ঐ নতুন জামা আমার ভাল লাগে না। ওর ধারণা জামাটা ওর গায়ে মানিয়েছে খুব ভাল—তাই দুহাত দিয়ে জামাটা তুলে ও লোকের গায়ে পড়ে বলে বেড়াচ্ছে—দেখছো, কেমন জামা পরেছি? জামাটা হয়ত ভালই কিন্তু লোকের গায়ে পড়ে তা জানাবার দরকার কি? ও জামা গায়ে না দিলেও আমাদের শীত দিব্যি কেটে যায়!"

লিটল রাশিয়ানের ব্যঙ্গে পাভেল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "বলি বকবকানি থামাবে কিনা? তোমার জিভে যে যথেষ্ট বিষ আছে—তাতো একবার ভাল করেই জানিয়েছ—আবার কেন?"

পাভেল বসিয়া লিটল রাশিয়ানের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

"হাত ছাড়—; এখন হাত ধরে টানছো, কখন নিঃশব্দে ছেড়ে দেবে, সামলাতে না পেরে আমিই যাব পড়ে!"

একটা কিছু করা উচিত মনে করিয়া মা হাসিয়া দুজনের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোরা দুজনে উঠে দাঁড়া—আমার সামনে তোরা আজ একবার আলিঙ্গন কর—আমি দেখি—লজ্জা কিসের—"

বিহ্বল হইয়া লিটল রাশিয়ান বলিল, লজ্জা—লজ্জা কেন?

দুই বন্ধুতে উঠিয়া দুইজনকে আলিঙ্গন করিল। একটী মুহূর্ত্তের জন্য দুইটী দেহ ও একটী আত্মা মৃত্যুজয়ী মৈত্রীর অগ্নি-শিখায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এবার বেদনা'র নয়, আনন্দের উদ্বেলিত অশ্রুধারা মার গণ্ডদেশ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। হাত দিয়া চোখ মুছিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন, "মেয়েদের চোখ শুধু কাঁদতেই জানে—যখন সে দুঃখ পায় তখনও সে কাঁদে—যখন আনন্দে তার মন ভবে ওঠে, তখনও সে কাঁদে!"

পাভেল উঠিয়া মার পাশে আসিযা বসিল। অন্তরের দুর্ব্বলতাকে লুকাইবার প্রচেষ্টায় লিটল রাশিয়ান উঠিয়া গম্ভীর ভাবে ঘোষণা করিল, "মা আপনি একটু বসুন, আমি রান্নাঘরে গিয়ে দেখি উনুনে কয়লা আছে কিনা—নইলে খানকতক কাট চেলা করে আনি—"

মাতা ও পুত্র শুনিল, লিটল রাশিয়ান রান্নাঘর হইতে তাহারা যাহাতে শুনিতে পায়, এমনি ভাবে বলিতেছে, গর্ব্ব করা উচিত নয়, তবুও একথা আজ বলবো—আসল জীবনের স্বাদ—করুণায়, স্নেহে সহানুভূতিতে সুগভীর জীবনের অমৃত-আস্বাদ আজ জীবনে প্রথম এইমাত্র পেলাম—"

পাভেল মার দিকে চাহিয়া সায় দিয়া বলিল, সত্যি!

বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মা শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আজকাল মনে হয় সব যেন বদলে গেছে। আজকের আনন্দ আলাদা, আজকের দুঃখ আলাদা। সব কথা ভালো করে বুঝি না—

বোঝাতে পারি না—কিন্তু মনে হয় কোথায় কি যেন সব বদলে গেছে—”

মার কথা শুনিয়া রান্নাঘর হইতে আসিয়া লিটল রাশিয়ান যোগদান করিল, “এই সময় ঠিক এই রকমই হয় মা! এই পুরানো দেহে আজ এক নতুন প্রাণ জন্ম গ্রহণ করেছে—অন্ধকারে আজ নবীন সূর্য্যোদয়! সবার অন্তর আজ স্বার্থের সংঘাতে সংক্ষুব্ধ, অন্ধ লোভ ও মোহে আজ জীবন বিষাক্ত; হিংসায় ক্রূর, নীচতায় নির্ম্মম, গ্লানিতে আর দৈন্যে পঙ্গু মনুষ্যত্ব আজ মুমূর্ষু। মনে হয় যেন সমগ্র ধরণী ব্যাধিগ্রস্ত। বেঁচে থাকতে যেন ভয় করে সবার। প্রত্যেকেই ভাবছে শুধু তারই বুকে বুঝি ব্যথা লাগছে। কিন্তু এরই মাঝখানে আজ এসেছে এক নূতন মানুষ, হাতে তার প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত দীপ-শিখা। আলোর উল্লাসে সে চীৎকার করে বলে, ওরে অন্ধ, ব্যথা তোর একার নয়, বেঁচে থাকবার, আনন্দ পাবার অধিকার শুধু তোর একলার নয়! আজ সবারই সমান দরকার বেঁচে থাকবার, আনন্দে বেঁচে থাকবার! কিন্তু যে-মানুষ নিয়ে এসেছে আজ এই নতুন বার্ত্তা, সে দাঁড়িয়ে আছে একলা, কেউ নেই তার সঙ্গে, কেউ নেই তার সঙ্গী। সেই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতার মধ্যে তার চিত্ত আজ বেরিয়েছে বন্ধুর অনুসন্ধানে! তাই সকল ক্ষুদ্রতা, সকল জীর্ণতার ঊর্দ্ধে তার মাঙ্গলিক আহ্বান -ধ্বনি বেজে উঠছে—সকল দেশের সকল জাতির হে মানবের দল, এই রক্ত-সন্ধ্যায় আবার ফিরে এসো সব এক গোষ্ঠীর মধ্যে। ঘৃণা নয়, প্রেম আজ জীবনের ধাত্রী! মাগো, আজ শুনি

সেই আহ্বান-ধ্বনি বেজে উঠছে দূরে দূরান্তরে, দেশে দেশান্তরে—।

পাভেল চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমিও শুনি, বন্ধু, আমিও শুনি!"

সহসা এই পরমোৎসাহে মা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাহাদের দুইজনের দিকে চাহিয়া রহিলেন—ভিতরে তাঁহার অন্তর প্রতিমুহূর্ত্তে কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

আপনার অন্তরের উল্লাসে লিটল রাশিয়ান বলিয়া চলিয়াছিল, "যখন একলা থাকি, রাত্রে যখন ঘুমোতে চেষ্টা করি, সর্ব্বদাই শুনি সেই ধ্বনি মানুষের দ্বারে দ্বারে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয় এই উৎপীড়িতা, এই দুঃখ-দিগ্ধা ধরণীর অন্তরতম স্থল থেকে যেন সেই ধ্বনির প্রত্যুত্তর জেগে উঠছে, জয়, নব-অরুণ-উদয়!"

পাভেল কি বলিতে যাইতেছিল মা তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া চুপি চুপি বলিলেন, চুপ কর এখন, ওকে বাধা দিস্‌নে—

লিটল রাশিয়ানের চোখে যেন সেই অরুণ-উদয়ের আভা। দুই হাতে দরজার দুইদিক ধরিয়া সে বলিয়া চলে, "কিন্তু তবুও মানুষের ভাগ্যে এখনও সঞ্চিত আছে বহুবেদনার বিষতিক্ত গ্লানি; জানি লৌহ-হস্তের পীড়নে অন্তর চুয়ে রক্ত-ঝরার এখনও বহু আছে বাকি—কিন্তু তবুও সেই সমস্ত বেদনার—এই আমার, এই তোমার হৃদয় চোঁয়া রক্তের বিনিময়ে যে আশা আজ জাগলো বুকে, যে আনন্দ আজ এলো রক্তে, শিরায়, উপশিরায় তার তুলনা হয় না। মনে হয়—আমি বিরাট, ঐ নক্ষত্রের মত আপনার জ্যোতির্লোকে, আমি

সুমহান্। তাই এই দুঃখ, এই বেদনা, এই গ্লানি এই সমস্তই সইছি পরমানন্দে পরমোল্লাসে—শুধু অন্তরের সেই পরম অনুভূতির জন্যে। কেউ নেই, কোন শক্তি নেই, সে আনন্দকে মেরে ফেলতে পারে। দুর্ব্বার অমোঘ তার শক্তি, উদার তার অভ্যুদয়!”

পরের দিন সকাল বেলায় পাভেল আর লিটল রাশিয়ান চলিয়া যাইবার পরই মেরিয়ানা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া খবর দিল, গরমভকে কে খুন করেছে!

সহসা এই সংবাদ শুনিয়া মা চমকাইয়া উঠিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হত্যাকারীর মূর্ত্তি যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বিহ্বলভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে, কে করলো এ কাজ?”

“বলি, সে কি মড়া আগলে বসে আছে যে তার নাম জানবো। কাজ সেরেই সে পালিয়ে গেছে—কেউ তার পাত্তা পায় নি।”

মা মেরিয়ানাকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে মেরিয়া-না বলিতে লাগিল, “এখন হলো বিপদ। পুলিশ এসে আবার বাড়ী ঘরদোর ওলট-পালট করবে। একটা ভালো, তোমার বাড়ীর ছেলেগুলো কাল রাত্তিরে বাড়ীতে ছিল আমি নিজে সাক্ষী দেবো। কাল রাত্তিরে বাড়ী ফেরবার সময় একবার তোমার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, তোমরা সব বসে গল্প করছো।”

মেরিয়ানার কথায় মা সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি যে বলিস্ তুই? এ ব্যাপারে ওদের কি কেউ সন্দেহ করছে নাকি?

“লোকে সন্দেহ করছে বৈ কি। ঐ ছোঁড়াদের মধ্যেই কেউ এ কাজ করেছে—কেননা গরমভ ওদের পেছনেই তো লেগে ছিল—

মার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কি এক অজানা আশঙ্কায় সহসা তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"দাঁড়ালে যে, চলো! দেবী হলে হয়ত আর দেখতে পাবে না।"

মা বিহ্বলভাবে চলিতে লাগিলেন। তাঁহাব চোখের সম্মুখে খালি নিকোলের ক্রুদ্ধ মুখখানি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখিলেন, চারিদিকে কৌতূহলী জনতা। মধ্যে গবমভেব মৃতদেহ পুলিশ পবিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়া আছে। একহাত তাহার জামার ভিতরে ঢোকান, আব এক হাতের আঙুল মাটী আঁকড়াইয়া রহিয়াছে।

পাশ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "কোথাও বক্তের চিহ্ন নেই। এক ঘুষিতেই সাবাড় কবে দিয়েছে।"

ধীরে মা বাড়ী ফিরিলেন।

পাভেল ও লিটল রাশিয়ান বাড়ী আসিতেই মা উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, কাউকে গ্রেফতাব করেছে না কি?

গম্ভীব ভাবে লিটল বাশিয়ান বলিল, "কই, এখনো তো শুনি নি।"

তাহাদের দুই জনের মুখের দিকে চাহিয়া মা দেখিলেন, তাহারা দুই জনেই গম্ভীর, বিমর্ষ।

মা তাহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া অতি নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, নিকোলেকে কেউ সন্দেহ করছে না তো?

মার দিকে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া পাভেল বলিল, "না, তার নাম কেউ করছে না। সে তো এখানে নেই। কাল সকাল বেলাই নদী পেরিয়ে সে কোথায় চলে গেছে—আজও ফেরেনি।"

দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, ভগবান, রক্ষা কর!

খাবার সময় পাভেল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আমি এ সব বুঝতে পারি না, কিছুতেই বুঝতে পারি না—"

গম্ভীর স্বরে লিটল রাশিয়ান বলিল, "কি, কি বুঝতে পারো না?"

"দুমুটো খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে বলে যে হত্যা করতে হবে— একথা ভাবতে আমার ভয়ানক কুৎসিত লাগে!"

হাসিয়া লিটল রাশিয়ান বলিল, "নিরুপায়! এই সনাতন জীবন ধারা!"

পাভেল ধীরে উত্তর দিল, "নিরুপায় নয়, অন্যায়!"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া লিটল রাশিয়ান টেবিল হইতে উঠিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি বলছো, অন্যায়? কিন্তু এ অন্যায়ে কে প্রণোদিত করেছে? ঐ যারা সৈন্য রেখেছে, ঐ যারা ঘাতক রেখেছে, ঐ যারা অন্ধকার কারাগার তৈরী করেছে মনুষ্যত্বকে পিষে ফেলবার জন্যে—তারাই তো অধিকার দিয়েছে আমাকে হাত তুলতে তার বিরুদ্ধে যে সবচেয়ে এগিয়ে আসে তাদের মধ্যে থেকে আমাকে পিষে ফেলবার জন্যে।"

উত্তেজিত হইয়া লিটল রাশিয়ান ঘরের এ-কোণ হইতে ও-কোণ পর্য্যন্ত পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে হইতেছিল প্রতি পাদক্ষেপে কোন এক অদৃশ্য বাধাকে যেন সে এড়াইয়া চলিতেছে। সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু একথাও সত্য যে জীবনের যাত্রাপথে সহসা কখন কখন এমন এক সন্ধিক্ষণ আসে যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষকে নিজেরই বিরুদ্ধে নিজেকে চলতে বাধ্য হতে হয়। তোমার আদর্শের

জন্যে তোমার প্রাণ দেওয়া—সে তো খুব সহজ সোজা ব্যাপার! তার চেয়েও যা প্রিয়, তাই দাও—"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর সে আবার বলিয়া চলিল, "জানি, একদিন এই পৃথিবীতে সেই মহাদিন আসবে, যেদিন প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখলে আনন্দে দুলে উঠবে! এই মহা-জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে সেদিন নক্ষত্রের মত ভাস্বর হয়ে উঠবে মানুষ। প্রত্যেকের বাণী হবে সঙ্গীতের মত সুন্দর। সেদিনকার পৃথিবীর মানুষ স্বাধীনতার পরম-প্রসাদে মুক্ত-হৃদয়ে বিচরণ করবে। অন্তর হবে তার সর্ব্বদ্বেষ সর্ব্বহিংসা বিমুক্ত; জানি, সেদিন ঘুচে যাবে যুক্তির আর অন্তরের সকল দ্বন্দ্ব। মানবতার দেউলে জীবন ফুটে উঠবে সব চেয়ে সুন্দর ফুলের মত। তখনি হবে পরিপূর্ণ জীবন, মুক্ত, সত্য, সুন্দর! সেই অনাগত মহাদিনের জন্যে আমি আজ প্রস্তুত আমার সমস্ত কিছু উৎসর্গ করতে—যদি প্রয়োজন হয়, আমার হৃদয় উপড়ে ফেলে আমি নিজে মাড়িয়ে যাব তাকে!"

মা চাহিয়া দেখিলেন যে লিটল রাশিয়ানের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

পাভেল উঠিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে লিটল রাশিয়ানের দিকে চাহিল। বলিল, "কি হল তোমার আন্দ্রি?"

বেহালার তারের মত সমস্ত দেহকে টানিয়া উন্মাদের মত মাথা নাড়িয়া মার দিকে চাহিয়া লিটল রাশিয়ান বলিল, "আমি গরমভকে হত্যা করেছি!"

সহসা বজ্রাহতের মত মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া লিটল রাশিয়ানের দুটী হাত জড়াইয়া ধরিলেন। 'অপরাধের

কেহ যেন সে শোকোচ্ছ্বাস না শুনিতে পায়, এমনি মৃদু কম্পিতস্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওরে এণ্ড্রয়াসা, ওরে এ কি তুই করলি, ওরে দুঃখী!"

আপনাকে সংহত করিয়া লইয়া লিটল রাশিয়ান স্থির কণ্ঠে বলিল, "আমি সবই স্বীকার করবো—কেমন করে আমি এ কাজ করলাম—"

"আমি যদি নিজের চোখেও দেখতাম. তাহলেও বিশ্বাস করতাম না যে এ তোর কাজ। না, না, তুই কখনও এ কাজ করতে পারিস্ না!"

"সত্যি, আমিও ভাবতে পারি না যে তুমি একাজ করেছ!"

করুণ মথিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে লিটল রাশিয়ান বলিতে লাগিল, "তুমি তো জানো, বন্ধু, আমি এ কাজ করতে চাইনা, চাইনি। তুমি আগিয়ে চলে গেলে, আমি আইভানের সঙ্গে গল্প করতে করতে কারখানার দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে এক পথের বাঁকে গরমভ আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আইভানও বাড়ী চলে গেল। আমি কারখানার দিকে চলেছি, দেখি তখনও সে আমার সঙ্গে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে হেসে আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। রাগে সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বলছিলো। সে বলতে লাগলো, আমাদের কাণ্ডকারখানা সব পুলিশ জানতে পেরেছে—পয়লা মে'র আগেই আমাদের সব যথাস্থানে পৌছে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি একটীও কথা বলিনি। তারপর—"

পাভেল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বুঝি, বন্ধু, তোমার ব্যথা আমি বুঝি!

"তারপর সে আমার নানারকম প্রশংসা করতে লাগলো—আমার মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক আর সে দেখে নি—আমার উচিত নয় দলে পড়ে এই কাজ করা—আমার উচিত—"

একটু থামিয়া লিটল রাশিয়ান একবার গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "আমার উচিত তাদের সঙ্গে যোগদান করা! সে যদি আমাকে মারতো, সে ছিল অনেক ভাল। আমার পক্ষে তা সহ্য করা সহজ হতো, তারও পক্ষে তা হতো ভাল। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরতম স্থলে সে যখন এমনিভাবে কাদা ছিটিয়ে দিল, তখন হঠাৎ আমার সর্ব্বদেহ রাগে জ্বলে উঠলো, কোনও কথা না বলে সমগ্র দেহের শক্তি দিয়ে এক ঘুষি মেরে তার দিকে আর না তাকিয়ে আমি সোজা চলে এলাম। চলতে চলতে শুনতে পেলাম সে পড়ে গেল, একটা শব্দ হল। স্বপ্নেও ভাবিনি ভয়ঙ্কর কিছু হবে। রাস্তার ধারে একটা ব্যাঙকে চিপটে দিয়ে মানুষ যে ভাবে নির্ভাবনায় চলে, তেমনি ভাবে আমি চলে এলাম। তারপর হঠাৎ শুনি চারদিক থেকে রব উঠছে—গরমভকে কে হত্যা করেছে! আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলাম না—কিন্তু ক্রমশঃ আমার সর্ব্ব-শরীর হিম হয়ে এলো—এই হাত দুটো একেবারে অচল না হয়ে গেলেও মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ খুব ছোট হয়ে গেছে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া নিজের দুটী হাতের দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "মনে হয় সমগ্র জীবনে ও হাত থেকে এই দুঃসহ গ্লানির পঙ্কিলতা ধুয়ে ফেলতে পারবো না।"

ক্রন্দন-রত কণ্ঠে মা বলিলেন, "ধুয়ে যাবে, ওরে ধুয়ে যাবে, যদি মন তোর থাকে এমনি সাদা!"

লিটল রাশিয়ানের দিকে চাহিয়া পাভেল জিজ্ঞাসা করিল—এখন কি করবে ভাবচো?

ঈষৎ চিন্তিতভাবে লিটল রাশিয়ান উত্তর দিল, "আমি যে একাজ করেছি, তা স্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্র ভয় নেই—কিন্তু এ কথা বলতে আমার নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। এ আমি চাই নি, চাই না। অনর্থক এই ব্যাপারে আজ কারাগারে যেতে আমাব লজ্জা হচ্ছে। যদি পুলিশ অন্য কাউকে অপরাধী বলে ধরে, তা হলে আমি ধরা দিয়ে সব কথা স্বীকার করবো। তা না হলে আমি মুখ ফুটে একথা কিছুতেই আর উচ্চারণ করবো না! এ আমার নিদারুণ লজ্জার কথা!"

এমন সময় কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিল তীব্র, কঠোর আদেশের স্বরে!

মাথাটা একটু একপাশে করিয়া লিটল রাশিয়ান অনেকক্ষণ ধরিয়া একমনে সেই গর্জ্জায়মান আহ্বান-ধ্বনি শুনিল। তারপর বলিল, আজ আর কারখানায় বেরুবো না!

পাভেলও ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমিও না।

'বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসি'—বলিয়া ধীরে ধীরে লিটল রাশিয়ান চলিয়া গেল।

মাতার বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিয়া পাভেল বলিল, "আমি জানি আন্দ্রি এ ব্যাপারের দরুণ নিজেকে কোন মতেই ক্ষমা করবে না, কখনও না। কি বিচিত্র জীবনের আবর্ত্ত! তুমি চাওনা, তবুও তোমাকেই আঘাত করতে হয়! আর কাকে আঘাত করতে হয়? ঐ রকম একটা অসহায় প্রাণীকে! ও ছিল তোমার চেয়েও অসহায় কেননা ও ছিল একেবারে মূর্খ! তবুও আমাদেরই মত সেও

মানুষ। কিন্তু একদল লোক ওদের গড়ে তুলেছে আমাদের শত্রু করে—মানুষে মানুষে তারা বাঁধিয়ে দিয়েছে এক অতি জঘন্য কলহ। ভয়ে চোখ অন্ধ করিয়ে, হাত পা বেঁধে তারা এক শ্রেণীর সঙ্গে আর এক শ্রেণীর সংঘর্ষ বাঁধিয়ে কাউকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে লাঠীর কাজ, কাউকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে মুগুরের কাজ! মানুষকে ওরা করেছে অস্ত্র, আর তারই নাম দিয়েছে সভ্যতা! এই হলো পাপ, বর্ত্তমান সভ্যতার এই মহাপাপ! লক্ষ লক্ষ মানুষ, লক্ষ লক্ষ আত্মার এই নিত্য হত্যা চলেছে চারিদিকে। ওরা শুধু মানুষকে হত্যা করে না—মানুষের আত্মাকেও ওরা মেরে ফেলতে চায়। এই লিটল রাশিয়ান একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দৈবক্রমে একজনকে হত্যা করে ফেলেছে কিন্তু তার ফলে তার সমস্ত মন তীব্র অনুশোচনায় আর গ্লানিতে ভবে গেছে। কিন্তু ওরা যখন একান্ত শান্ত ও ধীরভাবে শুধু নিজেদের স্বার্থগত সুবিধাগুলি বজায় রাখার জন্যে হত্যা করে, তার পিছনে সামনে বা উর্দ্ধে কোথাও কোনও গ্লানি থাকে না। শুধু তাদের ঘরের ছাদটুকু শক্ত করবার জন্যে, শুধু তাদের সোনারূপো, ঘটী-বাটী আর প্রাণহীন ছেঁড়া কতকগুলো পুবোনো কাগজের পুঁটলীকে সাবধানে রাখবার জন্যে তাদের এই নিত্য মরণ-যজ্ঞের আয়োজন। ভেতরের দিক দিয়ে নিজেদের রক্ষা করবার পথ তারা ভুলে গেছে—তাই বাইরের দিক দিয়ে আত্মরক্ষা পাবার তাদের এই বিপুল চেষ্টা। এই জীবন, এই তার গ্লানি আর তার পঙ্কিলতা যদি জীবনে কোনও দিন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে থাক, তবে বুঝবে, আমাদের আদর্শের প্রয়োজনীয়তা কতখানি! বুঝবে আমরা যে পথে চলেছি, তার শেষে কি সুন্দর, কি সুমহান্ সার্থকতা!"

পুত্রের প্রজ্বলিত আননের দিকে চাহিয়া মার মনে হইতেছিল, যেন ক্ষুদ্র দীপশিখার মত সেই বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তিনি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছেন। উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বুঝি না? সবই বুঝি। আমিও তো মানুষ, কেন পারবো না আমি বুঝতে?"

এমন সময় সহসা বাহিরে পদশব্দ হইল। পাভেল বাহিরের দিকে চাহিয়াই মার কানে কানে বলিল, বোধ হয় আন্দ্রির খোঁজে পুলিশ এসেছে—

দরজা খুলিতেই রাইবিন আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

পুলিশের বদলে রাইবিনকে দেখিয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, "ওঃ, তুমি রাইবিন—তোমাকে দেখে সত্যিই আনন্দ হলো! কেমন আছ? কোথায় ছিলে এতদিন?"

"বেশ ভালই আছি। তোমরা ক্রমশঃ ভদ্দর লোক হয়ে উঠছো, আমি ক্রমশঃ হয়ে যাচ্ছি চাষা। এখান থেকে এদিলগায়ের গাঁয়ে গিয়ে বসবাস স্থাপন করেছি। সেখানে তোমাদের অনেক বইই নিয়ে গিয়েছি, তবে সরকারী বাইবেলের সাহায্যেই অধিকাংশ কাজ চালাই। মোটা বইটার মধ্যে অনেক দরকারি জিনিষ আছে—অনেক জিনিষ আছে যা তোমার আমার কাজে লাগতে পারে, অথচ সরকারের বলবার কিছু নেই। এবং লোকেও বিশ্বাস করে সহজে। কিন্তু আজকাল দেখছি, ওতে আর ভুলুছে না। তাই এসেছি তোমাদের নতুন বইগুলো নিয়ে যেতে। সঙ্গে এফিম বলে একজন চাষাকে নিয়ে

এসেছি। আলকাতরা চালান দেবার জন্যে সে এখানে এসেছে। কিন্তু সে আসবার আগেই বইগুলো আমাকে দিয়ে দাও—তাকে আর এ বিষয়ে জানাতে চাই না।”

মার দিকে চাহিয়া পাভেল বলিল, “মা, শিগ্‌গির গিয়ে কতগুলো বই নিয়ে এসো। কি কি বই লাগবে, তা তাবা জানে। শুধু বলো গ্রামের জন্যে দরকার।”

মাবদিকে চাহিয়া রাইবিন হাসিয়া বলিল, “বাঃ আপনিও তাহলে দেখছি এদেব দলে জুটে গেছেন। আমাদের ওখানে এই সমস্ত বই পড়বাব জন্যে বহু লোক পাগল। সেখানে আমবা একজন ভালো প্রচারক পেয়েছি। তিনি পড়ার দিকে লোকদের খুব উৎসাহ দিয়ে বেড়ান। শুনেছি লোকটা বেশ ভাল যদিও পাদ্রী। আর একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন। তবে এঁরা সব হলেন আইন-বাগীশ দল—বে-আইনী বই এঁরা ছুঁতেও চান না—ভয় ও করেন। কিন্তু আমি তাদের প্রচার কার্য্যের বাধা দিই না। ওদেরই আঙুলের ফাঁক দিয়ে আমার বই সব চালিয়ে দেবো। দেখলেই পুলিশের লোকে মনে করবে ওদেরই কাজ—আমার নাম-গন্ধও তারা পাবে না?”

রাইবিনের কথা শুনিয়া মা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, দেখতে ভালুকের মতো, কিন্তু বুদ্ধিতে এধারে ধূর্ত্ত শেয়াল!

পাভেল কিন্তু গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, “বই আমরা তোমাকে এখনি দিচ্ছি, কিন্তু তুমি প্রচারের যে-পন্থা অবলম্বন করেছ, তা ঠিক নয়। তোমার কাজের জন্যে সর্ব্বদাই তোমার নিজের জবাবদিহি দেওয়া উচিত। অপরকে বিপন্ন করে লুকিয়ে নিজের কাজ হাসিল করা অন্যায়!”

"কি বলছো, তোমার কথা বুঝতে পারছি না!"

"পুলিশের লোকেরা যদি সন্দেহ করে যে তারা এই কাজ করছে তা হলে তাদেরই ধরে জেলে পুরবে—"

"পুরলোই বা—তাতে কি?"

"কিন্তু নিষিদ্ধ পুস্তক তারা তো আসলে বিলোচ্ছে না—বিলোচ্ছো তো তুমি!"

মা দেখিলেন পাভেল রাইবিনের কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছে না। তিনি বলিলেন, রাইবিনের ইচ্ছে যে পুলিশ সন্দেহক্রমে অন্য লোককে গ্রেফতার করে করুক ইত্যবসরে সে তার নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে!

উত্তেজিত হইয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, "বাঃ, এ ভারি মজার ব্যবস্থা! ধর, আন্দ্রি যদি কোনো অপরাধ করে, আর তার জন্যে আমাকে যদি কারগারে নিয়ে যায়?"

পাভেলের কথা শুনিয়া রাইবিন হাসিয়া উঠিল—"তোমার বয়স এখনও অল্প কিনা, তাই এ সব ভাবতে তোমার কষ্ট হয়। লুকোনো কাজের ধারাই এই! তারপর ধর প্রথমতঃ, পুলিশ যার কাছে বই পাবে, তাকে ধরবে, পাদ্রীটাকে বা শিক্ষয়িত্রীটাকে ধরবে না; দ্বিতীয়তঃ ধর, তারা যে সব বই থেকে ধর্ম্মকথা প্রচার করে—সেখানেও এই সব কথাই লেখা আছে—তবে বিভিন্ন ধরণে; তৃতীয়তঃ—তারা আমার কে? যে চলেছে পায়ে হেঁটে, আর যে যায় ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ হতে পারে? একজন চাষীর বেলায় হয়ত আমি এ রকম করতে চাইতাম না—কিন্তু এই পাদ্রী বা সেই জমিদারের মেয়েটা—যিনি শিক্ষয়িত্রী সেজেছেন—

আমি বুঝতে পারি না, তারা কি করে বলে জনসাধারণের মুক্তির কথা! হাজার হাজার বছর ধরে নিয়মিতভাবে তারা শুধু শিখে এসেছে কি করে প্রভুত্ব কবতে হয়, হাজাব হাজার বছর ধরে তারা শিখে এসেছে কি করে চাষাদেব গায়ের চামড়া খুলে নিতে হয়—আজ দেখি হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে তারা লেগে গেছে চাষাদেব উন্নতির জন্যে! এ হয় না! এ সব রূপকথায় সম্ভবে, আর আমি রূপকথার রাজ্যে বাস করি না। জীবনকে নিয়ে রসিকতা করবার সময় বা মনোবৃত্তি আমার নেই—"

রাইবিনের কথায় বাধা দিয়া মা বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু যাদের মনিবশ্রেণীর বলে দূরে রাখছো, তাদেরও মধ্যে তো ভাল লোক আছে—যারা সত্যি সত্যিই লোকের মঙ্গলের জন্যে কারাগার পর্য্যন্ত যেতে কুণ্ঠিত নয়?

"কিন্তু আমার মনে হয় তাদের ধারণা, তাদের আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা। যে-প্রবৃত্তি নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেছে—আজ সহসা সেই প্রবৃত্তি বদলে যাবার কোন কারণ ঘটেনি—অবশ্য একথা ঠিকই যে প্রত্যেক দলেই ভালো-মন্দ দুইই আছে কিন্তু যারা ভালো তারা ব্যতিক্রম হিসাবেই সত্যি। যাদের জন্য এই আন্দোলন, তারাও যে খুব ভাল, তাদের মধ্যে যে খারাপ লোক নেই একথাও বলা চলে না। পাঁচবছর ধরে ক্রমান্বয় আমি কারখানার দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছি। তারপর হঠাৎ একদিন গ্রামে ফিরে গেলাম। সেখানে গিয়ে এখন কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হয় এ জীবন আরও অসহ্য! এ আমি কিছুতেই সইতে পারি না। তোমরা এখানে থাকো, তোমরা ক্ষিদে কাকে বলে তার কি

জানো? সেখানে গেলেই দেখতে পাবে—ছায়ার মত এই জঠরের জ্বালা লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—কোন আশা নেই—কোন সম্ভাবনা নেই—এক টুক্‌রো রুটী পাবার। মানুষের সর্ব্বদেহ থেকে যেন মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকুও চলে গেছে। কে বলে তারা বেঁচে আছে? দারুণ দুর্ভিক্ষে তারা শাকসব্জীর মত শুধু পচছে। আর তাদের ঘিরে চারিদিকে শকুনির মত ওরা পাহারা দিয়ে আছে—সে-দৃশ্য অসহ্য হলেও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—এইখানেই থাকবো—তাদের যে রুটী সংগ্রহ করে দিতে পারবো সে ভরসায় নয়—মনে দুরাশা হলো এক বিচিত্র রান্না তৈরী করবো—এই দুঃখ দিয়ে, এই অপমান দিয়ে, এই লাঞ্ছনা দিয়ে—এবং সেই কাজে চাই তোমাদের সহায়তা। আমাকে শুধু দাও বই—তোমাদের লেখা—যে লেখা পড়ে লোকে এক মুহূর্ত্তও শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারবে না। তাদের মাথায় যেন কাঁটার মত সর্ব্বদা বিঁধতে থাকবে। তোমাদের হয়ে যারা এই কারখানার লোকদের জন্যে বই লেখে তাদের বলো গ্রামের চাষীদের জন্যেও যেন লেখে। এমন লেখা চাই যা জীবনকে ঝল্‌সে পুড়িয়ে দেবে—লোক যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মৃত্যুকে আঁকড়ে ধরতে কুণ্ঠীত না হয়।”

ঊর্দ্ধে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলিয়া প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়া সে বলিয়া উঠিল, “মৃত্যুতে হক মৃত্যুর ঋণ পরিশোধ। মৃত্যু তারা পাক, তাহলে তারা আবার পাবে নতুন জীবন। মরুক কতকগুলো লোক, জগতে তাহলে বাঁচবে আরও অনেক বেশী লোক।”

রাইবিনের কথা শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া পাভেল বলিল, “সে কথা

ঠিকই—গ্রামের জন্যে একখানা আলাদা খবরের কাগজের দরকার। আমাদের মালমশলা জোগাও—আমারা ছেপে পাঠাবো—”

“এমন ভাবে লিখবে যেন গ্রামের গরু বাছুরগুলোও বুঝতে পারে—”

এমন সময় বাহিরে পায়ের শব্দ হইতে রাইবিন পিছন ফিরিয়া দেখে যে এফিম আসিতেছে। মাথায় পাতলা চুল, ভারী মুখ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। এফিম ঘরে আসিতেই রাইবিন তাহার সহিত পাভেলের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, “এই এরি কথা বলছিলাম, একে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি—”

প্রীতিসম্ভাষণের পর এফিম কৌতূহল দৃষ্টি লইয়া ঘরের চারিদিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ বইএর আলমারীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে উঠিয়া একেবারে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

রাইবিন চোখ ইসারা করিয়া পাভেলকে বলিল, “দেখলে একেবারে সোজা আলমারীর কাছে!”

আলমারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এফিম একটী একটী করিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিল। পরম উৎসাহে সে বলিয়া উঠিল, “ওঃ, এত বই! কিন্তু এখানকার লোকদের পড়বার সময় কোথায়? গ্রামে আমাদের অফুরন্ত অবসর—

পাভেল জিজ্ঞাসা করিল, “অবসর আছে সত্যি, কিন্তু ইচ্ছা?”

“বাঃ, ইচ্ছেও আছে। এমন দিনকাল পড়েছে যে, হয় মাথা ঘামাতে হবে, নয় চুপ করে শুয়ে মরণকে ডেকে নিতে হবে। লোকে সহজে মরতে চায় না—তাই বাধ্য হয়ে এখন তারা

ভাবতে আরম্ভ করেছে, একটু একটু করে মাথা ঘামাচ্ছে। "জিওলজি"—এটা কি ?"

পাভেল বুঝাইয়া দিল।

এফিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও সব জানবার আমাদের দরকার নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাইবিন বলিল, "চাষারা জানতে চায় না কেমন করে মাটী তৈরী হলো, তারা জানতে চায় কেমন করে তাদের হাত থেকে মাটী সবে গেল। কি কি ধাতু তাতে আছে, কিই বা তার গঠন, তাতে তার কিছু আসে যায় না। পৃথিবী দড়িতে যদি ঝুলে থাকে তাই থাক—যদি তা থেকে আসে তার শস্য ; আকাশে যদি ঝুলে থাকে তাই থাক—যদি তা থেকে আসে তার দুবেলার রুটী।"

সহসা ঘর্ম্মাক্ত, পরিশ্রান্ত ও গম্ভীরভাবে লিটল রাশিয়ান প্রবেশ করিল। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নবাগত এফিমের সহিত নীরবে কর-মর্দ্দন করিয়া সে রাইবিনের পাশে গিয়া বসিল। তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রাইবিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে তোমার ? এ রকম চেহারা কেন ?"

"কিছু না !"

এফিম অগ্রসর হইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিও বুঝি কারখানায় কাজ করেন ?"

"হাঁ ! কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ?"

এফিমের হইয়া রাইবিন উত্তর দিল, "জীবনে ও এই প্রথম সামনা সামনি একজন মজুরকে দেখলো !"

ইত্যবসরে মা রান্নাঘর হইতে চা প্রস্তুত করিয়া হাজির হইলেন।

মার ইঙ্গিতে রাইবিন একবার রান্না-ঘরে গেল।

চায়ের কাপ হাতে লইয়া এফিম পাভেলের পাশে গিয়া একান্ত মিনতির স্বরে বলিল, "আমাকে একখানা বই দেবেন?"

"নিশ্চয়ই দেবো!"

আনন্দে এফিমের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—বলিল, "আমি ফেরৎ দেবো অবশ্য। প্রায়ই গাঁয়ের লোকেরা এখান থেকে আলকাতরা নিয়ে যেতে আসে। আমি তাদের কারুর হাতে পাঠিয়ে দেবো। জানেন না এই সব বই আমাদের কাছে কি! আমাদের অন্ধকার ঘরে একমাত্র আলো!"

রান্নাঘর হইতে জামা বেশ ভাল রকম আঁট করিয়া লইয়া রাইবিন পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

পাভেলের নিকট হইতে একখানি বই লইয়া আনন্দোদ্ভাসিত মানসে এফিমও রাইবিনের সহিত বিদায় গ্রহণ করিল।

তাহারা বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে লিটল রাশিয়ানকে উদ্দেশ্য করিয়া পাভেল বলিল, লক্ষ্য করলে এদের?

ধীরে গম্ভীরভাবে লিটল রাশিয়ান উত্তর দিল, হাঁ, দেখলাম। সূর্য্যাস্তের সময় মেঘের যে রূপ হয় গভীর, ঘন—গতি আছে কিন্তু মন্থর!

কিছুদিন .পরে হঠাৎ একদিন আলুথালু ময়লা পোষাকে নিকোলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই পাভেলকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, হাঁ হে, তোমরাও জান না, কে গরমভকে খুন করলো?

পাভেল উত্তর দিল, না!

"আঃ, লোকটা আমার কাজ মাটী করে দিলে, এখন আমি কি করি?"

মৃদু ভৎর্সনার স্বরে পাভেল বলিল, "যা তা বকো না নিকোলে!"

এতদিন পরে নিকোলেকে দেখিয়া তাহার জন্যও মার অন্তরে আজ কেমন একটা স্নেহ উথলিয়া উঠিতেছিল। পাভেলের ভৎর্সনায় ব্যথিত হইয়া মা বলিয়া উঠিলেন, "হারে, পাভেল, তুইও ঐ রকম রুক্ষ স্বরে কথা বলবি?"

মার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়া দিয়া নিকোলে বলিল, "দেখুন দেখি, এ পৃথিবীতে আমি কি করি? আমি ভাবি, অনবরত ভাবি, এ পথিবীতে আমার জায়গা কোথায়! অনেক ভেবে দেখলাম, কোথাও আমার স্থান নেই। দুটো কথা যে লোককে বুঝিয়ে বলবো, সে শক্তিও আমার নেই। আমি সব দেখি, সব বুঝি কিন্তু কোনও মতে মনের কথা খুলে বলতে পারিনা। আমারও হৃদয় আছে, কিন্তু সে হতভাগা কথা বলতে শেখেনি।"

মাথা নত কবিয়া সে পাভেলের সম্মুখে গিয়া টেবিলে আঙুল ঘসিতে ঘসিতে বলিল, "দেখ, আমাকে কাজ দাও, খুব শক্ত কাজ। আমি এ রকম করে আর বেঁচে থাকতে পারি না। কোন মানে নেই, কোন মতলব নেই—কেন যে আছি, তার না আছে কোন অর্থ। তোমরা সবাই এ আন্দোলনের জন্যে খাটছো—দেখছি তোমাদের সাধনায় এ আন্দোলন বেড়ে উঠছে—আমি শুধু তার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—শুধু কাঠ কেটেই চলেছি। কাঠ কেটে

আর কতদিন বেঁচে থাকা যায়? আমাকে একটা কাজ দাও—তোমাদের সঙ্গে নাও—"

পাভেল তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই তোমাকে সঙ্গে নেবো ভাই!"

পিছন হইতে লিটল রাশিয়ান সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল। পর্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, "নিকোলে, আমি তোমাকে কম্পোজিটারের কাজ শেখাবো—তুমি আমাদের হয়ে কম্পোজিটারী করবে, কেমন?"

উল্লাসে নিকোলে বলিয়া উঠিল, "শেখাবে তো, তা হলে তোমাকে আমার এই ছুরিখানা উপহার দেবো, সত্যি!"

"দূর হ'কগে তোমার ছুরি!" বলিয়া লিটল রাশিয়ান হাসিয়া উঠিল।

"সত্যি বলছি, ছুরিটা যা তা মনে করো না!"

এবার কি মনে করিয়া পাভেলও হাসিয়া উঠিল। নিকোলে অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ, বেশ মজা তো, আমাকে নিয়ে হাসবার কি পেলে?"

তাহার পিঠ চাপড়াইয়া লিটল রাশিয়ান বলিল, "আজ রাত্তিরটা ভারী সুন্দর লাগছে—চল বাইরে একটু বেড়াতে যাই—কেন যে হাসছি তখন বলবো' খন!"

জানালায় দাঁড়াইয়া মা দেখিলেন, বাহিরে চন্দ্রালোকে তাহারা তিনজন চলিয়াছে। ঘরের আলো নিভাইয়া দিতে খানিকটা চাঁদের আলো ঘরের মেঝেতে আসিয়া পড়িল। সেইখানে নতজানু হইয়া

জানালার বাহিরে উর্দ্ধাকাশের দিকে চাহিয়া মার অন্তর বলিয়া উঠিল প্রভু, রক্ষা করো !

দিনগুলি এত তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল যে "পয়লা মের" ব্যাপার মা ভাল করিয়া মনে ভাবিতে পারিতেছিলেন না। রাত্রি বেলায় সারাদিনের ক্লান্তির পর যখন বিছানায় শুইতেন তখনই সেই অনাগত দিনের ছায়া তাঁহার মনে আসিয়া পড়িত, বুকটা অজানা আশঙ্কায় ব্যথা করিয়া উঠিত, আপনার মনে বলিয়া উঠিতেন, হে প্রভু, কবে কাটবে পয়লা মের রাত্রি।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিলেই তাড়াতাড়ি কোনও রকমে হাত মুখ ধুইয়া ডজন খানেক কাজের ভার মার উপর চাপাইয়া পাভেল আর লিটল রাশিয়ান কারখানায় বাহির হইয়া যাইত। সারাদিন ধরিয়া চাকার মত মা ঘুরিয়া বেড়াইতেন, রান্না-বান্না করিতেন এবং সমস্ত সংসারিক কাজ শেষ হইয়া গেলে মে'-দিবস উপলক্ষ্যে পোষ্টার মারিবার জন্য আটা তৈরী করিতেন। মাঝে মাঝে কোথা হইতে অচেনা লোক সব আসিয়া পাভেলের নামে চিঠি রাখিয়া যাইত—চিঠি দিয়া কোন কথা না বলিয়া তাহারা আবার অদৃশ্য হইয়া যাইত। আশঙ্কায় মার মন কাঁপিয়া উঠিত।

পয়লা মে'র অনুষ্ঠানে যোগদানের আহ্বান-লিপিতে সমস্ত গ্রাম আর কারখানা ভরিয়া উঠিল। প্রতিদিন রাত্রিবেলা কখন নিঃশব্দে গাছের গায়ে, বেড়ার ধারে, এমন কি পুলিশ ষ্টেশনের সামনে সেই সমস্ত পোষ্টার মারা হইত। সকাল-বেলাই দেখা

যাইত রাগে ফুলিতে ফুলিতে পুলিশের লোকরা সেই সমস্ত পোষ্টার ছিড়িয়া ফেলিতেছে এবং যাহাদের এই কার্য্য তাহাদের গতিবিধি বুঝিতে না পারিয়া শত অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে। দুপুর যাইতে না যাইতেই আবার কোথা হইতে গ্রামের পথঘাট এই সমস্ত হ্যাণ্ডবিলে ভরিয়া উঠিত—সেগুলি প্রত্যেক পথিকের পায়ের তলায় গিয়া যেন গড়াগড়ি দিত। শহর হইতে গুপ্তচর আনা হইয়াছে। কারখানার পথে পথে দাঁড়াইয়া তাহারা সকলের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু কাহাকেও ধরিতে পারিতেছিল না। মজুররা তাহাতে সবাই বেশ খুসী বোধ করিতেছিল। বুড়োরাও বেশ একটু হাসিয়া পথ চলিতে চলিতে বলাবলি করে, একটা কিছু ঘটছে, কি বল?

গ্রামের চারিদিকে লোক দল বাঁধিয়া এই আবেদনের কথা আলোচনা করে। প্রত্যেকেরই জীবনে যেন অতর্কিতে এবারের বসন্তে কোথা হইতে একটা নূতন চেতনা আসিয়া লাগিয়াছে। বহুদিন পরে সবাই উত্তেজিত হইবার একটা যথেষ্ট হেতু যেন পাইয়াছে। কেহ উত্তেজিত হইয়া গোপন বিদ্রোহীদের দেয় অভিশাপ; কেহ বা অজানা আশঙ্কা আর আশার মাঝখানে দোলে। খুব অল্প সংখ্যক লোকের মনে এই সমস্ত আবেদন এক নিগূঢ় আনন্দ জাগাইয়া তোলে। এক নব জাগ্রত চেতনার স্পন্দনে আনন্দে তাহাদের অন্তর ভরিয়া উঠে।

পাভেল আর লিটল রাশিয়ানের বিছানার সহিত সকল সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে। ঠিক ভোর হইবার পূর্ব্বে তাহারা দুইজনে বাড়ী আসিত, ক্লান্ত, বিবর্ণ, বিশুষ্ক। মা জানিতেন যে গ্রামের বাহিরে

জলামাঠের মাঝখানে—বনে, তাহাদেব নিশীথ-সভা বসে; জানিতেন গ্রামেব মধ্যে অশ্বারোহী পুলিশ পাহারায় জাগে, পথে প্রত্যেক মজুবকে ধরিয়া পুলিশেব লোকেবা সার্চ্চ কবিয়া তবে ছাড়িয়া দেয়; সেই সঙ্গে ইহাও জানিতেন যে হয়ত কোন রাত্রিতে তাহাবা দুইজনেও গ্রেফতার হইয়া যাইতে পাবে। মাঝে মাঝে মাব মনে হইত 'পয়লা মে'ব আগে যদি ইহাবা দুইজনে গ্রেফতাব হইয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত ভালই হয়।

আশ্চর্য্যেব কথা গবমভেব হত্যাব ব্যাপাব সম্বন্ধে পুলিশ সকল অনুসন্ধানেব চেষ্টা ত্যাগ কবিয়াছে—লোকেও আব সে সম্বন্ধে আলোচনা কবে না। পুলিশ যখন সে ব্যাপাব সম্বন্ধে একেবারে চুপ হইয়া গেল তখন একদিন বিবক্ত হইয়া লিটল বাশিয়ান পাভেলকে বলিল, "দেখলে ব্যাপাব, ওবা যে শুধু আমাদেব মানুষ বলে গণ্য কবে না তা নয়, আমাদেব ওপর যাদের লেলিয়ে দেয়, তাদেবও ওরা তেমনি দেখে। যতই লোকটার কথা আমার মনে হয়, ততই তার জন্যে আমাব দুঃখ হয়—আমি তো তাকে হত্যা করতে চাইনি।"

কঠোব কণ্ঠে পাভেল বলিয়া উঠিল, "হয়েছে, থামো, আন্দ্রি!" সান্ত্বনা দিবাব জন্য মা বলেন, "তোর কি অপরাধ; একটা পচা জিনিষেব সঙ্গে তোব হঠাৎ ধাক্কা লেগে গিয়েছিল—তাতে সে জিনিষটা পড়ে গেছে—পচা ছিল বলেই না?"

"হয়ত তোমাব কথাই সত্যি মা! কিন্তু তবু এ আমার অন্তরের সান্ত্বনা নয়।"

অবশেষে একদিন রাত্রি-শেষে 'পয়লা মে'র প্রথম সূর্য্যকর দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিল। প্রভাতে তেমনি কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিল—দীর্ঘ, কর্কশ, কঠোব! সারারাত্রি মা নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। কারখানাব বাঁশী শুনিয়াই বিছানা হইতে উঠিয়া তিনি সামোভারে আগুণ জ্বালাইতে চলিলেন। আগুণ জ্বালাইয়া প্রতিদিনের মত পাভেল আর লিটল বাশিয়ানেব ঘবেব সম্মুখে আসিয়া তাহাদের ডাকিতেই, তাঁহাব মনে পড়িল, আজ পয়লা মে! নির্ব্বাক হইয়া তিনি মুক্ত জানালার নিকটে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাত্রিশেষের নীলাভ আকাশে প্রথম অরুণ-বাগ-স্পর্শে বঞ্জিত হইয়া বক্তাভ মেঘখণ্ডগুলি দ্রুত ভাসিয়া চলিয়াছিল, যেন যন্ত্রেব ধূমোদ্‌গাবের ভীষণ ববে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া আকাশচাবী কোন বিহঙ্গমের দল নীড়াভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। আপনাব মধ্যে আপনি মগ্ন হইয়া মা সেই মেঘের গতির দিকে চাহিয়াছিলেন। একটা আশ্চর্য্য রকমের প্রশান্তি তাঁহাবও অন্তব ভবিয়া বিবাজ কবিতেছিল। হৃদয়েব গতিও সহজ মৃদু ছন্দে বহিতেছিল এবং মনে মনে তিনি এই প্রতিদিনেব জীবনেব সহজ সুখদুঃখের কথাই আপনাব অজ্ঞাতসারে ভাবিতেছিলেন।

দ্বিতীয়বার কারখানার বাঁশী বাজিয়া উঠিল। মার মনে হইল আজ বাঁশীর আহ্বান যেন দীর্ঘতর শোনাইতেছে। এমন সময় শুনিলেন, স্বভাবকোমল কণ্ঠস্বরে নিদ্রাজড়িতভাবে লিটল রাশিয়ান পাভেলকে বলিতেছে, "বন্ধু, শুনছো, ঐ ডাকছে।"

বাহির হইতে মা প্রতিদিনের মত জানাইলেন, "আগুণ তৈরী।"

সহাস্যকণ্ঠে পাভেল উত্তর দিল, "আমরাও প্রস্তুত।"

জানালার নিকটে আসিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া লিটল রাশিয়ান আপনার মনে বলিয়া উঠিল, সেই সূর্য্য আজও উঠেছে, মেঘেরা তেমনি চলেছে ছুটে, কিন্তু আজ যেন মনে হয় কোথায় এদের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয়ে গেল।"

বাহিরে আসিয়া মাকে দেখিয়া প্রাতরভিবাদন জানাইতেই মা তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া কানে কানে বলিলেন, আজ ওর সঙ্গ ছাড়া তুই হস্ নি।"

"কখনই না। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মা, এ শুধু আজ বলে নয়, চিরদিনই তাই চেষ্টা করবো।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের উভয়'ক একত্র দেখিয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, "চুপিচুপি কি ষড়যন্ত্র হচ্ছিল ?"

গরম জলে হাত মুখ ধুইতে ধুইতে লিটল রাশিয়ান বলিল, 'কিছু না। মা বলছিলেন যে ভালো করে হাত মুখগুলো ধুতে, যাতে মেয়েদের দৃষ্টি তোর চেয়ে আমার ওপর বেশী পড়ে, বুঝলি ?'

পাভেল তখন আপনার মনে গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছিল, জাগো, জাগো হে নিপীড়িত মানব।

বেলা বাড়িতে লাগিল। বায়ু-বিতাড়িত হইয়া কখন আকাশ হইতে মেঘের দল অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। মা চায়ের আয়োজন করিতেছিলেন আর তাহাদের দুইজনের সহাস্য রসিকতা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলেন, কয়েক ঘণ্টা পরে জীবনে যাহাদের কি হইবে কিছুরই স্থিরতা নাই তাহারা কেমন নিরঙ্কুশ নিঃশঙ্ক অবস্থায় আলাপ করিতেছে। সকলের চেয়ে মার আশ্চর্য্য লাগিল—

কোথা হইতে তাঁহারও অন্তরে এক অপূর্ব্ব প্রশান্তি আসিয়া দেখা দিয়াছে।

চায়ের টেবিলে আজ তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া চা-পান করিল। পাভেল প্রতিদিন ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে চায়ের কাপে চিনি মিশাইত, আজ যেন কাপের মধ্যে চামচটীকে বারে বারে ধীরে ধীরে নাড়িতেই তাহার ভাল লাগিতেছিল। টেবিলেব আড়ালে লিটল রাশিয়ান অনবরত পা নাচাইতেছিল—একবারও সে পা-দুটীকে স্থিব করিতে পারিতেছিল না এবং মুক্ত বাতায়ন দিয়া আগত সূর্য্যকরের গতি-স্পন্দনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিল।

বহুক্ষণ দেয়ালে-পড়া রৌদ্রটুকুর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে লিটল রাশিয়ান বলিয়া উঠিল, "তখন আমার দশ বছর বয়েস ছোট্ট ছেলে—সাধ গিয়েছিল কাঁচের গেলাসে রোদ ভরে রাখবো। একদিন একটা কাঁচের গেলাস নিয়ে আস্তে আস্তে দেয়ালের কাছে গিয়ে রোদটুকু গেলাসে পুরে নেবো ভেবে—গেলাসটা সজোরে দেয়ালে বসিয়েছি—আর যায় কোথা! কাঁচের গেলাস টুকরো টুকরো হয়ে মাটীতে পড়ে গেল—হাত গেল কেটে, তার ওপর হলো প্রহার। বড় রাগ হলো সূর্য্যের ওপর। প্রহারান্তে বাইরে গিয়ে দেখি একটা ডোবার জলে এসে পড়েছে সূর্য্যের আলো। প্রাণের আনন্দে জলে লাথি মারতে লাগলাম। ফলে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল কাদায়। ফলে আর একবার হলো প্রহার। তখন আর কি করি? জানালার ওপর বসে আকাশের দিকে চেয়ে সূর্য্যকে ডেকে বললাম, আমার এই কচুটি, আমার তো লাগেনি। দুবার আকাশের দিকে চেয়ে মুখ ভ্যাংচালাম, আর তখন যেন মনে একটু শান্তি এলো।"

এই সমস্ত অবান্তর কথায় মার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আজকের শোভাযাত্রার কি আয়োজন হবে সেই কথাই এখন ভাব!"

পাভেল মৃদু হাসিয়া বলিল, "সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক হয়ে গিয়েছে!"

লিটল রাশিয়ান তেমনি উদাস দৃষ্টিতে বলিয়া উঠিল, "একবার যে জিনিষ স্থির হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর আলোচনা করা বৃথা—তাতে শুধু মনটা গুলিয়ে ওঠে। যদি আমরা গ্রেফতার হই—তাহলে নিকোলে এসে তোমাকে সব খবর দেবে এবং তুমিই বা কি করবে তা তার মুখ থেকে জানতে পারবে।"

"চল, এবার বেরিয়ে পড়ি—"পাভেল বলিয়া উঠিল।

"আঃ—অত ব্যস্ত কেন? এত সকাল থেকেই পুলিশের চোখের সামনে ঘুরে বেড়িয়ে কি লাভ হবে?"

এমন সময় ফিডিয়া উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। চীৎকার করিয়া উঠিল, "যাত্রা আরম্ভ হয়েছে! দলে দলে লোক কারখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। কারখানার ফটকে নিকোলে, গুসেভরা দুই ভাই আর সামোলভ বক্তৃতা দিচ্ছে। আর নয়, তোমরাও এসো এবার। আমি এখন যাই"—বলিয়াই যেমন ঝড়ের মতন আসিয়াছিল তেমনি ঝড়ের মতন চলিয়া গেল।

পাভেল ও লিটল রাশিয়ান যাত্রার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিল মাও সাজগোজ করিতেছেন।

"কোথায় যাবে মা?" —পাভেল জিজ্ঞাসা করিল।

'কেন, তোদের সঙ্গে!'

"তাই চল! কিন্তু মা, আমিও তোমাকে কোন কথা বলতে চাই না—তুমিও আমাকে কোন কথা বলো না। কেমন?"

"বেশ, তাই হবে, তাই হবে!"

বাহিরে আসিতেই মা শুনিলেন কোথা হইতে ছুটির দিনেব গুঞ্জনেব মত এক সমবেত শব্দ উঠিতেছে। পথ দিয়া চলিবার সময় দেখেন চাবিদিক হইতে লোকে পাভেল ও লিটল বাশিয়ানেব দিকে চাহিয়া আছে। দবজায়, ফটকে, জানালায়, চারিদিকে লোক—আর সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকেই চাহিয়া আছে।

শুনিলেন, লোকে তাহাদেব দুইজনকে দেখাইয়া বলাবলি কবিতেছে, এই দুজন হল আসল নেতা!

চারিদিক হইতে নানাবকমেব কথা উঠিতেছে। জসিমভেব বাড়ীর পাশ দিয়া যাইবাব সময় ভাঙ্গা পায়ে লাঠীব ভব দিয়া জসিমভ জানালা হইতে গলা বাড়াইয়া চীৎকাব কবিয়া বলিয়া উঠিল, "শুনছো পাভেল! ওসব চালাকী রেখে দাও—যেমন কুকুব তেমনি মুগুব পাবেখন—যাও না!" জসিমভ ঘবে বসিয়া ভাঙ্গা পার জন্য কারখানা হইতে পেনসন পাইত।

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া পাভেলকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ হে, শুনছি নাকি তোমরা আজকে একটা ভয়ানক কাণ্ড করবে? সুপারিণ্টেডেণ্টেব ঘরে গিয়ে তার দোর জানালা ভেঙ্গে ফেলবে?"

হাসিয়া পাভেল উত্তর দিল, "কেন, আমরা কি মাতাল?"

তাহাকে বুঝাইয়া লিটল রাশিয়ান বলিল, "আমরা ওসব কিছুই করবো না—আমরা শুধু আমাদের পতাকা হাতে রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে যাব—সেই গানেই থাকবে আমাদের প্রাণের কথা—"

আর একজন আসিয়া মাকে দেখিয়া গম্ভীরভাবে জানাইল, "ওরা দেখছি সত্যিই বলতো—তুমিই কারখানাতে লুকিয়ে বই নিয়ে যেতে, না ?"

কথাটা পাভেলের কানে যাইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে বলে এ কথা ?"

"কে আব বলবে ? লোকের এই ধারণা।" বলিয়া লোকটা চলিয়া গেল।

লোকে যে এই কথা জানিতে পারিয়াছে, তাহাতে মা মনে মনে আনন্দিতই হইলেন। মার দিকে ফিরিয়া পাভেল হাসিয়া বলিল, "মাগো,এবার তোমাকেও দেখছি জেলে যেতে হবে।"

"দরকার হয় তো যাব, তাতে কি !"

ক্রমে সূর্য্য আরও প্রখর হইয়া উঠিল। স্বচ্ছ সূর্য্যালোক আসিয়া সমগ্র গ্রামখানিকে বাসন্তী শোভায় ভরিয়া তুলিল। যত বেলা হইতে লাগিল, রাস্তায় জনতা ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ জনতার গুঞ্জনের অন্তরালে কখন কারখানার যন্ত্রের ঘর্ঘর ধ্বনি ডুবিয়া গেল।

পথের এক কোণে নিকোলে তাহার সাধ্যমত বক্তৃতা দিতেছিল। বলিতেছিল, ফল থেকে যেমন রস নিঙড়ে নেয়, তেমনি করে তারা আমাদের জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ, সমস্ত অনুভূতি নিঙড়ে বার করে নিয়েছে।

জনতার মধ্য হইতে প্রতিধ্বনির মত শব্দ জাগে, সত্যি, সত্যি !

নিকোলেকে অবসর দিবার জন্য লিটল রাশিয়ান ইঙ্গিতে তাহাকে সরিয়া যাইতে বলিয়া স্বয়ং বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করিল—

"কমরেড, ওরা আমাদের শিখিয়েছে যে, জগতে নানান জাতি আছে, জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজ, য়িহুদী আরও কত কি! কিন্তু আসলে জগতে আছে দুটো জাত—মাত্র দুটো। একেবারে বিভিন্ন জাত—এক জাতের নাম দরিদ্র, অন্য জাতের নাম ধনী। তারা কথা বলে আলাদা রকমেব, তারা পোষাক পরে আলাদা রকমের, ধর্ম্ম তাদের আলাদা রকমের। ধনী ইংরেজ, ধনী জার্ম্মাণ, ধনী রুষ যখন তাদের নিজেদের দেশেরই দরিদ্র শ্রমজীবিদের সঙ্গে ব্যবহার করে তখন তারা সবাই এক। আর এই আমবা দরিদ্র রুষ শ্রমজীবি, দরিদ্র ফ্রেঞ্চ শ্রমজীবি, দরিদ্র ইংরেজ শ্রমজীবি যে কুকুর বেড়ালের জীবন যাপন করতে বাধ্য হই—সেখানেও আমরা এক।"

ক্রমশঃ জনতা বাড়িয়া উঠে। উৎসুক আগ্রহে গলাগলি দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে সবাই শোনে—

"অপর দেশের শ্রমিকরা এই সহজ সত্য বুঝতে পেরেছে, তাই আজ মে মাসের এই প্রথম দিনে, তারা সকল দেশের শ্রমিকদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে উৎসবের আয়োজন করে। এই দিন তারা সব কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। একদিনের জন্যে তারা উদাব আকাশের তলায় পরস্পর পরস্পরকে ভালো করে দেখে, বোঝে; এবং সকলে মিলে সেই দেখাশোনার মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে সকল জাতির শ্রমিকদের সম্মিলিত শক্তির সম্ভাবনার কথা। প্রত্যেকের বুকে জেগে ওঠে এক পরম আত্মীয়তা—প্রত্যেকের মনে জাগে এই মুক্তি-পণ, প্রয়োজন হলে জীবন-আহুতি দিতে হবে জগতের সকলের মুক্তির জন্যে, সত্যের মুক্তির জন্যে..."

এমন সময় জনতা হইতে কয়েকটী কণ্ঠে চীৎকার ধ্বনিয়া উঠিল, পুলিশ!

বড় রাস্তা হইতে বারজন অশ্বারোহী সৈন্যকে আসিতে দেখিয়া জনতা দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়া গেল। লিটল রাশিয়ান এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহীরা চলিয়া গেলে সে, পাভেল ও মার সঙ্গে আবার পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

পার্কের নিকট আসিয়া দেখিল সেইখানেই সমস্ত লোক এখনও সমবেত হইয়া আছে। পাভেলরা জনতার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদেব দেখিয়া সকলেই একেবারে নীরব হইয়া গেল।

একটা উঁচু যায়গায় দাঁড়াইয়া পাভেল সেই জনতাকে আহ্বান করিতে সকলের মৌন দৃষ্টি তাহার উপর গিয়া পড়িল। পাভেল বলিয়া উঠিল,

"ভাইরা সব, আজ সময় এসেছে আমাদের এই জীবন-ধারা পরিবর্ত্তন করে, এই লোভে কুৎসিত, অন্ধকারে ম্রিয়মান, মিথ্যায় পঙ্গু, অনাচারে ব্যর্থ জীবন পরিবর্ত্তন করে বিশ্ব-জোড়া মানুষের সমাজে আমাদের মানবত্বকে তুলে ধরবার।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর পাভেল আবার বলিয়া চলিল, "কমরেড, তাই আজ আমরা স্থির করেছি, প্রকাশ্যভাবে আত্ম-পরিচয় দেব—জানাবো আমরা কারা, কি চাই! তাই আজ তোমাদের সকলের সম্মুখে এই পতাকা তুললাম—এই সত্যের, ন্যায়ের ও মুক্তির পতাকা!"

পাভেলের উদ্যত-হস্তে শূণ্যে পতাকা দুলিয়া উঠিল। রক্ত-বর্ণ এক বিরাট বিহঙ্গমের মুক্ত পক্ষের মত জনতার মাথার উপর পতাকা নড়িয়া উঠিল।

পাভেল পতাকা হস্তে চীৎকার করিয়া উঠিল, দীর্ঘজীবি হক আমাদের এই বঞ্চিত শ্রমিকের দল !

জনতার মধ্য হইতে শত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল—"দীর্ঘজীবি হক আমাদের সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি, আমাদের সঙ্ঘ, আমাদের জননী !"

প্রতিধ্বনিব উত্তরে পাভেল চীৎকার কবিয়া উঠিল, "দীর্ঘজীবি হক সকল দেশেব সকল জাতির নির্য্যাতিত মানুষেব দল !"

জনতার মধ্য হইতে সহস্র কণ্ঠে এক বাণীহীন বিরাট আনন্দের উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল।

মা পাভেলের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। উৎসাহে পুত্রের হাত জড়াইয়া ধরিতে, তিনি আর এক জন অপরিচিতের হাত জড়াইয়া ধরিলেন। তখন মার চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

উন্মাদ জনতাকে শান্ত করিয়া আবার লিটল রাশিয়ানের কণ্ঠস্বর জাগিয়া উঠিল, "বন্ধুরা সব, আজ এক নূতন দেবতার নামে, সাম্যের, প্রীতির ও মুক্তির দেবতার নামে আমরা এক দীর্ঘপথে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। বহুদূর-পথ, বড় বন্ধুর ! যেখানে পৌঁছতে হবে—জানি সে অনেক দূর, আর এও জানি কাঁটার মুকুট আছে খুবই কাছে—বুকের ভেতরে। এই জনতার মধ্যে যে আছ অবিশ্বাসী সত্যের অদম্য শক্তিতে, যে আছ ভীরু, সত্যের জন্যে পারবে না মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে, নিজেকে যে আজও চেনোনি, জানোনি, বেদনার ভয়ে পঙ্গু যার চিত্ত,' সে আজ এসো না আমাদের এই তীর্থযাত্রায়। আজ

আমাদের এই আহ্বান শুধু তাকে, যে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছে আমাদের এই আদর্শকে। কে আছ আত্মবিশ্বাসী, কে আছ বন্ধু, এগিয়ে এসো আমাদের সঙ্গে, আজ এই মে মাসের প্রথমদিনে, মুক্ত-চিত্ত মানুষের এই মহা-মহোৎসবের দিনে!"

পাভেল পতাকা হাতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিছনে দেখিতে দেখিতে বিরাট জনতা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা আগাইয়া চলিল—শতকণ্ঠে সঙ্গীত জাগিয়া উঠিল,

"জাগো, জাগো হে নির্য্যাতিত শ্রমিকের দল;
ঐ রণভেরী বাজে, এগিয়ে চল হে ক্ষুধিত মানবের দল।"

মা বহুবার এই সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন—চাপা গলায় চুপি চুপি পাভেল গাহিত—লিটল রাশিয়ান তাহার সঙ্গে শীষ্ দিত। সেদিন বোঝেন নাই—আজ বুঝিলেন সেই সঙ্গীতের সার্থকতা কোথায়!

"এগিয়ে চল যেখানে রয়েছে বেদনা-বিদ্ধ বন্ধুরা সব—"

জনতার চাপে মা ক্রমশঃ পুত্রের নিকট হইতে পিছাইয়া পড়িতেছিলেন। তিনি শুধু চাহিয়া ছিলেন পাভেলের হাতের রক্ত-পতাকার দিকে। সকলের দৃষ্টি ছিল সেই দিকেই এবং সবাই সচেষ্ট কোনও রকমে সেই পতাকার নিকটতম স্থান অধিকার করিতে। জনতার মধ্যে প্রত্যেকেই আপনার উচ্ছ্বাসে কথা কহিতেছিল কিন্তু প্রত্যেকের সেই বিচ্ছিন্ন কথার ঊর্দ্ধে জাগিয়া উঠিতেছিল নূতন দিনের এই নূতন সঙ্গীত! অতীতদিনের অন্ধবিলাপ তাহাতে ছিল না। নিবীর্য্য বিষণ্ণতার ম্লান অরণ্যপথে যে-অসহায় চিত্ত কাঁদিয়া বেড়ায়, এ তাহার বাণী নয়! রুদ্ধ-শ্বাস বদ্ধ-ঘরে একটুকু নিঃশ্বাস লইবার জন্য যে আকুতি—এ তাহার সুর নয়! ভাল-মন্দ

একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ক্ষুব্ধ আক্রোশের উচ্ছ্বাসও ইহাতে ছিল না—আদিম আরণ্যক প্রবৃত্তির দোহাই দিয়া স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা ছিনাইয়া আনিবার কথাও ইহাতে নাই। এ সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিয়াছে অতি সহজ, সরল, সবল এক ভঙ্গীতে নির্য্যাতিত মানুষের বেদনার কথা, যে-বেদনা সে পাইয়াছে—ভবিষ্যতে এখনও যাহা তাহাকে পাইতে হইবে—

"যুদ্ধের জন্য জারের চাই সৈন্য।
তোমরা দিয়েছ তোমাদের বুকের সন্তানদের সেইজন্য—

সহসা মা দেখিলেন রাস্তার মোড়ে পাঁচিলের মত একটা নিশ্চল মানুষের পাঁচিল দাঁড়াইয়া আছে। ইটের মত তাহাদের প্রত্যেকের চেহারা এক এবং মা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলেন যেন তাহাদের কাহারও মুখ নাই। প্রত্যেকের কাঁধের উপর শুধু তরবারি সূর্য্যকরে ঝিক্‌মিক করিতেছে। সেই নিশ্চল পাঁচিলের দিক হইতে একটা তীব্র হিমানী প্রবাহ যেন জনতার বুকে আসিয়া লাগিল। মা সমস্তই অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

শুনিলেন পাভেল চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "বন্ধুরা সব এমনি এগিয়ে চলতে হবে, সারা জীবন। এ ছাড়া আর গতি নেই—এগিয়ে এস, এগিয়ে চল, বন্ধু!"

সহসা সঙ্গীতের সম্মিলিত স্বর কাটিয়া গেল। মাত্র কয়েকটী কণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতেছিল। মা চাহিয়া দেখিলেন জনতা দাঁড়াইয়া আছে, জনতাকে ছাড়াইয়া মাত্র কয়েকটী লোক গান গাহিতে গাহিতে আগাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের সামনে পতাকা-হস্তে পাভেল,' পার্শ্বে লিটল রাশিয়ান।

মা শুনিলেন, ফিডিয়ার কণ্ঠস্বর, জীবনের সংগ্রামে—

কে একজন তাহারই সূত্র ধরিয়া গাহিল, তোমরাই দিয়াছ আত্মবলি—

ভাল করিয়া চারিদিক চাহিতেই দেখিলেন কখন জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। পিছনে আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, শুনিলেন ছুটিয়া পলাইবার শব্দ হইতেছে। সম্মুখে দেখিলেন মাত্র জনা বারো লোক সেই নিশ্চল মানুষের পাচিলের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। এমন সময় কঠোর কঠিন কণ্ঠে কে আজ্ঞা দিল—বেয়নেট চালাও!

মা চাহিতে চেষ্টা করিলেন, মনে হইল তিনি যেন অসীম অনন্তের দিকে চাহিয়া আছেন। ধীরে ধীরে তিনি পাভেল এবং লিটল রাশিয়ানের দিকে আগাইয়া চলিলেন। দেখিলেন লিটল রাশিয়ান তাহার দীর্ঘ দেহ লইয়া পাভেলকে আগলাইয়া সবার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাভেল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, একি, আমার সামনে এসে দাঁড়ালে কেন?

তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুই হাত পিছনে দিয়া লিটল রাশিয়ান গান গাহিয়া আগাইয়া আসিল।

পাভেল চীৎকার করিয়া উঠিল, "পাশে এস, পতাকা থাক সকলের আগে!

এমন সময় পাঁচিল নড়িয়া উঠিল। একজন অফিসার আগাইয়া আসিয়া মাটীতে পা ঠুকিয়া হুকুম করিল—ফিরে যাও বলছি।

মা দেখিলেন প্রচুর সূর্য্যকরে অফিসারটীর পোষাকের পালিস ঝিক্‌ মিক করিয়া উঠিল। আচ্ছন্নের মত মা আগাইয়া চলিলেন। পিছনে আর ফিরিয়া চাহিলেন না, স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিলেন

যে, জনতা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে, ঝড়ো হাওয়ায় শুকনো পাতার মত তাহারা কোথায় ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

যে কয়েকজন লোক আগাইয়া চলিয়াছিল, তাহারা পতাকাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হুকুম হইল, পতাকা কেড়ে নাও!

মা শুনিলেন দূর :হইতে কাহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "পাভেল পালিয়ে এস!"

"পতাকাটা ফেলেই দাও না!"

নিকোলে পাভেলের পিছন হইতে বলিল, "পতাকাটা আমার হাতে দাও, আমি লুকিয়ে ফেলি।"

নিকোলের দিকে না চাহিয়া পাভেল গর্জ্জিয়া উঠিল, "চুপ কর বলছি!"

নিকোলে পতাকা লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল—মনে হইল তাহার হাতে কে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া দিল।

"কেড়ে নাও এক্ষুণি"

একজন সৈন্য লাফাইয়া পাভেলের হাত হইতে পতাকাটা ছিনাইয়া লইল। রক্ত পতাকাটা উর্দ্ধে একবার নড়িয়া উঠিয়া আবার অদৃশ্য হইয়া গেল।

"গ্রেফতার কর!"

বেয়নেট আগাইয়া কয়েকজন সৈনিক অগ্রসর হইল। মা শুনিলেন, কাতরকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, ওঃ! উন্মাদের মত মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শুনিলেন, সৈন্যদের ভিড়ের মধ্য হইতে পাভেলের স্পষ্ট স্বর। সে বিদায় চাহিতেছে, মাগো বিদায়!

শুনিলেন লিটল রাশিয়ান বলিতেছে, আসি, মা।

বুকের মধ্যে কে যেন পরম-আশ্বাসে বলিয়া উঠিল, তারা বেঁচে আছে তাহলে!

কোনও রকমে দুইটী হাত উর্দ্ধে তুলিয়া তাহাদের বিদায় সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিলেন। তারপর তাহাদের শেষবার দেখিয়া লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, আন্দ্রির সুগোল মুখখানি তাঁহার দিকে ফিরিয়াই হাসিতেছে।

মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ওরে এণ্ড্রিয়াসা, ওরে পাশা—

অদূরে তাহারা শেষবার সহকর্ম্মী বন্ধুদের নিকট বিদায় লইতেছিল। বলিতেছিল, বিদায়, বন্ধুরা সব, বিদায়!

শুনিলেন বহুমিশ্রিত ভগ্নকণ্ঠে উত্তর ধ্বনিয়া উঠিল, বিদায়, বন্ধু, বিদায়!

সহসা মা শুনিলেন যে একজন সৈন্য রূঢ়ভাবে তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া বলিতেছে, সরে যা এখান থেকে মাগি!

আপাদমস্তক তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেই, মার দৃষ্টি পড়িল,—সৈন্যটির পায়ের তলায় পাভেলের হাতের পতাকার অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ধীরে নত হইয়া সেই ছিন্ন-পতাকা হইতে একটা লাল টুকরা তুলিয়া লইতেই সৈনিকটী জোরে তাঁহার হাত হইতে তাহা ছিনাইয়া লইয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া ঘসিতে লাগিল।

এমন সময় অদূরে শোনা গেল দুইটী কণ্ঠের মিলিত সঙ্গীত—

"জাগো, হে নিদ্রিত শ্রমিকের দল!"

সেই সঙ্গীতে অফিসার ক্ষিপ্ত হইয়া সৈন্যদের লক্ষ্য করিয়া হুকুম দিলেন, সার্জ্জেণ্ট ক্রোভ, গান থামাও!

কে বলিয়া উঠিল, মুখ বন্ধ করে দাও ওদের!

সহসা গানের ভাষা মাঝপথে যেন ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল; অবশেষে ক্ষীণ স্বরটুকুও একবার যেন কাঁপিয়া উঠিল, তারপর সব নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

সার্জেন্টটী চলিয়া গেলে, সেই মথিত পতাকার অংশটুকু বুকের মধ্যে লইয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই এক গলির মুখে দেখিলেন, বহুলোক তখনও জটলা বাঁধিয়া রহিয়াছে।

একজন বলিতেছে, মনে রেখো, শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্যে তারা আজ বেয়নটের মুখে এগিয়ে যায় নি—

কেহ বলিতেছে, "সৈন্যগুলোর সামনে যখন এগিয়ে গেল—দেখেছিলে ওঃ—"

"একবার পাভেলের কথা ভাব—"

"লিটল রাশিয়ান কম কি?

"তা বটে, হাত পেছনে পিছ-মোড়া করে বেঁধেছে—কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে—"

সহসা তাহাদের সেই প্রশংসার বাণী শুনিয়া মা বলিয়া উঠিলেন,

"ভগবানের দোহাই তোরা শোন্। তোরা সবাই এতো ভালো—একবার শুধু তোরা তোদের হৃদয়-মন খুলে চেয়ে দেখ্। সমস্ত ভয় দূর করে দিয়ে, তোরা একবার স্পষ্ট করে চেয়ে দেখ্ দেখি—দেখ্, আমাদের বুক-চেরা ধন সব চলেছে এগিয়ে জগতের পথে—সত্যকে খুঁজে বার করবার জন্যে; আমাদের দেহের রক্ত আজ মূর্ত্তি ধরে, ওরে চেয়ে দেখ্ চলেছে একলা পথে। তোদের জন্যে, তোদের সকলের কল্যাণের জন্যে তারা আহুতি দিতে চলেছে তাদের প্রাণ। তারা তাদের আলো দিয়ে নতুন সূর্য্য গড়তে চায়,

তাদের জীবন দিয়ে তারা চায় নতুনতর জীবন গড়ে তুলতে—কল্যাণে সুন্দর, সত্যে সুমহান্ নতুনতর এক বিরাট জীবন—"

সহসা মার মনে হইল যেন দেহের অভ্যন্তরে হৃদ্-পিণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে, গলা শুকাইয়া আসিল। অন্তরের অন্তস্থলে কোথায় কোন্ গভীরতম প্রদেশে সর্ব্বব্যাপী এক সর্ব্বংসহা প্রেমের মহা-বাণী নবজন্মলাভ করিতেছিল—তাহারই জন্ম-বেদনায় তাঁহার মাতৃদেহ দীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, লোকে মন্ত্র-মুগ্ধভাবে নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে—তাঁহার কথা শুনিবে বলিয়া সকলেই উদ্‌গ্রীব!

"চেয়ে দেখ্, আনন্দ-লোকের দিকে চলেছে আমার আনন্দ গোপালরা! তোদের সকলের জন্যে, তোদের সকলের সুখের জন্যে সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে আজ তারা যাত্রা করলো। এই দুঃখিনী মার একমাত্র অনুরোধ—তাদের তোরা ত্যাগ করিস্ না, তাদের একলা পথে দাঁড় করিয়ে তোরা পালিয়ে যাস্‌নে! নিজেদের দিকে চেয়ে, নিজেদের লজ্জা করতে শেখ্। তাদের কথা মনে করে, ভালবাসতে শেখ্!"

সহসা মার সর্ব্ব-দেহ অবশ হইয়া আসিল। মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি সেইখানেই পড়িয়া গেলেন।

মা

ম্যাক্সিম্ গর্কী

অনুবাদক
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় ভাগ

গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ঘোষ
১১ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

দাম পাঁচসিকা

প্রথম হইতে ৩২ পৃষ্ঠা 'ডেভেনহ্যামস্
প্রিণ্টিং ওয়াকর্স'এ ও বাকী অংশ
শ্রীসরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত।

নানা রঙের আবছায়া স্মৃতির অস্পষ্টতার মধ্যে সেদিন মার আচ্ছন্নের মত কাটিয়া গেল। সারা দেহ ও মনে অবসাদের গ্লানি। মাঝে মাঝে চলিয়া-যাওয়া ছেলে ক'টার মুখ মনে পড়ে। ভাব-ঘোরে দেখেন, তাহারা চলিয়াছে, পতাকা দুলিতেছে, পুলিশের লোকটি ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। গানের শব্দ কাণে আসিয়া লাগে, তারপর সমস্ত পাংশু হইয়া যায়। সেই পাংশু মহাশূণ্যতার মধ্যে ফুটিয়া উঠে রৌদ্রে-পুড়িয়া-যাওয়া পাভেলের মুখখানি আর সেই সঙ্গে আন্দ্রির দু'টা চোখ,—আকাশের মত স্বচ্ছ নীল।

অস্থির হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ান, কখনও জানালায় গিয়া বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া থাকেন; আবার কি মনে করিয়া জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া মাটীর দিকে মাথা নীচু করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ান। চলিতে-ফিরিতে চমকাইয়া উঠেন। লক্ষ্যহীন ভাবে ঘরের চারিদিকে কি যেন খুঁজিবার জন্য চাহিয়া দেখেন। বার বার জল খান কিন্তু তৃষ্ণা তবুও দূর হয় না। ভিতরের দাবাগ্নি-জ্বালা কিছুতেই নিভে না। আজিকার দিনটাকে যেন নিষ্ঠুর আঘাতে কে দ্বিখণ্ড করিয়া দিয়াছে। সূর্য্যোদয়ে ছিল উৎসাহ, ছিল নির্ভরতা; তারপর মধ্য-দিন যাইতে না যাইতে সুরু হইল নিরন্ধ্র নিরর্থকতা—বুঝি ইহার সমাপ্তি কোথাও নাই! শূণ্য বিমূঢ় চিত্তে শুধু এই প্রশ্ন জাগিতেছিল, এখন কি হবে?

দুই একজন প্রতিবেশিনী সমবেদনা জানাইয়া গেল কিন্তু তাহাতে মার মন কিছুমাত্র সাড়া দিল না।

সন্ধ্যা বেলায় পুলিশের লোক আবার আসিল। তাহাদের আগমন-বার্ত্তা সজোরে জ্ঞাপন করিয়া অঙ্গ দোলাইয়া তাহারা ঘরে ঢুকিল। মুখে তৃপ্তির হাসি।

মা—

একজন অফিসার মার দিকে অগ্রসর হইয়া ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পরম সৌভাগ্য এই নিয়ে তিনবার আপনার দরজায় আসতে হলো। কেমন আছেন?

শুষ্ক জিহ্বা ততোধিক শুষ্ক ওষ্ঠে স্পর্শ করাইয়া মা চুপ করিয়া রহিলেন। অফিসারটী আপনার মনে উপদেশ-বাণী বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার একটী কথাও মার মনে গিয়া পৌঁছাইতেছিল না—যেন কোথায় ঝিঁঝিঁ পোকা নিরর্থক শব্দ করিতেছে। একবার অফিসারটী বলিয়া উঠিল, এ তোমার নিজের দোষ। ভগবান আর জারকে শ্রদ্ধা করতে তোমার ছেলেকে তুমি শেখাতে পার নি—এতো তোমারি দোষ।

এইবার মার মুখ হইতে কথা বাহির হইল। তিনি আপনার মনে উদাস ভাবে বলিয়া উঠিলেন, সেই পথে একলা তাদের ছেড়ে দেবার জন্যে যে শাস্তি সে আমাদের ছেলেরাই আমাদের দিচ্ছে। আজকাল তারাই আমাদের বিচারক।

কথাগুলি ভাল করিয়া শুনিতে না পাইয়া অফিসারটী হুঙ্কার দিয়া উঠিল, কি বল্লে? জোরে বল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, বলছিলাম, আমাদের ছেলেরাই আজ আমাদের শাস্তি-দাতা।

অফিসারটী রাগে তাড়াতাড়ি কি বলিল—কিন্তু মার কাণে তাহার একটী বর্ণও গিয়া পৌঁছাইল না।

সাক্ষীর জন্য পুলিশের লোকেরা মেরিয়াকে ধরিয়া আনিয়াছিল। মার পাশে চুপটী করিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল—মার মুখের দিকে চাহিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

মেরিয়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া অফিসারটী কি প্রশ্ন করিতেই সন্ত্রস্ত ভাবে সে বলিয়া উঠিল, হুজুর, আমি কিচ্ছু জানি না। আমি মুখ্যু মেয়ে-মানুষ, এ সবের কিচ্ছু জানি না গরীব লোক—ফিরি করে কোন রকমে দিন চালাই।

অফিসারটী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, চুপ কর, তবে।

মাকে খানাতল্লাস করিবার ভার কিন্তু মেরিয়ার উপর পড়িল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আতঙ্কে অফিসারটীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, হুজুর, সে আমি কেমন করে পারি?

রাগে মাটীতে পা ঠুকিয়া অফিসারটী গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া মার কাছে আগাইয়া আসিয়া মিনতির সুরে সে বলিল, কি আর করি বল! কিছু মনে করিস্ না দিদি!

মার গায়ের জামায় হাত দিতেই, ক্ষোভে এবং লজ্জায় মেরিয়ার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে বলিয়া ফেলিল, কুকুরের দল!

ঘরের এক কোণ হইতে অফিসারটী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ফিস্‌ফাস্ কি হচ্ছে ওখানে?

ভয়ে মেরিয়া উত্তর দিল, কিছু না হুজুর; আমাদের ঘর-কন্নার কথা, হুজুর!

খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্টে সহি করিবার সময় মা কম্পিত-হস্তে ছাপান নামটীর উপর হাত বুলাইয়া গেলেন—

"পেলাগুয়ে নিলোভনা, বিধবা কুলী-কামিন"

কাজ শেষ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল। আবার একা মা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বুকের উপর হাত দুটী রাখিয়া নিষ্পলক

নয়নে বাহিরের শূণ্য অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রদীপে তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছিল; শেষবার দপ্ করিয়া ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাও নিভিয়া গেল। অন্ধকারে একা বসিয়া রহিলেন—কাহারও বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ নাই—অন্তরে যেন কোনও আঘাতের চিহ্ন নাই। বুকের ভিতরে নিবিড় কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়া সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। কতক্ষণ এইভাবে জানালায় দাড়াইয়াছিলেন, তাহা তিনিও জানিতেন না। একবার শুনিলেন, পথে জানালার তলায় দাড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া মেরিয়া বলিয়া গেল, হতভাগি, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্—যা একটু ঘুমুগে যা। তারপর কখন অবসন্ন হইয়া সেই জানালার ধারেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

পরের দিন দুপুর বেলা আইভানোভিচ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই মার মন ভয়ে চমকাইয়া উঠিল। তাহার অভিবাদন গ্রহণ না করিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, আজই আবার কেন তুমি এলে! পুলিশের লোকে যদি তোমাকে এখানে গ্রেপ্তার করে তা হলে পাভেলের আর নিষ্কৃতি নেই!

মার হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া চোখের উপর চসমাটা ঠিক করিয়া লইয়া আইভানোভিচ বলিল, পাভেল আর আন্দ্রির সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত হয়েছিল, যদি তারা গ্রেপ্তার হয়, তাহলে তার পরের দিনই যেন তোমাকে আমি শহরে নিয়ে যাই।

—যদি তাদের তাই ইচ্ছে—আমার কোনও আপত্তি নেই—আর আমি কারুর গলগ্রহ হয়ে চুপ করে বসে থাকবো না।

—সে কথা মনেই আনবেন না। আমি একলা থাকি—একটা বোন আছে—সে কচিৎ কখন আসে।

—কিন্তু আমি কারুর গলগ্রহ হয়ে চুপ করে বসে থাকতে চাইনা—

—আঃ, তার ভাবনা কি, যদি কাজ করতে চান তাও একটা জুটে যেতে পারে—

কাজ বলিতে মা এখন বুঝেন, যে আদর্শ অসমাপ্ত রাখিয়া তাহার ছেলে চলিয়া গিয়াছে, সেই একমাত্র কাজ।

আইভানোভিচের দিকে অগ্রসর হইয়া উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি বলচো কাজ পাওয়া যাবে?

—অবশ্য আমার সংসারটী ছোট, এত ছোট যে নেই বল্লেই চলে—বিয়ে থা তো আর করা হয় নি।

—ওসব কথা কেন তুলছো—আমি তো ঘরকন্নার কাজের কথা বলছি না—আমি চাইছি কঠিন যা কিছু কাজ তাই করতে—এই জগতের কোন কাজ—

মার দিকে অগ্রসর হইয়া চোখেতে হাসি ভরিয়া আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, যদি তুমি চাও জগতের কাজ তোমার ও জায়গা হবে, মা।

ইত্যবসরে মনে মনে মা এই সহজ ব্যাপারটী ভাবিয়া লইলেন, আমি পাভেলের কাজে একদিন সাহায্য করতে পেরেছিলাম—এবারেও তাই করবো। তার আদর্শের জন্যে যত বেশী লোক কাজ করবে ততই লোকের সামনে তার কথা সত্যি হয়ে উঠবে।

তবুও তাঁহার অন্তরের আবেগ এবং উদ্বেলতা সমগ্রভাবে যেন প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না। অপরিজ্ঞাত ইচ্ছার ঘূর্ণাবর্ত্তে ব্যথিত হইয়া শান্তকণ্ঠে মা বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু আমি কি করতে পারি? কি আমার কাজ?

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া আইভানোভিচ বিপ্লবীদলের ক্রিয়া-কাণ্ডের

খুটিনাটি ব্যাপার মাকে বুঝাইতে লাগিল। হঠাৎ একটা কথা স্মরণে আসিতে সে বলিল, দেখুন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে—যখন জেলে পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন—তখন কোনও রকমে যে চাষাটা সেই খবরের কাগজের কথা বলেছিল, তার ঠিকানাটা জেনে আসবেন।

আনন্দে মা বলিয়া উঠিলেন, আমি জানি—তাদেব ঠিকানা আমি জানি। তোমাদের কি কাগজ পত্র আছে আমাকে দাও—আমি এক্ষুণি তাদেব কাছে পৌছে দিয়ে আসছি। আমার কাছে বই থাকলে কেউ সন্দেহ করবেনা—কাবখানায় তো কত বিলি করেছি।

মা মনে মনে তখন চিত্র দেখিতেছিলেন, দীর্ঘপথ বাহিয়া, অরণ্য প্রান্তর গ্রামান্তবেব মধ্য দিয়া তিনি চলিয়াছেন, পিঠে তাঁহার একটা চামড়ার থলি, হাতে একটা লাঠী···

—বুঝলে, বাছা, এখন তুমি সব ঠিক ঠাক করে দাও, যাতে আমি তোমাদের এই কাজে লাগতে পারি। তোমাদের জন্যে আমি সব জায়গায় যাব। গ্রীষ্ম বর্ষা শীত সারা বছর ধরে আমি চলবো। যতদিন না মৃত্যু এসে টেনে নিয়ে যায় ততদিন এমনি চলবো! ওরে বুড়ো বয়সে আজ আমি সত্যের পথে তীর্থ-যাত্রায় বেরুবো—আমার মত বুড়ীর ভাগ্যে এর চেয়ে ভাল আব কি ঘটতে পারে? ভবঘুরের জীবন আমার বড় ভাল লাগে। সারা পৃথিবী সে আপনার মনে ঘুরে বেড়ায়, কিছু নেই তার সম্বল, কিছু নেই তার কামনা, শুধু দিনান্তে এক টুকরো রুটী। কেউ নেই তাকে হিংসে করবার—সবাইকে এড়িয়ে সে চলেছে একা। তেমনি করে আমিও বেরুবো—যেখানে থাকবে আমার আন্দ্রি, যেখানে থাকবে আমার পাভেল—

এক অপূর্ব্ব বিষন্নতায় মার মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। চোখের সামনে তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন গৃহহীন হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—যিশুর নামে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিতেছেন—

আইভানোভিচ সন্তর্পণে মার হাত দুইটী ধরিয়া বলিল, আপনি মস্ত বড় একটা দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে চলেছেন—একবার ভাল করে ভেবে দেখুন—

—ভেবে দেখবো কি? এতে ভাববারই বা আমার আছে কি? এ ছাড়া কিসের জন্যে আর বেঁচে থাকবো! কার কাজে আমি আর লাগবো? একটা সামান্য গাছ সেও ছায়া দেয়, কাঠ দেয়, আগুন হয়, হিমে লোককে দেয় আনন্দ। একটা বোবা গাছ, সেও মানুষের কাজে লাগে—আর আমি রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ, আমি লাগবো না কোনো কাজে? ছেলেরা—বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গড়া ছেলেরা, আমাদের বুক-ছেঁড়া রত্ন সব, তারা আজ অম্লান বদনে স্বাধীনতার জন্যে, মুক্তির জন্যে নিজেদের হাসতে হাসতে বিলিয়ে দিচ্ছে, আর আমি ছেলের মা হয়ে—শুধু দাঁড়িয়ে তাই দেখবো?"

মার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—সম্মুখে জনসমুদ্র চলিয়াছে—মুখে তাহাদের জয়গান—পতাকা-হস্তে সবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারই পুত্র—

—আমার ছেলে যদি সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারে—আমি মা, কেমন করে তা দেখে চুপ করে বসে থাকবো? আজ আমি তাকে বুঝেছি—সত্যের জন্যে সে জীবন উৎসর্গ করেছে! এতদিন পরে আমি আজ বুঝেছি সেই সত্যকে। আজ আমি বুঝি কি নিদারুণ বোঝা তাদের ঘাড়ে। আমিও ভার নেবো তার—দোহাই তোদের, আমাকে নে তোদের সঙ্গে—

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আইভানোভিচ সকরুণ দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া বলিল, জীবনে এই প্রথম আমি এই রকম কথা শুনছি—

—এ ছাড়া আর আমি কি বলতে পারি? এই হতভাগিনী মার বুকে আজ যে-সমস্ত কথা জমা হয়ে উঠছে তাকে যদি ভাষা দিতে পারতাম, তা হলে মনে হয় হাজার পাথরের চোখ ফেটে জল ঝরে পড়তো—মানুষকে দুঃখ দিয়ে যাদের আনন্দ তাদেরও বুক দুলে উঠতো। একদিন যেমন তারা যিশুকে জানিয়েছিল আর আজ যেমন তারা জানাচ্ছে দুধের বাছাদের বিষের আস্বাদ কি, তেমনি আমিও আজ তাদের জানাতে চাই বিষের আস্বাদ কি। ওরে, মার বুকে দাগ কেটেছে ওরা—

আইভানোভিচ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের শীর্ণ আঙ্গুলগুলি কাঁপিতেছিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য সে বলিল,তা হলে সমস্ত ঠিক রইলো—আপনি আমার সঙ্গে শহরে যাচ্ছেন?

ঘাড় নাড়িয়া মা সম্মতি জানাইলেন।

—যত শিগ্‌গির পারেন চলে আসুন—

সহসা কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসাতে সঙ্কুচিত হইয়া সে বলিল, বুঝছেন তো—আপনার জন্যে মন বড় চিন্তিত হয়ে থাকবে—

মা মাথা তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। কে সে তাঁহার? কেন তাহার এই স্নেহ-দুর্ব্বলতা?

চক্ষু নত করিয়া তেমনি কণ্ঠস্বরে আইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কাছে পয়সা কড়ি কিছু আছে কি?

—না!

তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া কিছু অর্থ মার হাতে দিয়া বলিল, যৎসামান্য এখন রাখুন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মা হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তোদের সবই উল্টো। তোদের কাছে টাকা কড়িরও কোন মূল্য নেই। লোকে দুটো পয়সা পাবার জন্যে কি না করে? আর তোরা, এক টুকরো কাগজ ও এক টুকরো তামার বেশী মনে করিস্ না। অন্য লোকের ওপর মায়া-মমতা আছে বলেই ওগুলো সঙ্গে রাখিস্!

আইভানোভিচ হাসিয়া বলিল- ও বড় গণ্ডগোলের জিনিষ—দিতেও গণ্ডগোল, নিতেও গণ্ডগোল।

যাইবার সময় মার হাত ধরিয়া আইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করিল, —তাহলে শিগ্‌গির আসছো, মা?

মা সম্মতি জানাইতে সে ধীর পাদক্ষেপে চলিয়া গেল।

তার চারদিন পরে দুইটী ট্রাঙ্ক বোঝাই করিয়া মা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলেন। গ্রামের সীমান্ত ছাড়িয়া আসিবার সময় সহসা মা একবার পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন—জীবনের আঁধারতম দিনগুলি যেখানে কাটাইয়া আসিয়াছেন, মনে হইল যেন চিরকালের মত তিনি সেই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছেন। একটা বৃহৎ রক্ত-কালো মাকড়সার মত দেখিলেন কারখানাটা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ছোট্ট ছোট্ট একতালা বাড়ীগুলো জলার ধারে দাঁড়াইয়া যেন ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। ধোঁয়ায় চারিদিক কালো। তাহারি মধ্যে খোলা জানালা দিয়া বাড়ীগুলি যেন পরস্পর পরস্পরকে সকরুণ দৃষ্টিতে দেখিতেছে। ক্রমে গ্রামের গির্জ্জাকে পিছনে ফেলিয়া চলিলেন। কিছুদূরে গিয়া পিছনে সেই গির্জ্জার দিকে চাহিয়া মার মনে হইল, কারখানার মত তাহারও রঙ রক্ত-কালো হইয়া গিয়াছে।

মা—

গাড়োয়ান আপনার মনে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে। ঘোড়াকে বকিতেছে, কাদার কাছে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার রাশ ধরিয়া আবার খানিকটা হাঁটিয়া চলিতেছে।

হাঁটিয়া চলিতে চলিতে বলে, দিদি, যে পথেই যাও, দুঃখুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই! দুঃখু থেকে দূরে নিয়ে যাবার জেনো একটাও পথ নেই—যত পথ দেখছো সব সেই এক জায়গায় পৌঁছে দেয়—

বহুদিন গাড়ীর চাকায় তেল দেওয়া হয় নাই। অরণ্য-পথ চাকার প্রতিবাদ-শব্দে মুখর হইয়া উঠিতেছিল।

একটা পবিত্যক্ত জনবিরল পথের ধারে বহুকালের পুরাণো একটা দোতলা বাড়ীতে একপাশে তিনখানি ঘর লইয়া আইভানোভিচ বাস করিত। ঘরগুলির সামনে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান। বাগান হইতে নানা রকম গাছের শাখা খোলা জানালায় ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিক নিঃস্তব্ধ। নীরবে ঘরের দেওয়ালে, মেঝেতে গাছের ছায়াগুলি কাঁপিতেছে। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের সঙ্গে লাগান সেল্‌ফ্-ভরা বই। তাহার উপরে দেওয়ালের গায়ে গম্ভীর মূর্ত্তি কাহাদের সমস্ত ছবি টাঙানো রহিয়াছে।

বাগানের দিকে জানালা-ওয়ালা একটা ছোট্ট ঘরে মাকে লইয়া গিয়া আইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে আপনার কোনও বিশেষ অসুবিধে হবে না বোধ হয় ?"

মা দেখিলেন, এ ঘরেও সেল্‌ফ-ভরা বই। জানালায় ফুলের টবে হাত দিয়া দেখেন, মাটী শুকণো! কতদিন তাহাতে জল দেওয়া হয় নাই।

লজ্জিত হইয়া আইভানোভিচ বলে, ফুল বড় ভালবাসি কিন্তু সময় নেই ওদের দেখবার!

জীবনে এই প্রথম মা অপরের বাড়ীতে সম্পূর্ণ অজানা জায়গায় বাস করিলেন কিন্তু তিনি নিজে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, আদৌ তাঁহার কোনও অসোয়াস্তি বোধ হইতেছে না। মনে হইতেছে যে, তিনি যেন তাঁহার নিজের ঘরেই আছেন।

ঘরের জিনিষ-পত্রের উপর কাহারও যে কোন দৃষ্টি নাই—মা ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চারিদিক এলোমেলো,

অগোছালো। সামোভারে 'মরচে' পড়িয়া গিয়াছে, বই খাতাপত্র চারিদিকে ছড়ান, নূতন করিয়া মা গৃহস্থালী সাজাইতে লাগিয়া গেলেন।

পরের দিন সকাল বেলা চা খাইবার সময় আইভানোভিচ ও মা গল্প করিতেছিলেন। আইভানোভিচ নিজের পরিচয় দিবার সূত্রে বলিতে-ছিল, "আমি ছিলাম একজন গ্রাম্য শিক্ষক আমার বাবা ছিলেন কারখানার সুপারিণ্টেডেণ্ট। গ্রামের চাষাদের মধ্যে আমি লুকিয়ে বই বিলি করতাম ও তাদের পড়ে শোনাতাম পুলিশ জানতে পেরে আমাকে গ্রেফতার করে। সেবার জেল থেকে বেরিয়ে একটা বইএর দোকানে চাকরী পেলাম কিন্তু পুলিশের বিবেচনায় সৎভাবে জীবন-যাপন না করার অপরাধে আবার জেলে যেতে হলো জেল থেকে সেবার আর্চ্চআঞ্জেলে আমাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। সেখানেও শান্তি নেই—সেখানকার গভর্ণরের সঙ্গে একদিন বাধিয়ে দিলাম ঝগড়া। প্রতিফল স্বরূপ সেখান থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে যাই শ্বেত-সমুদ্রের ধারে এক নির্জ্জন গ্রামে। সেই জনহীন গ্রামে নির্ব্বাসিত হয়ে পাঁচ বৎসর বাস করতে হয়।

ইতিমধ্যে এই রকমের কিছু কিছু কাহিনী মা শুনিয়াছিলেন। সকলের বেলাতেই তিনি লক্ষ্য করিতেন যে, ইহারা নিজেদের দুঃখকষ্টের কথা পরম-নির্ব্বিকার ভাবে কাহারও প্রতি কোনও আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া একান্ত সহজ ভাবে কেমন বলে—যেন সেই সমস্ত নির্য্যাতনের জন্য কেহই দায়ী নহে—তাহা যেন বাঁচিয়া থাকার মত অবশ্যম্ভাবী।

—আজ আমার বোন আসবে এখানে।

—বিয়ে হঁয়েছে তার?

হয়েছিল, এখন সে বিধবা, তার স্বামী সাইবেরীয়াতে নির্ব্বাসিত হয়।

—মা

—সেখান থেকে পালিয়ে আসবার সময় ভয়ানক ঠাণ্ডা লেগে তার অসুখ হয় এবং তার ফলেই ভদ্র-লোক এই পৃথিবী থেকে ছুটি পায়।

—সে কি তোমার ছোট?

—না, সে আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। তার কাছে আমি বহু জিনিষের জন্যে ঋণী ভারী গুণী মেয়ে—এই যে পিয়ানো দেখছেন—সে এসে বাজায়—এই যে গানের পাতা চারদিকে ছড়ান—তারই কীর্তি—ভারি সুন্দর বাজায়—

—কোথায় থাকে?

মৃদু হাসিয়া আইভানোভিচ বলিল, সর্বত্র। যেখানে বুক পেতে দেবার প্রয়োজন সেইখানেই আছে সে—

—তোমাদের এই আন্দোলনে?

—নিশ্চয়ই।

আইভানোভিচ তখন বাহির হইয়া গিয়াছিল—দ্বিপ্রহরে বিছানায় শুইয়া মা এই আন্দোলনের কথা ভাবিতেছিলেন। সহসা দেখেন ঘরের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি সুন্দর-দেহা অপরূপ সুসজ্জিতা নারী দাঁড়াইয়া।

ধীরে অগ্রসর হইয়া নারীটী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনিই কি পাভেলের মা?

সহসা সেই সুসজ্জিতা সম্ভ্রান্তা নারীকে দেখিয়া মা শশব্যস্ত হইয়া উত্তর দিলেন, হাঁ, আমিই পাভেলের মা।

দুই হাত দিয়া মার হাত দুইটী ধরিয়া নবাগতা বলিল, আমি ঠিক এই রকমই ভেবেছিলাম। পাভেল আমাদের অনেক দিনের বন্ধু।

মা—

আপনার কথা সে প্রায়ই বলতো! কিন্তু এখন রীতিমত ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে, এক কাপ কফি দিতে পারেন?

—নিশ্চয়ই, এক্ষুণি তৈরী করে দিচ্ছি।

কফির সরঞ্জাম ঠিক করিতে করিতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি সে আমার কথা বলতো?

—নিশ্চয়ই, আপনার সম্বন্ধে সে অনেক কথাই বলতো। একটা সিগারেটের বাক্স হইতে সিগারেট ধরাইয়া নবাগতা জিজ্ঞাসা করিলেন, পাভেলকে নিয়ে আপনার খুব অশোয়াস্তি হতো না?

স্পিরিটল্যাম্পের নীলাভ শিখার দিকে চাহিয়া মা হাসিয়া ফেলিলেন। এই নবাগতার সম্মুখে সমস্ত সঙ্কোচ পুত্র-গর্ব্বের মধ্যে তলাইয়া গেল।

—অশোয়াস্তি বোধ করতাম নিশ্চয়ই। কিন্তু আজ দেখছি, সে যেখানেই থাকুক, সঙ্গীহীন নয়—এমন কি আমিও আজ আর একলা নই!

নবাগতার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম?

—আমার নাম সোফিয়া—আইভানোভিচের দিদি।

তারপর কোনও ভূমিকা না করিয়া সোফিয়া বলিল, দেখুন, এখন অমাদের সব চেয়ে বড কাজ কি জানেন? ওরা এখন হাজতে আছে, শিগ্‌গিরই বিচার হবে এবং খুব সম্ভব বিচারে পাভেল নির্ব্বাসিত হবে। সাইবেরিয়াতে পচতে তাকে দেওয়া হবে না—তাকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন! সেইজন্যে আমাদের প্রথম চেষ্টা হবে তাকে সাইবেরিয়া থেকে লুকিয়ে সরিয়ে আনা—

—কিন্তু লুকিয়ে সে কতদিন থাকতে পারবে? আর লুকিয়ে থাকবেই বা কি করে?

—ও, তার কোনও ভাবনা নেই। কত লোক এমনি পলাতক হয়ে কাজ করছে। এইমাত্র একজনের সঙ্গে দেখা হল তাকে নিরাপদে পার করে দিয়ে এলাম। আমার এই সব বড়লোকের পোষাক যা দেখছেন —এই যে আমার চালচলন—সবই তৈরী-করা এবং এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কার্য্য-উদ্ধার করা। তা না হলে মনে করেন, এই সমস্ত পরতে আমার ভাল লাগে? অনাড়ম্বর রূপ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসে, অনাড়ম্বরতাই তার একমাত্র রূপ।

বিকাল চারটার সময় আইভানোভিচ ফিরিয়া আসিল। খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যা-বেলা গল্পচ্ছলে আইভানোভিচ কাজের কথা তুলিল।

—এখন সোফিয়া শোন, তোমার জন্যে একটা নতুন কাজ আছে। বোধহয় জানো, গ্রামের লোকদের জন্যে একটা খবরের কাগজ বার করবার ভার আমরা নিই। কিন্তু গ্রেফতারের ফলে গ্রামের লোকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ইনি একজনের ঠিকানা জানেন। সে কাগজ বিলি করার ভার নেবে। তোমাকে এঁর সঙ্গে গিয়ে শিগ্‌গির একটা বন্দোবস্ত করে আসতে হবে!

—বেশ, তাই হবে! এখান থেকে কতদূর?

—পঞ্চাশ মাইল হবে!

—চমৎকার! আচ্ছা, যাবার আগে তা হলে একটা গান গেয়ে যাই— কি বলুন আপনার আপত্তি নেই তো?

—আমার কথা আপনি ভাববেন না—মনে করুন আমি এখানে উপস্থিত নেই—

—তা হলে আইভানোভিচ শোনো—এটা গ্রীগের তৈরী—তার আগে জানালাটা বন্ধ করে দাও—

পিয়ানো খুলিয়া সোফিয়া প্রথমে সন্তর্পণে বাম হাত দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে, ঘন রসার্দ্র একটী সুর বাহির হইল। তারপর আর একটী সুর গভীর, দীর্ঘ—তাহার সহিত আসিয়া মিশিল। দুইটী সুর আপনার ভার সহিতে না পারিয়া যেন কাঁপিয়া উঠিল। সহসা দক্ষিণ হাতের স্পর্শে, এক ঝাঁক পাখীর এক সঙ্গে উড়িতে উড়িতে গায়ে গা লাগার মত একসঙ্গে তেমনি দ্রুত অসংখ্য সুরের বিহঙ্গম উড়িয়া চলিল। এবং এই সমস্ত মিলিত সুরের পিছনে ঝঞ্ঝা-মথিত সমুদ্র-তরঙ্গের মত একটী আর্ত্ত উন্মাদ শব্দ সারাক্ষণ দুলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিচিত্র সুরের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া মা নীরবে বসিয়াছিলেন। এ সঙ্গীতের কিছুই তিনি বুঝিতেন না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে তিনি দেখিতেছিলেন, ঘরের এককোণে পায়ের উপর পা দিয়া তন্ময় হইয়া আইভানোভিচ বসিয়া আছে। একটী পথভ্রান্ত সূর্য্যের আলো কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া সোফিয়ার সোণালী কেশগুচ্ছের উপর পড়িয়াছে। সেখান হইতে পাশ কাটাইয়া পিয়ানোর পর্দ্দার উপর পড়িয়া সোফিয়ার অঙ্গুলি স্পর্শে নিত্য স্পন্দমান হইতেছিল। খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল, বাহিরে বাগানে এ্যাকেসিয়া গাছের ডালগুলি অবিরাম দুলিতেছে। কখন সুরের তরঙ্গে সমস্ত ঘর ভরিয়া গিয়াছে, মা জানিতে পারেন নাই। কখন তিনি সেই শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাও জানিতে পারেন নাই।

বহুদূরে তাঁহার মন চলিয়া গিয়াছিল। অন্ধকার অতীতের গহ্বর হইতে বহুদিনের ভুলিয়া-যাওয়া অন্যায় অত্যাচার আর অবিচারের স্মৃতি তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

—একবার তাঁহার স্বামী গভীর রাত্রে পরিপূর্ণ মাতাল হইয়া বাড়ী

ফিরিল। কোনও কথা না বলিয়া হাত ধরিয়া বিছানা হইতে টানিয়া মাটীতে ফেলিয়া লাথি মারিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া উঠিল,—দূর হয়ে যা, এখান থেকে—তোকে দেখতে চাই না—

তাহাব সেই লাথির আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কোনও মতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি দুই বছরেব শিশু ছেলেটীকে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন—যেন সে তাঁহার বর্ম। উলঙ্গ শিশু চীৎকাব করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দূব হ'য়ে যা এখনও বলছি—বলিয়া স্বামী তাড়া কবিয়া আসিল। লাফাইয়া রান্নাঘবে আসিয়া একটা ছেঁডা জামা গায়ের উপর ফেলিয়া ছেলেটীকে একটা কাঁথায় মুডিযা লইয়া কোনও প্রতিবাদ, কোনও চীৎকার না কবিয়া সেদিন সেই গভীব বাত্রে নগ্নপদে নির্জ্জন পথে বাহির হইয়া পডিলেন। ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম-পাড়ানি গান গাহিতে গাহিতে রাস্তা দিয়া চলিলেন।

ক্রমশঃ রাত্রি শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। পাছে সেই অৰ্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় কেউ দেখিয়া ফেলে—এই লজ্জায় এবং আশঙ্কায় পথের শেষে জলার দিকে একটা ঝোপেব মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। রাত্রি-শেষের সেই ভয়াবহ নির্জ্জনতার মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন— দু'বছরের শিশুটীকে বুকে দোলা দিতে দিতে অস্ফুটস্বরে ঘুম-পাড়ানি ছড়া গাহিতে লাগিলেন। শিশুটী ঘুমাইয়া পড়িল কিন্তু তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত অন্তর তেমনি জাগিয়া রহিল।

ভোরের দিকে মাথার উপর দিয়া কি একটা পাখী ডানার ঝাপট মারিয়া চলিয়া গেল। আর বিলম্ব করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া ঘরের দিকে ফিরিলেন। হয়ত ঘুমাইয়া আছে নয়ত—নূতনতর আঘাত সহিতে হইবে—

পিয়ানোর শেষ-পর্দ্দার সুর মিলাইয়া গেলে সোফিয়া ভাইএর দিকে ফিরিয়া ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম লাগলো ?

ঘাড় নাড়িয়া আইভানোভিচ বলিল, অতি সুন্দর! লোকে বলে গান শুনে ভাবতে নেই! কিন্তু আমি না ভেবে পারি না! তোমার গান শুনতে শুনতে আমার মনে হতে লাগলো মানুষ যেন অনবরত প্রকৃতিকে প্রশ্ন করছে—অনবরত যেন কাঁদছে, চীৎকার করছে, বুক চাপড়ে বলছে, কেন? প্রকৃতি কোনও উত্তর দেয় না—সে নীরবে শুধু নব-নব সৃষ্টি করে চলেছে। তার এই নির্ব্বাক মৌনতার মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর জেগে ওঠে— আমি জানি না!

নীরবে মা আইভানোভিচের কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিবার ইচ্ছাও তাঁহার যেন ছিল না। তাঁহার অন্তর তখন স্মৃতির কণ্টকে ভরিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত মনপ্রাণ তাঁহার সঙ্গীত চাহিতেছিল—আরো সঙ্গীত! অতীতের দিকে ফিরিয়া চান আর সামনের ভাই-বোন দুজনকে দেখেন—মনে মনে ভাবেন—এই তো এরাও মানুষ—দুটী ভাই-বোন বন্ধুর মত কেমন সুখে বাস করছে—বই পড়ে, গান গায়—গালাগালি করে না—মদ খায় না—একজন আর একজনকে আঘাত দিয়ে আনন্দ পাবার জন্যে উৎসুক নয়।

পিয়ানোর পর্দ্দায় আঙুল দিয়া আঘাত করিয়া সোফিয়া ভাইকে ডাকিয়া বলিল, এই গানখানি কোষ্টিয়ার বড় প্রিয় ছিল। প্রায়ই তার জন্যে আমি এই গানটা বাজাতাম। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই গানের সুরকে কেমন সে ভাষা দিতে পারতো?

একটু থামিয়া আপনার মনে হাসিয়া সোফিয়া বলিয়া উঠিল—সে

একটা পুরোদস্তুর মানুষ ছিল—জগতের যে কোনও জিনিষ তার মনে সাড়া জাগিয়ে তুলতো এমনি অপরূপ ছিল তার মন।

মা বুঝিতে পারিলেন সোফিয়া তাহার মৃত স্বামীর কথা স্মরণ করিতেছে। লক্ষ্য করিলেন, পুরাতন স্মৃতি ভাবিতে আজও আনন্দে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

আত্মমগ্নভাবে পিয়ানোর এক আধটা পর্দ্দায় মৃদু আঘাত দিতে দিতে সোফিয়া বলিতেছিল, কি শান্তি, কি তৃপ্তিই না সে আমাকে দিয়েছিল। জীবনকে অনুভব করবার কি প্রচণ্ড শক্তিই না ছিল তার। সর্ব্বদাই আনন্দে উৎফুল্ল—শিশুর মতন।

আপনার মনে মা বলিলেন—ঠিক শিশুর মতন।

—যখন আমি প্রথম তাকে এই গানটা শোনাই—তখন গান শোনার পর সে এইটে লিখে দিল—এই বলিয়া ধীরে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল—"নিরুত্তর উত্তর-দেশে মহাশূন্য এক সাগরের বুকে, পরিবর্ত্তনহীন নিস্পন্দ আকাশের ধূসর চন্দ্রাতপ তলে চির-তুহিনে-ঢাকা এক দ্বীপ আছে—জনহীন একটা পাহাড়। স্বচ্ছ নীল তুহিনের স্তর প্রাণহীন হিম-জলে অবাঞ্ছিত অতিথির মত ভাসিয়া সেই পাহাড়ের মসীকৃষ্ণ শৈল-গাত্রে নিয়ত প্রতিহত হইতেছে। সেই আঘাতের প্রতিধ্বনি মৃত্যুর মত স্থির সেই মহাশূন্যের বুকে এক সকরুণ ধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছে। অনাদি কাল ধরিয়া সেই অতল সাগরের নির্জ্জনতায় তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তীরের কাছে আসিয়া পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। ফিরিয়া যাইবার সময় তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে শুধু এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কেন?"

মা—

আবৃত্তি শেষ করিয়াই সোফিয়া সেই নিরুত্তর উত্তর-দেশে মহাশূণ্য সাগরের বুকে জনহীন দ্বীপের গান বাজাইতে আরম্ভ করিল।

বাজনা শেষ হইলে মাব দিকে ফিরিয়া সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একটু চেঁচামেচি করলুম, কিছু মনে করবেন না।

মার অন্তর তখন স্মৃতির কণ্টকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। অন্তরের চাঞ্চল্য তিনি আর গোপন কবিতে পারিতেছিলেন না।

—আমি তো বলেছিলাম আমার দিকে তোমরা চেয়ো না। মনে কোরো আমি এখানে নেই। আমি বসে বসে তোমাদের কথা শুনছি আর আমাব নিজের কথাই ভাবছি।

তারপর একে একে মা তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা শান্তভাবে তাহাদের সামনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। যে-সমস্ত অত্যাচার নিজেব জীবনে নীরবে সহিয়াছেন, যে-সমস্ত বেদনাব তিক্ততম দিন মূক হইয়া তাঁহার জীবনে মরিয়া গিয়াছে—আজ সহসা সমবেদনাব স্পর্শে তাহারা সজীব হইয়া উঠিল।

ভাই বোন দুইজনে বিস্মিত তন্ময়তার সহিত সেই নিরলঙ্কার কাহিনী শুনিল। মানুষ ছাগল-গরুকে যে ভাবে দেখে, একটী নারীর জীবন সেই ভাবে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং সে নারীকে যাহা বোঝান হইয়াছিল, সেও বিনা প্রতিবাদে তাহাই বুঝিয়া সেই রকম জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। মার সেই কাহিনী শুনিয়া তাহাদের মনে হইতেছিল যেন ঐ কাহিনীর মধ্য দিয়া লক্ষ লক্ষ অনুচ্চারিত নারী-জীবনের কথা জাগিয়া উঠিতেছে। মার কথা শেষ হইলে সোফিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

—আগে এক সময় আমার প্রায়ই মনে হতো, আমি কি অসুখী। জীবনটা মনে হতো একটা বিকার। তখন নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন

করতাম। কোনও কাজ ছিল না, নিজের কথা ছাড়া ভাববারও কিছু ছিল না। একলা বসে জীবনের সমস্ত দুঃখ মনে মনে এক যায়গায় জড় করে প্রতিদিন ওজন করে দেখতাম আর বেদনায় মন ভারী হয়ে উঠতো। কিন্তু আপনার জীবনের কথা শুনে, আজ মনে হচ্ছে আমার সেই সমস্ত দুঃখ যদি দশগুণ আরও বেশী হতো, তা হলেও আপনার জীবনের একটা মাসের তুলনা হতো না। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত ধরে বছরের পর বছর একি নির্য্যাতন! এত দুঃখ সইবার ক্ষমতাই বা কোথা থেকে পায় মানুষ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, তা জানি না, তবে সবই সয়ে যায়!

মার দিকে চাহিয়া আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, আমার গর্ব্ব ছিল যে আমি জীবনকে জানি, বুঝি। কিন্তু আজ আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি যে জীবনের কথা বলিলেন—তাকে তো আমি জানি না! যে সমস্ত মুহূর্ত্ত দিয়ে এই জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি তৈরী, এত ভয়ানক বীভৎস তারা, তা আমি ভাবতেও পারি নি।

সহানুভূতির স্পর্শে মার চিত্ত গলিয়া গেল। অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, এত দুঃখ আছে যে, বলে সব শেষ করতে পারি না!

সোফিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে চাহিল—মার মনে হইল সে দৃষ্টি যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিতেছে।

এই পরিচয়ের চারদিন পরে একদিন ভোর বেলায় মা ও সোফিয়া দুই কাঠ-কুড়োণী স্ত্রীলোকের বেশে আইভানোভিচের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কাঁধে কাঠ-কুড়োণোর থলি, হাতে লাঠী।

বিদায় দিবার সময় ভগ্নীর দিকে চাহিয়া আইভানোভিচ বলিল, তোকে এই বেশে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুই পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে এমনি ধারা ঘুরে বেড়িয়েছিস—

ক্রমে নগরের পথ ছাড়াইয়া দুইটি কাঠ-কুড়োণী গ্রামের পথে প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

মা জিজ্ঞাসা করেন, হাবে যেতে পারবি ?

হাসিয়া সোফিয়া বলে, মাগো, মনে করেন কি জীবনে এই প্রথম ?

পথ চলিতে চলিতে সোফিয়া একে একে তাহার বিপ্লবী জীবনের সমস্ত কাহিনী মাকে বলে—বিস্ময়ে মা শোনেন—কতবার নাম বদলাইতে হইয়াছে, কতবার জাল ছাড়পত্র চিঠি তৈয়ারী করিতে হইয়াছে, কত ছদ্মবেশে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে, নির্ব্বাসন হইতে বন্ধুদের পলাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, লুকাইয়া তাহাদের লইয়া নিরাপদ স্থানে পোঁছাইয়া দিতে হইয়াছে—চাকর সাজিয়া পুলিশ ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছে—এমনি সব কাহিনী। যত পথ চলেন, তত মা লক্ষ্য করেন যে ছোট্ট মেয়ের মত সোফিয়া আজ যেন নূতন করিয়া আবার এই পৃথিবীকে দেখিতেছে। পথের ধারে যাহা দেখে, তাহাতেই আনন্দে তার প্রাণ ভরিয়া উঠে।

চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া মাকে দেখাইয়া সে বলে, দেখুন দেখি, ঐ পাইন গাছটা কি সুন্দর উঠেছে, না ?

মা চাহিয়া দেখেন, অন্য সমস্ত পাইন গাছের মতই সেই গাছটা।

হঠাৎ মাথার উপর একটা পাখী ডাকিয়া উড়িয়া যায়। সোফিয়া এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয় যেন তাহার সর্ব্ব-দেহ ঐ পাখীর গানের সহিত ঐ সুদূর নীলে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনও বা পথের ধারের ঝোপ হইতে অতি সন্তর্পণে একটা বনকুসুম তুলিয়া মাকে দেখাইয়া অকারণে হাসিয়া উঠে।

মাথার উপরে বসন্ত-দিনের সূর্য্য, করুণ-কিরণে সমুজ্জল। নিস্তরঙ্গ

নীলাম্বর আলোকে মৃদু কম্পমান। দুধারে পাইন বন, অন্তহীন সুগভীর। ঈষৎ তপ্ত বন-সুরভির কোমল মৃদুল স্পর্শ চোখে মুখে আসিয়া লাগে।

মার হৃদয় দুলিয়া উঠে। সাধ যায় পাশের মেয়েটীর ঐ গাঢ় দুটী চোখ, এই বাসন্তী-মধ্যাহ্ন-উদার প্রকৃতির মত স্বচ্ছ ঐ মেয়েটীর হৃদয় যেন তাঁহাব হৃদয়ের অতি নিকটতম স্থলে টানিয়া লন। কখন পথ চলিতে চলিতে অজ্ঞাতে মা সোফিয়াব ঘাডে আসিয়া পড়েন—যদি কোনও উপায়ে সোফিয়ার সেই কুণ্ঠাহীন দীপ্ত সজীবতা তিনি আপনার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারেন!

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলেন, তুই এখনও তরুণ, এখনও কত সজীব!

সোফিয়া হাসিয়া বলে, মাগো, জানো আমার বয়স হলো কত? একেবারে বত্রিশ।

—আমি সে কথা বলছিনা। তোর মুখ দেখলে হয়ত তোকে তার চেয়েও বেশী বয়সের মনে হয়; কিন্তু তোর চোখ, তোর কণ্ঠস্বর বলে দেয় যে এই বসন্ত দিনের মতই তুই নবীন। জানি জীবন তোর অতি কঠোর দুঃখে ভরা, কিন্তু মনটী তোর এখনও হাসছে!

—বেশ বলেছ, মা! মনটী আমার এখনও হাসছে! তুমি তো মা বেশ কথা বলতে পার! কেমন সোজা, সুন্দর! কিন্তু ঐ যে বল্লে, কঠোর জীবন—মোটেই না! এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার মনে হয় না যে, যে-জীবন আমি যাপন করি তা কঠোর বা দুঃখময়; এর চেয়ে মজার জীবন আমি কল্পনা করতে পারি না।

—তোদের আমার কেন এত ভাল লাগে জানিস্? মানুষের মনে পৌঁছবার যেটা সোজা রাস্তা তোরা সবাই তা জানিস্! তোদের দেখলেই

মা—

মানুষের মনের সব দরজা আপনা থেকেই খুলে যায়—মন যেন এগিয়ে এসে ধরা দেয়। তোরা পাপকে জয় করেচিস্ তাকে একেবারে ক্ষয় কব!

সোফিয়ার কণ্ঠে চরম আত্মনির্ভবতা ফুটিয়া উঠে। সে বলে, নিশ্চয়ই হবো আমরা জয়ী। কেননা যাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য বাড়ায় তাবা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। সত্য যে একদিন জয়-যুক্ত হবেই, এই চরম বিশ্বাস আমরা তাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। তারাই হলো সকল বকম শক্তির, কি আত্মিক, কি দৈহিক, একমাত্র অফুরন্ত ভাণ্ডার। যা হয় নি, তা হবাব সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে তাদেব মধ্যে নিহিত। শুধু জাগিয়ে তুলতে হবে তাদেব চেতনাকে, তাদের আত্মাকে, শিশুর দেহে সুপ্ত মহাচৈতন্যকে।

—কিন্তু তোদের এই কাজের জন্যে কে তোদের পুরস্কার দেবে?

—পুরস্কার আমরা পেয়ে গেছি, মা। এই যে জীবন—উদার, অকুণ্ঠ, চেতনায় নিত্য প্রদীপ্ত—এই যে তার স্পর্শ পেয়েছি—এতেই আমরা পুরস্কৃত হয়ে গেছি। এর চেয়ে অন্য আব কি কাম্য থাকতে পারে?

আবার তাহারা নিঃশব্দে দুইজনে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। পথ চলিতে চলিতে মার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়িতেছিল—ছুটির দিন গ্রাম হইতে দূরে কোথায় কোন মাঠে দৈব-শক্তি-সম্পন্ন ক্রুশ আছে তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক আগ্রহে যাইতেন। আজ মার বারে বারে সেই কথাই মনে পড়িতেছিল। তিনি যেন আবার সেই দৈবশক্তিসম্পন্ন ক্রুশের জন্য তীর্থ যাত্রায় চলিয়াছেন।

সোফিয়া আপনার মনে কত অজানা সুর গাহিয়া উঠে—আকাশের সম্বন্ধে, ভালবাসার সম্বন্ধে, পুষ্পগন্ধঘন বাসন্তী দিন সম্বন্ধে, পুণ্যপীযুষদায়ী ভোল্‌গা সম্বন্ধে…………

তৃতীয় দিনের দিন তাঁহারা এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একজন কৃষককে ডাকিয়া রাইবিনের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে অদূরে দেখেন সেই আলকাতরার কারখানার একটা কাঠের টেবিলে রাইবিন, তাহার ভাই ও আরও দুইজন কৃষক আহারে বসিয়াছে।

রাইবিনকে দেখিয়াই মা দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কেমন আছ মাইকেল?

রাইবিন টেবিল হইতে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীর পাদক্ষেপে মৃদু হাস্যে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মার দিকে অগ্রসর হইল।

আর একটু অগ্রসর হইয়া নিজেকে সপ্রতিভ করিয়া লইয়া মা বলিলেন, "তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি—এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম—ভাবলুম একবার ভাইএর সঙ্গে দেখা করে যাই—এটি—এটি হলো আমার বন্ধু —নাম আন্না।

কথা কয়টী বলিয়াই মা আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গর্ব্বে সোফিয়ার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিলেন।

মৃদুহাস্যে মার দিকে অগ্রসর হইয়া গম্ভীর স্বরে রাইবিন বলিলেন, "কেমন আছেন?"

তারপর ধীরে মাথা নত করিয়া সোফিয়াকে অভিবাদন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, দেখুন, মিথ্যে কথা বলবেন না। এটা আপনাদের শহর নয়। এখানে মিথ্যে কথা বলবার কোনও প্রয়োজন নেই। এরা সবাই আমাদের লোক—খাঁটী লোক সব!

নিজের ভাই এফিম ছাড়া সেখানে আরও যে দুজন লোক ছিল তাহাদের পরিচয় দিয়া রাইবিন বলিল, এর নাম হলো ইয়াকুব, আর

মা—

এর নাম হলো ইগ্‌নেটী। এখন যাক—আপনার ছেলে কেমন আছে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, সে এখন জেলে!

—আবার জেলে! জেলই দেখছি তার ভাল লাগে! ইগনেটি মার হাত হইতে পুঁটলীগুলি নামাইয়া লইয়া একটা আসন দেখাইয়া বলিল, বসুন, মা।

সোফিয়ার দিকে চাহিয়া রাইবিন বলিল, আপনি বসবেন না?

সোফিয়া সামনের একটা গাছের কাটা গুড়ির উপর বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাইবিনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

এফিম একটা দুধের ভাঁড় লইয়া কাপে দুধ পরিবেশন করিতে লাগিল। মা তখন পাভেলের গ্রেফতার হওয়ার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সকলে স্তব্ধ হইয়া মার কথা শুনিতে লাগিল। দূরে বসিয়া সোফিয়া আড় চোখে, এই সব বিমুগ্ধ কৃষকদের লক্ষ্য করিতেছিল।

মার কথা শেষ হইলে রাইবিন জিজ্ঞাসা করিল, শুনলুম নাকি পাভেলের বিচার হবে?

হাঁ—তাই তো স্থির হয়েছে।

শাস্তির কি রকম ব্যবস্থা হবে কিছু শুনেছেন কি?

শান্ত করুণ সুরে মা বলিলেন, হয় কঠোর সশ্রম কারাবাস, নয় দীর্ঘকালের মত সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন!

মাটীর দিকে মাথা নীচু করিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে রাইবিন বলিল, আচ্ছা, যখন সে এইসব আয়োজন করছিল—তখন কি সে জানতো যে তার এই শাস্তি হতে পারে?

—তা বলতে পারি না। বোধ হয় জানতো।

সোফিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই, জানতো।

সোফিয়ার কণ্ঠস্বরে সবাই ক্ষণিকের জন্য চমকাইয়া উঠিয়া আবার তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ধীর গম্ভীর ভাবে রাইবিন বলিতে আরম্ভ করিল, আমারও মনে হয় সে জানতো। জীবন যার কাছে খেলা নয়, আগিয়ে দেখতে সে জানে। সে জানতো যে বেয়নেটের আঘাতে হয়ত আহত হতে হবে, হয়ত বা চির নির্ব্বাসনে যেতে হবে। কিন্তু তবুও সে এগিয়ে চল্লো। সে বিশ্বাস করতো যে তাকে চলতে হবে—তাই সে চলে গেল। যদি তার চলার পথে তার মা এসে শুয়ে পড়তো—তা হলে তাঁর দেহের ওপর দিয়েই সে চলে যেতো। বল, সত্যি কি না?

চারিদিকে চাহিয়া কি এক অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া মা বলিলেন, "সত্যিই, তাই?" সোফিয়া নিঃশব্দে মার মাথায় হাত রাখিল।

সহসা ইয়াকুব অগ্রসর হইয়া মাথা নাড়িয়া যেন আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "যদি এফিমের সঙ্গে আমি সৈন্য-বিভাগে চাকরী নি—তা হলে দেখছি—পাভেলের মত লোকেরও পেছনে আমাদেরই লেলিয়ে দেবে।"

গম্ভীর ভাবে রাইবিন উত্তর দিল, তা না তো মনে কোরেছ কি? আমাদের হাত দিয়ে ওরা আমাদেরই কণ্ঠ-রোধ করে রেখেছে! এইখানেই তো মজা!

তা সত্ত্বেও এফিম বলিয়া উঠিল, তবুও আমি সৈন্য-বিভাগে যোগদান করবো।

বিরক্ত হইয়া ইগ্‌নেটী বলিয়া উঠিল, যাও না, তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে? তবে একটা অনুরোধ ভাই, যদি কোন দিন তোমার বন্দুকের সামনে পড়ি, তা হলে মাথা লক্ষ্য করে মেরো—মিছেমিছি শুধু আহত করে চলে যেও না—একেবারে সাবাড় করে দিও!

—সে দেখা যাবে তখন !

সেই ছোট্ট দলটীর সকলের উপর একবাব চোখ বুলাইয়া লইয়া রাইবিন ইচ্ছা করিয়া গম্ভীর ভঙ্গীতে তাহাদেব সকলকে ডাকিয়া বলিয়া উঠিল, শোন, ছোকরার দল !

তারপর মার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, এই যে তোমাদেব সামনে দাঁড়িযে আছেন—এই বৃদ্ধা নাবী—হয়ত এতক্ষণে এঁর ছেলে সাবাড় হয়ে গিয়েছে—

সহসা সেই কথা শুনিয়া মা করুণ ব্যথিত কণ্ঠে বলিযা উঠিলেন, কেন তুমি ও কথা বলছো ?

নিষ্করুণ ভাবে রাইবিন বলিল, তার প্রয়োজন আছে ! বৃথাই তোমার মাথাব চুল শাদা হয়ে যাবে, বৃথাই তোমাব বুক চুঁয়ে রক্ত ঝরবে ? শোন ছোকরারা, যা বলছিলাম—এই নারী—নিজের ছেলেকে হারিয়েছে। কিন্তু তাতে এঁর কি হয়েছে ? আপনি বইগুলো নিয়ে এসেছেন ?

রাইবিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবাব পর মা বলিলেন, হাঁ, এনেছি ।

সামনের কাঠের টেবিলে জোর কবিয়া হাতের চাপড় দিয়া রাইবিন বলিয়া উঠিল, আপনাকে দেখেই আমি তা বুঝেছিলাম ! আমি জানি, শুধু এরই জন্যে আপনি এত দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছেন। কেমন, না ?

তারপর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া আর একবার সেই ছোট্ট দলটীর সকলের মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া রাইবিন পরমোল্লাসে বলিয়া চলিল, দেখছো, ছেলেকে তারা সরিয়ে নিলো কিন্তু মা এসে দাঁড়ালো সেই যায়গায় !

সহসা উত্তেজিত হইয়া একটা ভয়ঙ্কর শপথ করিয়া রাইবিন বলিয়া

উঠিল—তারা জানে না—অন্ধের মত চারিদিকে কিসের বীজ তারা ছড়িয়ে চলেছে। জানবে—সেদিন বুঝবে, যেদিন আমরা জাগবো,—সমস্ত আগাছা উপড়ে ফেলে সমান করে দেবো আবার সব—সেদিন তারা জানবে!

রাইবিনের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আতঙ্কে মার মন ভরিয়া উঠিতেছিল।

রাইবিন বলিয়া চলিয়াছিল,—সেদিন একজন সরকারের লোক আমাকে ধরে জিজ্ঞেস করলো—এই বদমায়েস, পুরোহিতদের সঙ্গে কি ঝগড়া করিস্? তার কথার উত্তর না দিয়ে বল্লাম, কিসে আমি বদমায়েস! নিজের মাথাব ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করি—কোন লোকের কোন অনিষ্ট করিনা—আমি বদ্‌মায়েস কিসে! রেগে চীৎকার করে উঠে লোকটা সজোরে আমার মুখে মারলো—তিন দিন হাজতে আটকে রাখলো! কিন্তু মনে কোরোনা তোমরা ক্ষমা পাবে! আমার ওপর যে অত্যাচার তোমরা করলে, তার প্রতিশোধ আমি না নিতে পারি—আমার ছেলেরা নেবে—তোমার ওপর যদি না নিতে পারে—তোমার ছেলেদের ওপর নেব! ঘেন্নার বীজ চারিদিকে ছড়িয়েছ—ভেবো না—তাতে ক্ষমার ফল ফলবে!

রাইবিন রাগে টগবগ করিতেছিল। সে বলিয়া চলিল, আর পুরুতদের সঙ্গে আমি কি নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম, জানো? গ্রামের সমস্ত লোক জড় করে তিনি বলছিলেন, তোমরা হচ্ছ মেষের দল—তোমাদের সর্ব্বদাই সেইজন্যে চাই একজন মেষপালক! আমি সেই সময় ঠাট্টা করে বলেছিলাম—কিন্তু নেকড়েকে যদি মেষপালক করা যায়—তা হলে মেষ আর একটাও পাওয়া যাবে না, কতকগুলো শিং আর খুর পড়ে থাকবে!

মা—

আমার দিকে আড়-চোখে চেয়ে তিনি আবার বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগলেন—তোমরা ধৈর্য্য ধরতে শেখো—ঈশ্বরের কাছে অবিরত প্রার্থনা করো, যেন তিনি তোমাদের ধৈর্য্য-শক্তি দেন। আমি থাকতে না পেরে বলে উঠলাম—লোকে তো প্রার্থনা করে কিন্তু ঈশ্বরের সময় কোথায়? হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে আমাকে জব্দ করবার জন্যে পুরুত মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে প্রার্থনা করো—কি প্রার্থনা করো? আমি বলেছিলাম—প্রার্থনা নিশ্চয়ই করি—আমি নিত্য প্রার্থনা করি, হে প্রভু, যারা মানুষ চবিয়ে খায়, সেই মনিবদের ইটের বোঝা বইতে শেখাও, শেখাও কেমন করে পাথর চিবিয়ে খেয়ে—

হঠাৎ থামিয়া সোফিয়ার দিকে চাহিয়া রাইবিন বলিয়া উঠিল—আপনি তো তাদের ঘরেরই মেয়ে?

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে আহত হইয়া সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে তা মনে করবার হেতু কি?

হাসিয়া রাইবিন বলিয়া উঠিল, হেতু কি? একটা মোটা ময়লা রুমাল মাথায় জড়িয়ে এসেছেন বলে আমাদের চোখে লুকিয়ে যাবেন মনে করেছেন? চটের কাপড় পরেও যদি পুরুত মশাই আসেন তা হলেও আমাদের এ চোখ ধরে ফেলতে পারে। একটা ব্যাপার ধরুণ, এই ভিজে টেবিলে কনুই রাখতে গিয়ে যেই আপনার হাতে ঠাণ্ডা লাগলো অমনি চিরদিনের অভ্যেস মত আপনি একবার চমকে উঠে ভ্রূ কোঁচকালেন। ভিজে টেবিলে যে আপনাদের হাত রাখার অভ্যেস নেই। আপনার মেরুদণ্ড এখনও সোজা রয়েছে—মজুরদের ঘরের মেয়ের মেরুদণ্ড অত সোজা থাকে না।—

রাইবিনের কথার ভঙ্গীতে মা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

সোফিয়া অপমানিত বোধ করে এই আশঙ্কায় তিনি উষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, তুমি কেন এসব কথা বলছো! সোফিয়া আমার বন্ধু। তোমাদের এই আন্দোলনে খেটে খেটে এই বয়সেই তার চুল সাদা হয়ে এসেছে—

রাইবিন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বলিল, আমি যা বলেছি—তাতে কি আপনি অপমানিত হয়েছেন—

—আমাকে তো তুমি কিছু বল নি?

সহসা কথার মোড় ফিবাইয়া রাইবিন বলিল, আমাদের এখানে আর একজন নতুন লোক এসেছে। হাঁপানিতে লোকটা বড় ভুগছে—লোকটার কিছু জানা শোনা আছে—তাকে ডেকে পাঠাবো?

সোফিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, নিশ্চয়ই!

এফিমকে ডাকিয়া রাইবিন তাহাকে সন্ধ্যা বেলা আসিবার জন্য খবর দিতে বলিল

সহসা সমস্ত কথাবার্ত্তা থামিয়া গেল। মৌমাছি আর বোলতারা অশ্রান্ত ধ্বনিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। দূরে কোথায় বনের মধ্যে একটা পাখীর ডাক কানে আসিয়া বাজিতেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর রাইবিন বলিল, যাক্, সে সব কথা, এখন আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে। আপনাদের একটু বিশ্রামও বোধ হয় দরকার! ঐ কাঠের চালের তলায় শোবার যায়গা আছে। ইয়াকুব! বেশ করে শুকনো পাতা বিছিয়ে দাও! তার আগে আপনারা বইগুলো দিন্ দেখি!

থলি খুলিয়া মা এবং সোফিয়া ধীরে ধীরে বইগুলি ঢালিতে লাগিলেন। বই দেখিয়া রাইবিন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সোফিয়ার দিকে চাহিয়া

বলিল,—এই তো, এই তো চাই! ওঃ—অনেক বই দেখছি। আপনি বুঝি এ কাজে অনেক দিন ধরে আছেন? আপনার নামটি কি?

—আনা আইভানোভনা। বারো বছর! কিন্তু কেন?

—না, এমনি জিজ্ঞেস করেছিলাম!

—তুমি কি কখনও জেলে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

কতকগুলি বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে রাইবিন দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, আমার কথাবার্ত্তায় আপনি রাগ করবেন না। জল আর আলকাৎরার মত সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে চাষীদের কখনও মেলে না।

ঈষৎ হাসিয়া সোফিয়া বলিল, আমাকে কেন মনে করছো যে, সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন মেয়ে! আমি এমনি একজন মানুষ!

—হতে পারে তা। কিন্তু আমার পক্ষে তা বিশ্বাস করা বড় কঠিন। কিন্তু শুনেছি, তাও নাকি কখন কখন হয়। জ্ঞানী লোকেরা ত বলেন, এই সব কুকুর, তারাই নাকি একদিন নেকড়ে বাঘ ছিল। তাও তো হয়! তা যাক্—এখন বইগুলো লুকিয়ে ফ্যালা যাক্—

এই বলিয়া তাহারা তিনজনে সামনের চালাঘরের ভিতরে ঢুকিল। রাইবিনের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মা মৃদুস্বরে সোফিয়াকে বলিলেন, লোকটার মনে আগুন লেগে গেছে।

তাহারা তিনজনে যেদিকে গিয়াছিল সেদিকে চাহিয়া সোফিয়া বলিল, সত্যিই তাই! ওর মতন মুখের চেহারা আর আমি কখনো দেখি নাই—আত্ম-বলিদানের মহা-সঙ্কল্প এমন স্পষ্ট কোথাও আর ফুটে উঠতে দেখি নি! চলুন, ভেতরে যাই—বড় দেখতে ইচ্ছে করে ওরা বইগুলো নিয়ে কি করে!

—মা

চালাঘরের দরজার সামনে তাঁহারা দুইজনে আসিয়া উপস্থিত হইতেই দেখেন, ঘরের ভিতর খবরের কাগজ লইয়া ইতিমধ্যেই তাহারা একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। ইগ্‌নেটী একটা কাঠের চৌকীর উপর বসিয়া—হাঁটুর উপরে খবরের কাগজ খোলা, আঙুল দিয়া অনবরত চুল টানিতেছে। পায়ের শব্দে একবার মাথা তুলিয়া তাঁহাদের দুইজনকে এক পলকে দেখিয়া লইয়া আবার তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ভাঙ্গা ছাঁদের এক ফাঁক দিয়া এক টুক্‌রা সূর্য্যের আলো ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহারই সুবিধা লইয়া রাইবিন দাঁড়াইয়াই পড়িতেছিল। পড়িবার সময় তাহার ঠোঁট দুটী কাঁপিতেছিল।

জীবনের সত্য বাণীর প্রতি লোকগুলির সেই একান্ত মর্ম্মান্তিক আকর্ষণ দেখিয়া সোফিয়ার অন্তর উল্লসিত হইয়া উঠিল। আনন্দিত-স্মিত হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল। নিঃশব্দে এককোণে বসিয়া মার কাঁধে হাত রাখিয়া সে সেই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

খবরের কাগজ হইতে মাথা না তুলিয়াই ইয়াকুব রাইবিনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, খুড়ো, এরা দেখছি আমাদের হতভাগা কৃষকদের ওপর বড় নির্দ্দয়!

রাইবিন চারিদিক একবার চাহিয়া লইয়া বলিল, তারা আমাদের ভালবাসে। যে ভালবাসে তার হাত দিয়ে কখনও অপমান আসে না, যত কঠিনতম আঘাত সে হাত করুক না কেন!

ইগ্‌নেটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাগজ হইতে মাথা তুলিল। ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি লইয়া চোখ বুঁজিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, দেখছো, এখানে কি লিখেছে—বলে কিনা, চাষীদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আর নেই—তাদের আর

মানুষ বলে ধরা চলে না। একবার একদিনের জন্যে, বাছা, আমার এই চামড়া গায়ে দিয়ে বাস করো, তখন বুঝবে পণ্ডিত, কিসে কি হয়!

সোফিয়াকে ডাকিয়া মা বলিলেন, আমার মাথাটা কেমন করছে—আমি একটু শুতে চল্লুম—তুমি যাবে না?

সোফিয়া উত্তর দিল, না

একটা কাঠের চৌকীর উপর মা শুইয়া পড়িলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সোফিয়া তেমনি নীরবে বসিয়া লোকগুলিকে দেখিতেছিল আর মাঝে মাঝে মার মুখের কাছে মৌমাছিরা ভন্ ভন্ করিয়া আসিলে তাড়াইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে রাইবিন উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

হাঁ।

সেই নিদ্রাচ্ছন্ন স্নেহার্দ্র মুখের দিকে রাইবিন অনেকক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া আপনা হইতে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল,—ছেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল্লো—বোধহয় এই প্রথম মা—এই সর্ব্বপ্রথম—

—আ

সোফিয়া এবং মাকে রাখিয়া তাহারা তিনজনে চলিয়া গেল। দূরে বনে কোথায় কে গাছ কাটিতেছিল, তাহারই প্রতিধ্বনি লতায় পাতায় ব্যাহত হইয়া সেই জীর্ণ কুটীরের দ্বারে আসিয়া পড়িতেছিল। বন-সুরভির মদিরায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া অর্দ্ধ-স্বপ্নাবিষ্ট অবসন্নতায় সোফিয়া ঘরের বাহিরে দরজার কাছে আসিয়া বসিল। দেখিল, অরণ্য গ্রাম আচ্ছন্ন করিয়া সন্ধ্যা নামিতেছে। দূরে কাহাকে স্মরণ করিয়া তাহার নীলাভ নয়ন দুটী করুণায় ভরিয়া উঠিল।

বিদায় সূর্য্যের রক্ত আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। নীড়ে ফেরা পাখীর অশ্রান্ত কলরব কখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। অন্ধকারে অরণ্য নিবিড়তর হইয়া উঠিল। অরণ্যমাতার শ্বাস-রুদ্ধ বক্ষে বৃক্ষশিশুগুলি যেন ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহারা সকলেই আবার ফিরিয়া আসিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা এবং পায়ের শব্দে মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিতেই মা বাহিরে সকলের সঙ্গে আসিয়া বসিলেন।

বাইবিনের বিকেল-বেলার রূপ এখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। উদ্বৃত্ত উত্তেজনা অবসাদের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে।

ইগনেটীকে ডাকিয়া সে বলিল, এখন একটু চা-পান করা যাক। ইগনেটী, আজকে তোমার পালা। এখানে আমরা পালা করে ঘর-সংসার করি। আজকে ইগনেটীকে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

শুকনো ডাল আর পাতা দিয়া আগুন তৈয়ারী করিতে করিতে ইগনেটী উত্তর দিল, তথাস্তু।

কিছুক্ষণ পরে ছাইএর আগুনে একটা বড় পাঁউরুটী শেঁকিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল।

সহসা এফিম বলিয়া উঠিল, শুনছো, কাশির শব্দ আসছে!

রাইবিন মাথা তুলিয়া শুনিয়া ঘাড নাড়িল। সোফিয়াকে ডাকিয়া বলিল, "সে আসছে, আমি ওকে নগর থেকে নগরে নিয়ে যাব! যেখানে সব জড় হবে, সেইখানে ওকে দিয়ে কথা বলাবো। তারা শুনুক ওর কথা। যদিও ওর বলবার মাত্র একটি কথা আছে এবং সেইটিই ও বারবার করে বলে, তবুও ওর কথা শোনাতে হবে সকলকে।"

ক্রমশঃ ছায়া নিবিড়তর হইয়া উঠিল। গোধূলির আলো রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কখন হারাইয়া গেল। সে অন্ধকারে সকল শব্দ শান্ত হইয়া আসিল। মা আর সোফিয়া নীরবে চাষীদের ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন তাহাবা কেমন ধীরে নড়াচড়া করিতেছে, এক অদ্ভুত সন্তর্পণতার সহিত। তাহারাও সমস্ত কাজের মধ্যে সেই নবাগতা নারী দুইটীর দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। তাহাদেব দুইজনের কথাবার্ত্তা একটু শুনিবার জন্য তাহারা সকলেই সজাগ হইয়া ছিল।

এমন সময় বনের মধ্য হইতে একজন দীর্ঘাকার লোক বাহিব হইয়া আসিল। মাঠ পার হইয়া ধীরে ধীরে একটা ছড়ির উপর ভর দিয়া সে তাহাদেরই দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। ক্রমশঃ তাহার নিঃশ্বাসের ভারী আওয়াজ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

ইয়াকুব বলিয়া উঠিল, এই যে সেভেলি!

কর্কশ গম্ভীর কণ্ঠে লোকটী উত্তর দিল, হাঁ আমিই! বলিয়াই সে আবার কাশিতে আরম্ভ করিল।

সোফিয়ার সঙ্গে যখন বাইবিন তাহার পরিচয় করাইয়া দিতেছিল, তখন সে আপনা হইতেই কথা পাড়িল, শুনলুম আপনারা বই-পত্র সব নিয়েই এসেছেন।

হাঁ!

—এই সব হতভাগ্য অবজ্ঞাত লেখকদের হয়ে তার জন্যে আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এরা আজও এই সব বইএর বাণী বুঝতে পারে না। আজ তাদের ধন্যবাদ আপনারা পাবেন না। তারা আজ ধন্যবাদ দিতে পারে না। তাই আমি, আমি বুঝি সত্য বাণীর মর্ম কি, তাদের হয়ে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কথা শেষ হইতে না হইতে তাহার হাঁফানি যেন বাড়িয়া উঠিল। মাংসহীন দীর্ঘ আঙুল দিয়া কোটের বোতামগুলি সে ভাল করিয়া আঁটিয়া দিল।

সোফিয়া বলিল, এত রাত্তিরে বনের মধ্যে এই ভিজে যায়গায় আপনার থাকা তো ভাল নয়।

কোনও রকমে নিঃশ্বাস লইয়া সে বলিল, জগতে আমার সমস্ত ভালো চুকে গিয়েছে—শেষ ভালোর অপেক্ষায় এখন আছি।

তাহার কথা বলার ভঙ্গীতে অন্তরে কোথা হইতে বেদনা জাগিয়া উঠে।

শুকনো কাঠের আগুন হাওয়ায় শেষবার জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের আঁচে চারিদিক যেন কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল। সেভেলি বলিয়া উঠিল, তবুও মহাপাপের সাক্ষী হয়ে আজও বেঁচে আছি। এবং আমার এই সাক্ষ্য দিয়ে আমি মানুষের কল্যাণ করে যাব। চেয়ে দেখুন আমার দিকে—আমার বয়স মাত্র আঠাশ—কিন্তু আমি

ক্ষমা—

মরতে চলেছি। দশ বছর আগে আমার এই কাঁধে আমি অনায়াসে পাঁচশো পাউণ্ড ভার তুলে নিয়ে বইতে পারতাম। তখন ভাবতাম, এমনি শক্তি নিয়ে সত্তর বছর পর্য্যন্ত এগিয়ে চলবো—কিন্তু মাত্র এই দশ বছর চলে, আজ আর চলতে পারছি না। তারা সব লুট করে নিয়েছে—আমার জীবন থেকে চল্লিশটা বছর তারা লুঠ করে নিয়েছে—

রাইবিন গম্ভীর ভাবে বলিল, এই হলো ওর একমাত্র কথা।

উত্তেজিত হইয়া সেভেলি বলিয়া উঠিল, এ আমার কথা নয়। হাজার হাজার লোকের এই কথা। তাদের সঙ্গে আমার তফাৎ শুধু এই তাদের কথা তারা শুধু তাদের মধ্যেই আটকে রেখেছে। তারা জানে না তাদের কথা দিয়ে তারা কি মহাদীক্ষা এই পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারে। উদয়াস্ত খেটে হাজারে হাজারে মানুষ আজ হীন, পঙ্গু, অথর্ব্ব, ক্ষুধার্ত্ত, ক্লান্ত হয়ে মৃত্যুর গহ্বরের মধ্যে এগিয়ে চলেছে। সে কথা চেঁচিয়ে বলতে হবে—সকলকে ডেকে চেঁচিয়ে সে কথা জানিয়ে দিতে হবে।

এফিম বলিয়া উঠিল, তা কেন? আমার দুঃখ-কষ্ট সে আমার একলার ব্যাপার। সব নিয়ে এই তো আমি বেশ আনন্দে আছি।

তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া রাইবিন বলিল, চুপ্ করো, ওকে বলতে দাও!

এফিম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, তুমিই তো বলো যে নিজের দুঃখ নিয়ে বড়াই করতে নেই!

গম্ভীরভাবে রাইবিন প্রত্যুত্তর দিল, সে আলাদা কথা। সেভেলির দুঃখ তার একার দুঃখ নয়। সে মাটির তলায় নেমে দেখেছে—সেখানে

অন্ধকারে দম আটকে আসে। তাই যতটুকু তার শক্তি আছে তাই দিয়ে সে জগৎকে সাবধান করবার জন্যে বলছে—সাবধান, এখানে তোমরা আর এসো না।

ইযাকুব একপাত্র দুধ লইয়া সেভেলিকে ডাকিল। সে-আহ্বান প্রত্যাখান করিতে ইযাকুব আগাইয়া আসিয়া ধীরে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে টেবিলের নিকট লইয়া গেল।

সোফিয়া রাইবিনকে আড়ালে ডাকিয়া অনুযোগের সুরে বলিল, আপনি কেন ওকে এই রাত্তিরে আসতে বলেছিলেন? ভয় হয়, যে-কোন মুহূর্তেই ও মারা যেতে পারে।

রাইবিন সোফিয়ার ভর্ৎসনায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, তা তো পারেই। মরতে হয়, মানুষের মধ্যে মরুক। একলা মরার চেয়ে সেটা একটু সুবিধের। ইতিমধ্যে যতক্ষণ বেঁচে থাকে—কথা বলুক! অকারণে সমস্ত জীবনটাই ও খুইয়েছে। যে টুকু আছে, সেটুকু দিয়ে যদি মানুষের কল্যাণ করে যেতে পারে তাতে ক্ষতি কি?

—আপনার দেখছি এ বিষয়ে একটা বিশেষ আনন্দ আছে!

—আনন্দ আমার নেই। আপনি যে-শ্রেণী থেকে এসেছেন তারাই এসব ব্যাপারে আনন্দ পায়—তারাই আনন্দ পেয়েছিল যখন ক্রুশে-বিদ্ধ যিশুর কাতরধ্বনি উঠেছিল। আমরা চাই একটা মানুষের কাছ থেকে কিছু শিখে নিতে এবং আপনাদেরও কিছু শেখাতে।'

টেবিলে বসিয়া তখন সেভেলি বলিতেছিল,—খাটিয়ে ওরা মানুষকে মেরে ফেলে। কিসের জন্যে, কিসের জন্যে তারা মানুষের জীবন থেকে এমনি করে তার আয়ু কেড়ে নেয়? আমি একটা কাপড়ের কলে কাজ করতুম। আমার মনিব শহরের সেরা সুন্দরীর মুখ-ধোবার টবের জন্যে

সোণার টব তৈরী করে দিলেন—তার প্রসাধনের সমস্ত জিনিস সোণার তৈরী করে দিলেন। সেই সোণার টবে আমার সমস্ত রক্ত আছে—সেই সোণার রঙে আমার সমস্ত জীবন হারিয়ে গেছে! তার বক্ষিতার মন রাখবার জন্যে সে আমাকে হত্যা করে আমারই রক্ত দিয়ে গড়িয়ে দিল সোণার টব। এই তো ব্যাপার।

এফিম মৃদু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, শুনেছি তাঁর নিজের মূর্ত্তির ছাঁচে ভগবান মানুষকে গড়েছিলেন—কিন্তু সেই ছাঁচকে ওরা কি কাজেই লাগালো। আশ্চর্য্য।

সোফিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া মা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটা যা বলছে—তাকি সব সত্যি।

সোফিয়া উচ্চকণ্ঠে স্পষ্ট ভাবে উত্তর দিল—হাঁ সবই সত্যি। খবরের কাগজে প্রায়ই এই সব খবর বেরোয়। মস্কোতে সেদিনও এরকম একটা খবর পড়েছিলাম।

রাইবিন সোফিয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া চাপা কণ্ঠে বলিল, বই এর কথার চেয়ে সেভেলির মুখের এই সব কথা আরও তীক্ষ্ণ! কারখানায় যখন কোনও মজুরের কলে হাত কাটা যায় কিংবা তাকে না খাইয়ে মারা হয় তখন লোককে বোঝান যায় যে, তারই অপরাধ। কিন্তু যেখানে মানুষের দেহ থেকে রক্ত চুষে নিয়ে মড়ার মতন তাকে ফেলে দেওয়া হয়—সে সব ক্ষেত্রে বুঝিয়ে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। হত্যা যে কোনও রকম হ'ক আমি বুঝি! কিন্তু খেলার ছলে এই নির্য্যাতন আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। শুধু নিজেদের আনন্দের জন্তে, তারা নিশ্চিন্তভাবে চলেছে মানুষকে নির্য্যাতন করে! আমরা দেবো বুকের রক্ত—সেই রক্তে তৈরী তাদের ছেলেদের

খেলনা, তাদের খেলনা, তাদের ঘোড়া, গাড়ী, বাড়ী, সোণার কাঁটা চামচে! তুমি খাটো, রাতদিন খাটো, আর আমি টাকা জমিয়ে রক্ষিতার সোণার টব কিনে দিই! চমৎকার!

মা নীরবে সমস্ত শুনিতেছিলেন, নীরবে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিলেন এবং এই সব শুনিতে শুনিতে সহসা আবার সেই অন্ধকার রাত্রির মধ্যে তাঁহার মানস-চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—অন্ধকারে উজ্জ্বল একটি রক্ত-রাঙা পথ—যে-পথ দিয়া তাঁহার পুত্র অন্য সকলের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রির আহার শেষ করিয়া তাহারা সকলে আগুনের চারিদিক ঘিরিয়া বসিল। পিছনে আকাশ ও অরণ্যানীকে আলিঙ্গন করিয়া এক মহা-অন্ধকার। সেভেলি দীর্ঘ বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া অগ্নি-কুণ্ডের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। ক্রমাগত সে কাশিতেছিল এবং প্রত্যেক কাশির সঙ্গে তাহার সর্ব্ব দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সেই কাঁপুনি দেখিয়া মনে হইতেছিল যে-টুকু জীবন দেহের অভ্যন্তরে এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাও যেন সেই শুষ্ক বিরস দেহ যষ্টিতে আর থাকিতে চাহে না—অধীর আগ্রহে বুক ছিঁড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিবার জন্য যেন ছটফট করিতেছে।

ইয়াকুব সেভেলির কাছে আসিয়া অনুনয়ের সুরে বলিল, সেভেলি এখন তোমার উচিত চালাঘরের ভিতরে গিয়ে বসা।

কথা বলিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল! তবু ও চেষ্টা করিয়া সে বলিল, কেন? ঘরের ভেতর যাবার কি দরকার? তোমাদের সঙ্গে থাকবার আমার তো আর বেশী সময় নেই! তবুও যতটুকু সময় এখনও আছে, তোমাদের সঙ্গে থাকলে ভাল থাকি। তোমাদের

দিকে চাই, আর মনে মনে ভাবি হয়ত, আমারই মত যারা লোভের আর স্বার্থের ইন্ধনে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছে, তোমরা তাদের ওপরে সেই সব অবিচারের প্রতিশোধ নেবে।

কেউ তাহাব কথায় কোনও উত্তর দিল না। সকলেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে নিজের বুকের কাছে মাথা গুঁজিয়া সে ঝিমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিযা থাকিবাব পর রাইবিন বলিয়া উঠিল, “এমনি রোজ ও আমাদেব কাছে আসে, বসে, এই একই কথা রোজ বলে। এই ক’টী কথা হলো ওব প্রাণ। এছাড়া আব কোনও জিনিস ওব মন অনুভব কবে না।”

চিন্তাকুল কণ্ঠে মা বলিলেন, এ ছাড়া আব ভাববাবই কি আছে? এক দিকে মানুষ দিনেব পব দিন খেটে বুকের রক্ত দেবে, আর এক দিকে সেই রক্ত দিয়ে লোকে নিবর্থক বিলাসিতা কববে—এই যখন জগতের ব্যাপার তখন এ রকমটী ছাড়া অন্য কি আব আশা কবতে পার তুমি?

ইগনেটী বলিযা উঠিল, কিন্তু বোজ রোজ ওব এই এক কথা শুনতে যে কি অসীম ধৈর্য্য দরকার তা কি বলবো। যে সব কথা সে বলে, সে-সব কথা একবার শুনলে কখনও ভোলা যায় না কিন্তু সেই কথাই যদি আবার রোজ রোজ কেউ শুনিয়ে দেয়—

রাইবিন রুক্ষস্বরে উত্তর দিল—কিন্তু মনে রেখো, সমস্ত কথা ঐ ক’টা কথায় জড় হয়ে আছে আব ওর কাছে ঐ কথা ক’টার দাম হলো ওর সমস্ত জীবন!

ঝিমাইয়া একবার চোখ চাহিয়া সেভেলি মাটীতে শুইয়া পড়িল। ইয়াকুব ধীরে উঠিয়া চালাঘরের ভিতর হইতে দুটী ওভারকোট আনিয়া

তাহাকে জড়াইয়া দিল। তারপর সন্তর্পণে সোফিয়ার পাশে আসিয়া বসিল।

ইন্ধন-তৃপ্ত অগ্নি-শিখা আনন্দে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার রক্ত আলোয় অন্ধকারে অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে সমবেত লোকগুলির মুখ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সোফিয়া গল্প বলিতে লাগিল। জগতের সকল দেশের মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনী—প্রাচীনকালে জার্ম্মাণ কৃষকদের আত্মোন্নতির জন্য সংগ্রামের কাহিনী, আইরিশ শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কথা, ফ্রান্সে মজুরদের কীর্ত্তির কাহিনী—

রাত্রির অন্ধকার-চেলাঞ্চলে আবৃত বনানীর ধারে, সেই লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র মাঠে, নৃত্যপর অগ্নিশিখার রক্ত আলোয়, যে সমস্ত ঘটনা একদিন জগৎকে দোলা দিয়া বিস্মৃতির গহ্বরে গিয়েছে তাহারা যেন আবার সে রাত্রিতে নব-জীবন লাভ করিল। একটার পর একটা রণশ্রান্ত মুমূর্ষু জাতি সেই রক্ত আলোয় ক্ষণিকের জন্য নব-জীবন লাভ করিয়া আবার রাত্রির নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল।

শ্রোতারা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে শুনিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের মনে আশা এবং বিশ্বাস জাগিয়া উঠিতেছিল। সোফিয়ার নীলাভ নয়নের শব্দহীন হাসির স্পর্শে তাহাদের ও অন্তর ক্ষণে ক্ষণে হাসিয়া উঠিতেছিল। আজ তাহাদের সম্মুখে জগতের সকল জাতির সকল লোকের মুক্তি-সংগ্রামের ব্যাপার এক নূতনতর পবিত্র এবং স্পষ্ট সংজ্ঞা লাভ করিল। দূরে অন্ধকারের যবনিকার পটে তাহারা দেখিল, মুক্তি-সংগ্রামের যোদ্ধাদের ভাব ও ভাবনা সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহাদের কথা শুনিতে শুনিতে মনে মনে কখন তাহারা নিজেদের সেই সমস্ত অতীতের নামহীন মহাযোদ্ধাদের সহিত এক পরিবারভুক্ত মনে করিয়া

লইয়াছিল। যাঁহারা বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার অর্জ্জনেব জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, অবশেষে নিজেদের রক্তে পৃথিবীকে রঞ্জিত কবিয়া দিযা চলিযা গিয়াছে—সেই বক্ত-আহুতি লইয়া পরবর্ত্তী মানুষ নব জীবনের মন্দিরে অর্ঘ্য দিষাছে।

সোফিয়াব আত্ম-প্রত্যয-বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, শিগ্‌গিব সেদিন আসছে যেদিন জগতেব সকল দেশেব মজুবরা মাথা তুলে দাঁড়াবে, স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করবে—যথেষ্ট হয়েছে, এরকম জীবন যাপন কবতে আমরা আর চাই না। যাবা লোভে অন্ধ হযে মানুষকে মেবে ফেলে নিজেদের ক্ষমতাব ভেল্কী তৈরী কবেছে সেইদিনই তাদেব সিংহাসন টলে উঠবে, পায়ের তলা থেকে সেইদিনই তাদেব মাটী সবে যাবে!

নিস্পন্দ হইযা নীববে তাহাবা সোফিয়াব কথা শুনিতেছিল। যে সূত্রের সঙ্গে আজ রাত্রে তাহাবা জগতেব সঙ্গে বাঁধা পডিয়াছে, কোনও রকমে সে সূত্রটীকে ছিন্ন করিতে তাহাদের মন চাহিতেছিল না। একান্ত সন্তর্পণে মাঝে মাঝে কেহ শুধু আগুনে দুই একটী করিয়া শুকনা কাঠ দিতেছিল।

একবার শুধু ইয়াকুব বলিয়া উঠিয়াছিল, একটু দাঁড়ান।

ছুটিয়া চালাঘরের ভিতরে গিয়া একটা চাদব লইয়া আসিয়া মা এবং সোফিয়ার পিঠ এবং পা ঢাকিয়া দিল।

ভোর বেলা, রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল তখন, পরিশ্রান্ত হইয়া সোফিয়া নীরব হইল। তাহাকে ডাকিয়া মা বলিল, এখন, চল, আমরা বিদায় হই!

ক্লান্ত সুরে সোফিয়া উত্তর দিল, হাঁ, যাত্রা করবার এই সময়।

কাহার যেন একটা দীর্ঘশ্বাস উষা বাতাসকে উষ্ণ করিয়া তুলিল।

—মা

অনভ্যস্ত মৃদু কণ্ঠস্বরে রাইবিন বলিল, সত্যিই, আপনাদের যেতে হবে, না?

রাইবিনের গায়ে মাত্র একটী সার্ট ছিল, তাহারও আবার গলার বোতাম ছিল না। চলিয়া যাইবার সময় তাহার সেই বিপুল দেহটীকে স্নেহ-দৃষ্টি দিয়া আলিঙ্গন করিয়া মা বলিলেন, এখন যে বড ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে একটু কিছু দাও না!

রাইবিন উত্তর দিল, আমার ভেতরে আগুন জলছে—বাইরের ঠাণ্ডা লাগে না!

যাত্রার সময় সন্নিকট হইলে রাইবিন সোফিযার হাত দুটী জোরে চাপিযা ধরিযা বলিল, শহরে গিযে আপনাব দেখা কি করে পাবো!

তাহার উত্তরে মা বলিলেন, আমার ওখানে খবব দিলেই ওঁর খবর পাবে। তাহলে আসি!

হঠাৎ ইয়াকুব বলিয়া উঠিল, যাবার সময় একটু গরম দুধ খেয়ে গেলে হয়ত ভাল হতো!

এফিম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দুধ কি আর আছে?

ইগনেটী একটু যেন বিপন্ন হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, যেটুকু ছিল, আমি অসাবধানে ফেলে দিয়েছি—

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তারপর বিদায় দিবার জন্য তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়া মৃদুস্বরে সকলে এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, বিদায়!

বহু দূর পর্য্যন্ত সেই মিলিত কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি সেই দুইজন নারীর পায়ে পায়ে জড়াইয়া চলিল।

মা—

মার জীবনের ধারা সহসা এত শান্ত এবং নিরুদ্বেগ হইয়া উঠিল যে মাঝে মাঝে তাহাতে তিনিই বিস্মিত হইয়া উঠিতেন্। গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াই কিছুদিনের জন্য সোফিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল আবার পাঁচদিন পরে আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া উপস্থিত। তারপর আবার কয়েক ঘণ্টার পরে কোথায় চলিয়া গেল, দু সপ্তাহ আর আসিল না।

আইভানোভিচ সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত। ঘড়ি ধরিয়া তাহার জীবনের ধারা প্রতিদিন একমাত্রায় প্রবাহিত হয়। সকাল আটটার সময় উঠিয়া সে চা পান করে, তারপর খবরের কাগজ পড়িয়া মাকে শোনায়। শাসন পরিষদে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরা যে সমস্ত বক্তৃতা দিত তাহার মর্ম্ম কোনও রকম বিকৃত না করিয়া মাকে বুঝাইয়া দেয়। তারপর ঠিক ন'টা বাজিতেই সে নিজের আফিসের কাজে চলিয়া যায়।

ঘরদোর পরিষ্কার করিয়া মা রান্নাঘরে ঢুকেন। দ্বিপ্রহরের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া স্নান-অন্তে পরিষ্কার একটা পোষাক পরিয়া ঘরের আলমারীতে থাকে-থাকে সাজানো বইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখেন। এখন তিনি পড়িতে শিখিয়াছেন বটে কিন্তু বানান করিয়া পড়িতে পড়িতে তিনি এত বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন যে, যাহা উচ্চারণ করেন, তাহার অর্থ সংগ্রহ করিতে আর পারেন না। কিন্তু ছবি বা ছবির বই তাঁহার পরম বিস্ময়ের জিনিষ ছিল। সেই সমস্ত ছবির বই তাঁহার বিমুগ্ধ চোখের সম্মুখে এক নূতন জগতের বাস্তব রূপ ফুটাইয়া তুলিত—সুন্দর নগরী, অপরূপ উদ্যান, সুন্দরতর সব ঘর, অপূর্ব্ব তাহাদের সজ্জা, সুন্দর বলিষ্ঠ নর-নারী, সমুদ্র, জাহাজ, অট্টালিকা, স্মৃতিস্তম্ভ, মানুষের ঐশ্বর্য্যের নিত্য নব-নব বিকাশ। প্রতিদিন সেই সব ছবির বই দেখেন, আর

তাঁহার চোখের সম্মুখে পৃথিবীর সীমা-রেখা যেন আরও আরও দূরে সরিয়া যায়। প্রতিদিন পৃথিবী মার কাছে সুন্দরতর বৃহত্তর হইয়া উঠে। বহুদিন-বঞ্চিত এই বুভুক্ষিত নারীর আত্মা ধরণীর রূপ-রস-ঐশ্বর্য্যের বিশালতার সম্ভাবনায় নিত্য স্পন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাণী-তত্ত্বের ম্যাপগুলি মার বিশেষ ভাল লাগিত। নানাদেশের সেই সমস্ত বিচিত্র চিত্র হইতে এই পৃথিবীর রূপ, ঐশ্বর্য্য এবং বিশালতার কথা মা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একদিন আহারের সময় মা আপনা হইতে বলিয়া উঠিলেন, কত বড় এই পৃথিবী!

আইভানোভিচ হাসিয়া বলিল, তবুও জায়গার অভাবে ঘাড়ের পরে ঘাড়ে মানুষকে বাস করতে বাধ্য করায় ওরা!

আবেগে উদ্বেলিত হইয়া মা বলেন, কি রূপ, আইভানোভিচ! অথই রূপের সাগরের মধ্যে আমরা বাস করি কিন্তু আমাদের চোখ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে কে! কোথা দিয়ে কি চলে যায়, কখন যায় আমরা জানতেও পারি না। অন্ধের মত লোকে শুধু ঘুরেই মরে, আনন্দ পাবার শক্তিটুকুও তারা হারিয়ে ফেলেছে, সে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত ঘুচে গেছে। যদি তারা জানতো, যদি তারা সত্যিই বুঝতো এই পৃথিবী কত সুন্দর, কত তার ঐশ্বর্য্য কত আশ্চর্য্য জিনিস আছে এই পৃথিবীতে, তাহলে এমন করে মন-প্রাণ তাদের শুকিয়ে উঠতো না!

সন্ধ্যাবেলায় অনেক লোক আসিত। আলেক্‌সি, পেট্রোভিচ, আইভান। ইয়াগর বলিয়া একজন অতি রুগ্ন অসুস্থ লোক প্রায়ই আসিত। নিজের কাল-ব্যাধি লইয়া সর্ব্বদাই সে ব্যঙ্গ করিত, হাসিত। মাঝে মাঝে দূর দূরান্তরের শহর হইতেও দেখা-শোনা করিবার জন্য লোক আসিত।

তাহারা কথাবার্ত্তা বলিত। মা নীরবে তাহাদের চা পরিবেশন করিতে করিতে শুনিতেন, কুলীদের জীবন সম্বন্ধে তাহারা কত কি বলিতেছে। তাহাদের কথা শুনিয়া মা মনে মনে বুঝিতেন, কুলীদের জীবন সম্বন্ধে ইহারা কতটুকু জানে! তাহারা যে দায়িত্ব লইতে চলিয়াছে, তাহার গুরুত্ব যে কতখানি তাহা তাহাদের অপেক্ষা মা বেশী বুঝিতেন!

মাঝে মাঝে শাশাঙ্কাও আসিত। বেশীক্ষণ থাকিত না—কাজের কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা বলিত না। ভুলিয়াও হাসিত না। প্রত্যেকবার বিদায় লইবার সময় মার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, পাভেল কেমন আছে?

মা বলিতেন, ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে ভালই আছে!

—দেখা হলে আমার অভিবাদন জানাবেন—বলিয়াই সে চলিয়া যাইত।

কোন কোনবার শাশাঙ্কা আসিলে মা আপনা হইতেই পাভেলের কথা তুলিতেন। দুঃখ করিয়া বলিতেন, এতদিন ধরে হাজতে রয়েছে, এখনও বিচারের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হলো না!

দেখিতেন শাশাঙ্কার গম্ভীর মুখ বেদনায় বিবর্ণ হইয়া আসিত। তবুও সে কোন কথা বলিত না। নীরবে আঙুলগুলি নিষ্পেষণ করিত। এক একবার মার মনে হইত যে তিনি বলিয়া ফেলেন, দুষ্টু মেয়ে, জানিরে সব জানি! জানি তুই তাকে কতখানি ভালবাসিস! কিন্তু শাশাঙ্কার সেই গম্ভীর মুখ, সেই নীরবতা, সেই চেষ্টা-করিয়া বাজে-কথা না-বলার ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া মা অন্তরের কথা তাহার সম্মুখে উত্থাপন করিতে পারিতেন না। শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহার হাত দুইটী বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন, অভাগী কোথাকার!

মাঝখানে একদিন নাটাশাও আসিয়াছিল। মাকে দেখিয়া তাহার আনন্দ আর ধরে না। নানা কথার মধ্যে সে জানাইল যে তাহার মা মরিয়া গিয়াছে।

—মার জন্যে দুঃখু হয়। তবে আর একদিক দিয়ে যখন ভাবি যে সে যে-জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, মৃত্যু ঢের তার চেয়ে শান্তিময় তখন আর দুঃখু করি না। ভালোর জন্যে মানুষ আশা করে বেঁচে থাকে, কিন্তু পায় শুধু অপমান।

তাহার কাঁধে সস্নেহে হাত রাখিয়া মা বলেন, তা'হলে তুই এখন একেবারে একা!

অন্যমনস্কভাবে নাটাশা বলে, একেবারে একা!

নাটাশা এখন যে-শহরে স্কুল-মাষ্টারী করে, মাকে মাঝে মাঝে সেই শহরে যাইতে হইত। সেখানে একটা কাপড়ের কল আছে। সেই কলে নিষিদ্ধ বই, খবরের কাগজ বিলি করিবার জন্য তাঁহাকে যাইতে হইত। নিষিদ্ধ লেখা পত্র বিলি করাই মার একমাত্র কাজ হইয়া উঠিয়াছিল। মাসের মধ্যে প্রায়ই হয় পুরোহিত-রমণীর বেশে, নয় ফিরিওয়ালীর পোষাকে, নয় তীর্থ-যাত্রীরূপে বা কোনও বড়লোকের বিধবা পত্নীর সাজে কখনও হাঁটিয়া, কখনও গাড়ী করিয়া শহরে শহরে ঘুরিতে হইত। ট্রেণে, ষ্টীমারে, হোটেলে সর্ব্বত্র অতি স্বচ্ছন্দ ভাবে বিচরণ করিতেন এবং তাহার স্বাভাবিক সরলতার ভঙ্গীতে নূতন লোক সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতো।

অজানা লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে তাঁহার ভাল লাগিত। একান্ত সহানুভূতির সহিত তাহাদের অন্তরের অভিযোগ, বিপদ-আপদের কথা শুনিতেন। যদি কাহার মনে দেখিতেন জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট তিক্ততা

জাগিয়াছে, যদি দেখিতেন কাহারও বিমুগ্ধ অন্তর ব্যাকুল প্রশ্নে সংক্ষুব্ধ অমনি তাঁহার অন্তর এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিত। চারিদিকে তিনি দেখিতেন, শুধু উদর-পূরণের জঘন্য উন্মাদ প্রচেষ্টায় নির্লজ্জের মত প্রকাশ্যভাবে মানুষ মানুষকে বঞ্চনা করিতেছে, তাহাকে নিঙড়াইয়া সমস্ত রস বাহির করিয়া লইতেছে। বিশাল এই ধরণী, বিপুল তাহার ঐশ্বর্য্য, তবুও লোক নিরন্তর অভাবে বিমূঢ়। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে বসিয়া মানুষ অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিতেছে। নগরে নগরে ঈশ্বরের উপাসনার মন্দির তৈয়ারী হইয়াছে—স্বর্ণে আর রৌপ্যে বেদী পরিপূর্ণ, আর সেই সব মন্দিরের দ্বারে দ্বারে নিরন্ন বস্ত্রহীন ভিখারীর দল শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘুরিয়া মরিতেছে—যদি কেহ হাতে এক টুকরা তামা দিয়া যায়। স্বর্ণ-রৌপ্যে ভরা এই সমস্ত গির্জ্জা, সোণার-সূতায় কারুকরা পুরোহিতের পোষাক, গির্জ্জার দ্বারে বস্ত্রহীন এই সব ভিখারীদের ভিড—এই সমস্তই তিনি পূর্ব্বেও দেখিয়াছেন, কিন্তু তখন মনে হইত—এই স্বাভাবিক জীবনের ধারা। কিন্তু আজ তিনি বুঝিয়াছেন এই বৈষম্যের মিল কোথাও নাই। যাহাদের জন্য গির্জ্জার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, তাহারাই রহিল গির্জ্জার বাহিরে দাঁড়াইয়া, ভিক্ষুকের বেশে।

যিশুখৃষ্টের গল্প শুনিয়া এবং ছবি দেখিয়া মা বুঝিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু—অতি সাধারণ ছিল তাঁহার অঙ্গের আবরণ। যাহার কাছে নিখিলের আর্ত্ত দরিদ্র লোক আসিবে সান্ত্বনার জন্য, গির্জ্জায় গির্জ্জায় তাঁহারই মূর্ত্তি কিনা সোণার "পেরেকে" ক্রুশে বিদ্ধ? স্বর্ণের একি অসহ্য ঔদ্ধত্য। রাইবিনের কথা মার মনে পড়িত। সে বলিয়াছিল, আমাদের মেরে ফেলবার জন্যে, তারা ভগবানকেও বিকৃত

করেছে। ক্ষেতে পাখীদের ভয় দেখাবার জন্যে যেমন চাষীরা একটা নকল ন্যাকড়ার মানুষ টাঙিয়ে রাখে, তেমনি ওরা আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধির বদলে গির্জেয় একটা নকল ভগবান টাঙিয়ে রেখেছে।—

এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে কখন অজ্ঞাতে মা তাঁহার প্রাত্যহিক প্রার্থনা কমাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে অহরহ যিশু এবং তাঁহারই আলোকে যাঁহারা কলরবহীন জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা প্রায়ই ভাবিতেন। বাহিরে যাহা কিছু শোনেন, যাহা কিছু দেখেন, অন্তরের সেই নব-জাগ্রত অপূর্ব্ব অনুভূতির সঙ্গে তাহা মিলাইয়া দেখেন। এবং এই চিন্তাধারাই এক অপরূপ প্রার্থনার রূপে তাঁহার অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত, মনে হইত যেন তাহারই মধ্যে সমস্ত অন্ধকার জগৎ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই মনে হইতে লাগিল যে এতদিন পরে আজ তিনি যেন সত্যই তাঁহার অন্তরের নিকটে আসিয়াছেন। স্পষ্ট তাহাকে দেখা যাইতেছে—জনতার উর্দ্ধে আনন্দ-বিভাসিত আননে ক্রুশে দাঁড়াইয়া আছেন। নয়নে কি অমৃত-সান্ত্বনা—তাঁহারই ক্ষুব্ধ মাতৃ-হৃদয়ের দিকে চাহিয়া আছেন। কি আশ্বাস প্রসারিত-করে! যুগে যুগে তাঁহার নামে যে তপ্ত-রক্ত-অর্ঘ্য উৎসর্গ করা হইয়াছে, তাহারই স্পর্শে নব-জীবন লাভ করিয়া আজ সত্যই যেন তাঁহার নব-আবির্ভাব!

আইভানোভিচ ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যহ ঠিক নিয়মিত সময় রাত্রে বাড়ী

ফিরিত। একদিন তাহার ফিরিতে দেরী হইল। যে সময় ফিরিবার কথা তাহার অনেক পরে ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া মাকে ডাকিয়া বলিল, শুনেছেন, আজকে জেলে ভীষণ গণ্ডগোল হয়েছে! গণ্ড-গোলের সময় কে এক জন আসামী জেল থেকে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কে যে পালালো—এখনও পর্য্যন্ত সে খবব পাই নি!

উত্তেজনায় মার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল। একটা চেয়াবে বসিয়া পড়িয়া কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবিলেন, পাভেল নয় তো?

হতেও পারে। কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে যে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে তো? সারাক্ষণ সেইজন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—যদি দেখতে পাই! অবশ্য এরকম করে খোঁজা বোকামী বই আর কিছুই নয—তবুও একটা কিছু করতে হবে তো! আমাকে এখনই বেরুতে হবে আবার—

মা বলিয়া উঠিলেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাব!

বাধা দিয়া আইভানোভিচ বলিল, তার চেযে বরঞ্চ আপনি আর এক কাজ করুন—আপনি এখুনি ইয়াগরের কাছে যান—সে যদি কোন খবর পেযে থাকে!

পুত্রকে দেখিবার গোপন আশায় কালবিলম্ব না করিয়া মাথায় একটা বড় রুমাল জড়াইয়া লইয়া রাজ-পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। এত দ্রুত বুকের মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল যে, তিনি চলিতে পারিতেছিলেন না। চোখের সামনে ক্রমশঃ যেন সব ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল।

ইয়াগরের বাড়ীর সিঁড়ির কাছে আসিয়া তিনি এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে একটু অপেক্ষা করিতে হইল। পিছন ফিরিয়া চাহিতেই

তিনি সহসা চাপা গলায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চক্ষু বুঁজিলেন। তাঁহার মনে হইল, নিকোলে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। চোখ চাহিয়া দেখিতেই আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

ছুটিয়া বাহির হইতেই দেখেন অদূরে সত্যই নিকোলে দাঁড়াইয়া! মুখে সেই বসন্তের দাগ! তাহলে পাভেল নয়, নিকোলে! এই নূতন নৈরাশ্যে বহুদিনের ভুলিয়া-যাওয়া অন্তর-পোড়ানি অগ্নি-শিখা সহসা মার বুকে জ্বলিয়া উঠিল!

চাপা গলায় ডাকিলেন, নিকোলে, নিকোলে?

হাত নাড়িয়া নিকোলে তেমনি চাপা গলায় উত্তর দিল, আপনি এগিয়ে যান!

ইয়াগরের ঘরে ঢুকিয়া মা দেখেন রোগপাংশু মুখে ইয়াগর বিছানায় শুইয়া আছে। নড়িতে পারিতেছে না। চুপি চুপি তাহার কাণের কাছে গিয়া বলিলেন, নিকোলে জেল থেকে পালিয়ে এখানে আসছে!

ইয়াগর তেমনি শুইয়া উত্তর দিল, চমৎকার! এগিয়ে গিয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা করবার শক্তি আমার আর নেই!

বলিতে না বলিতেই দরজা খুলিয়া নিকোলে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মাথা হইতে টুপী খুলিয়া হাসিতে হাসিতে ইয়াগরের বিছানার দিকে অগ্রসর হইল।

কুনুইয়ের উপর ভর দিয়া ইয়াগর বলিল, আসতে আজ্ঞা হয়, মহাপ্রভু!

মার দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া নিকোলে বলিল,

আপনার সঙ্গে যদি দেখা না হতো তাহলে আবার আমাকে জেলেই ফিরে যেতে হতো। এখানে কে আছে না আছে আমি কিছুই জানি না! আর কিছুক্ষণ বাইরে থাকলেই ধরা পড়তাম—আবার যেতে হতো জেলে। জেল থেকে বেরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম কি বোকা আমি—কেন জেল থেকে পালিয়ে এলাম? এমন সময় দেখি আপনি হন্‌হন্‌ করে চলেছেন—আমিও আপনার পিছু পিছু চলতে সুরু করলাম!

—কিন্তু কেমন করে জেল থেকে পালালে?

—আমি নিজেই জানি না কেমন করে! হঠাৎ ঘটে গেল। জেলের মধ্যে বিকেল বেলা ছাড়া পেয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি জেলের ওভারসিয়ারকে ধরে কয়েদীরা প্রচুর প্রহার লাগাচ্ছে। দেখতে দেখতে চারদিকে একটা হট্টগোল পড়ে গেল। আমি ঘুরতে ঘুরতে দেখি জেলের দরজা খোলা। পাহারায় যারা ছিল তারা তাড়াতাড়ি সব ভেতরে চলে এসেছে। বেশ ধীরে সুস্থে ফটকের কাছে গেলাম, ফটকের বাইরে এলাম। কেউ কিছু বল্লে না। কিছুদূর এগিয়ে নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম—এখন যাই কোথা? পিছন ফিরে জেলের দিকে চাইলাম—দেখি দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিরকম অশোয়াস্তি বোধ হতে লাগলো। বন্ধুদের ফেলে রেখে এরকম করে চলে আসা আমার উচিত হয় নি—এ যে কি একটা বোকার মত কাজ হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না!

ইয়াগর তাহার স্বাভাবিক বিদ্রুপের ভঙ্গীতে বলিল, হুজুরের উচিত ছিল ফিরে গিয়ে ভদ্রভাবে জেলের দরজার কড়া নাড়া দেওয়া! দরজা খুলে বলা—ধর্ম্মাবতার ক্ষমা করবেন—ক্ষণিকের লোভ হয়েছিল—

আবার ফিরে এসেছি! যাক্, সে সব কথা এখন! এখন দরকার হচ্ছে তোমার লুকিয়ে থাকা। কিন্তু আমি যে উঠতে পারছি না—

নিকোলে ইয়াগরের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, তুমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছ, ইয়াগর!

মা সেই ছোট্ট ঘরটার চারদিকে উদাস-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন।

দুই হাত দিয়া বুক চাপিয়া ইয়াগর বলিয়া উঠিল, অসুস্থ হওয়া না হওয়া সে আমার ব্যাপার। তোমার তাতে মাথা ঘামাতে হবে না। মাগো, আপনি পাভেলের কথা ওকে জিজ্ঞাসা করুন। চেষ্টা করে উদাসীন হবার কি দরকার?

মার জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই নিকোলে বলিতে লাগিল, পাভেল বেশ ভালই আছে। শরীর তার বেশ সুস্থ এবং সবল আছে। আমাদের হয়ে অফিসারদের সঙ্গে সেই কথাবার্ত্তা বলে। সেখানেও এমনি প্রতিপত্তি করে নিয়েছে যে, জেলে বসেও হুকুম চালায়।

ইয়াগরের ফুলিয়া-উঠা বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মা নিকোলের কথা শুনিতেছিলেন।

এদিক ওদিক চাহিয়া হঠাৎ নিকোলে বলিয়া উঠিল, দেখো, ভয়ানক খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দিতে পার?

"মাগো, দেখো তো সেলফের ওপর পাউরুটী আছে। ওটা সব ওকে দাও! তারপর বারাণ্ডায় গিয়ে বাঁ হাতে দ্বিতীয় দরজা যেটা পাবে—সেখানে গিয়ে কড়া নাড়া দেবে। একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে আসবে। তাকে বলবে—ঘরে খাবার যা কিছু জিনিষ আছে সমস্ত নিয়ে এখুনি এই ঘরে চলে আসতে।"

নিকোলে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, আহা, সব কেন?

"উত্তেজিত হয়ো না বন্ধু! যদি সে সবও আনে—তাহলে তা খুব বেশী হবে না! আর হয়ত তার ঘরে কিছুই নেই!

বারাণ্ডায় গিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরে মা কড়া নাড়িতেই দরজার ভিতর হইতে কিছুক্ষণ পরে নারী-কণ্ঠে একজন জিজ্ঞাসা করিল, কে?

চুপি চুপি মা বলিলেন, আমি ইয়াগরের কাছ থেকে আসছি!

কিছুক্ষণ পরে একজন দীর্ঘাকৃতি স্ত্রীলোক ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই আপনার?

—আমি ইয়াগরের কাছ থেকে আসছি—সে আপনাকে এক্ষুণি তার ঘরে যেতে বল্লে।

আর একটু অগ্রসর হইতে নারীটী বলিয়া উঠিল, ওঃ, আপনি! অন্ধকারে বুঝতে পারি নি! ইয়াগরের কি অসুখ বেড়েছে?

—বোধ হয়! সে কিছু খাবার নিয়ে যেতে বলেছিল—

—সে তো এখন কিছুই খায় না—খাবার কি হবে? বলিতে বলিতে তাহারা দুইজনে ইয়াগরের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বিছানার কাছে আসিতেই ইয়াগব বলিয়া উঠিল, বন্ধু, পিতৃপুরুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্যে তো আমি চল্লুম। আমাব এই বন্ধুটী জেলের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে চলে এসেছেন। এখন প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে—এঁর ক্ষিদে পেয়েছে—তার ব্যবস্থা কর! তারপর এঁকে দু' একদিনের জন্যে লুকিয়ে রাখ!

ঘাড় নাড়িয়া তাহার জবাব দিয়া নারীটী রুগ্ন ব্যক্তির মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! গম্ভীর ভৎ'সনার স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমার বকবকানি থামাও, ইয়াগর! তুমি জানো, বেশী কথা বলার তোমার কাছে কি মানে? ওঁরা যখন এলেন, তখনই আমাকে ডাকিয়ে

পাঠান তোমার উচিত ছিল। দেখছি, ওষুধও খাওয়া হয় নি! আপনারা আমার ঘরে চলুন! এখনি হাসপাতাল থেকে লোক আসবে—ওকে নিয়ে যাবার জন্যে।

মুখ বিকৃত করিয়া ইয়াগর বলিয়া উঠিল, তাহলে, অবশেষে হাসপাতালেই যাচ্ছি?

—আমিও সেখানে যাব তোমার সঙ্গে!

—সেখানেও যাবে?

—চুপ্ করো!

কোনও কথা না বলিয়া ইয়াগরের গায়ের কম্বল খানি ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া ওষুধের শিশিটি তুলিয়া লইয়া কতখানি ওষুধ খাওয়া হইয়াছে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তারপর নিকোলেকে ডাকিয়া যাইবার সময় মাকে বলিয়া গেল, আপনি একটু থাকুন! আমরা এখন যাচ্ছি। আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি। আপনি ইত্যবসরে একদাগ ওষুধ ওকে খাওয়ান।

দরজার কাছে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আর দেখুন, ওকে একদম কথা বলতে দেবেন না!

তাহারা চলিয়া যাইলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ইয়াগর বলিয়া উঠিল, অপূর্ব্ব নারী! আপনি এর সঙ্গে মিশে কাজ করে দেখবেন—কি পরিশ্রমই না করতে পারে! আমাদের সমস্ত ছাপার কাজ এই মেয়ে একা সব করে!

—কথা বলো না। বারণ করে গেলো। এই ওষুধটা খেয়ে নাও—

ওষুধ গলাধঃকরণ করিয়া একটা চোখ বুঁজিয়া সে বলিল, কথা বলি আর নাই বলি, আমি যে মরবো, সেটা সুনিশ্চিত!

মা—

তাহার সেই বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিতে করুণায় মার চোখে জল ভরিয়া আসিতেছিল।

—দুঃখ করো না মা! এই-ই নিয়ম! জীবন ভোগ করবার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই মরবার দায়িত্ব নিয়েই আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি!

তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া মা বলিলেন,—না, তুমি বেশী কথা বলো না!

—চুপ করে থাকার কোন মানে হয় না। চুপ করে থেকে আমার কি লাভ হবে? বাড়তি আর কয়েক সেকেণ্ড এই সব যন্ত্রণা ভোগ—এই তো? তার জন্যে আমি একজন সত্যিকারের মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলার আনন্দটুকু হারাচ্ছি! আমার বিশ্বাস এই পৃথিবী ছেড়ে যেখানে যাব সেখানে এখানকার মত মানুষের সঙ্গে আর কথা বলতে পারবো না।

ক্রমশঃ তাহার কথা বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া মা বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এখনি মেয়েটা এসে আমাকে ধমকাবে—তুমি চুপ কর।

—সে তোমাকে ধমকাবেই মা! কাউকে না ধমকিয়ে সে একদণ্ড থাকতে পারে না!

কিছুক্ষণ পরে সুভমিলা ফিরিয়া আসিল। মার কাছে আসিয়া বলিল, বন্ধুটীকে কিছু নতুন কাপড় চোপড় এক্ষুণি কিনে এনে দিতে হবে। এ যায়গায় বেশীক্ষণ থাকা ওর পক্ষে নিরাপদ নয়। আপনি

যান, এক্ষুণি যাহোক একটা পোষাক কিনে আসুন। সোফিয়াটা এই সময় থাকলে বড় সুবিধে হতো। লোক লুকোতে ও ওস্তাদ!

ইয়াগরেব দিকে চাহিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসপাতালে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি তো?

লুডমিলা বলিল, বেশ তো; আমরা দুজনে পালা করে হাসপাতালে যাব! আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন। পথে গুপ্তচরদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।

মা যাইতে যাইতে গোপন-গর্ব্বে বলিলেন, সে আমি জানি!

কিছুক্ষণ পরে মা পোষাক কিনিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শহরের সীমানা পর্য্যন্ত নিকোলেকে আগাইয়া দিবার ভার মার উপর পড়িল।

নিকোলেকে পৌছাইয়া দিয়া মা যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন তখন শাশাঙ্কার সহিত পথে দেখা। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিতেই আইভানোভিচ বলিল, আমি ইয়াগরদের ওখানে গিয়েছিলাম। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। অবস্থা খুবই খারাপ। লুডমিলা তোমাকে এক্ষুণি হাসপাতালে যেতে বলেছে। নিকোলেকে নির্ব্বিঘ্নে পৌছে দিয়ে এলে তো?

সারাদিনের ক্লান্তিতে মার মাথা ঘুরিতেছিল। যাইবার সময় মার হাতে একটা বাণ্ডিল দিয়া আইভানোভিচ বলিল, এটা সঙ্গে নিয়ে যান —দরকার আছে।

জামা কাপড় বদলাইয়া মা হাসপাতালে গিয়া উঠিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, বালিস ঠেস্ দিয়া তাহাকে আড় করিয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছে। সে তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তে ডাক্তারের সঙ্গে রসিকতা করিতেছে।

"দোহাই তোমার বিজ্ঞানের। ডাক্তার, এখন একটু শুতে দাও।"

না, এখন শুলে চলবে না।

আচ্ছা—তোমরা চলে গেলেই শোবো, তাহলে।

মাকে ডাকিয়া লুডমিলা বলিল, আপনি দেখবেন, ও যেন না শোয়। আমি কিছুক্ষণ পরেই আসছি।

মা ছাড়া তাহারা সকলে চলিয়া গেল। চোখ বুঁজিয়া ইয়াগর বলিয়া যাইতে লাগিল—একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মৃত্যু ধীরে ধীরে যেন কুন্ঠিত হয়ে আমার কাছে আসছে। হাজার হোক, বড় ভাল লোক ছিলাম—আমাকে নিয়ে যেতে মৃত্যুরও কুণ্ঠা হচ্ছে।

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মা বলিলেন, কথা বলো না, লক্ষিটি ঘুমোও।

আচ্ছা তোমার কথাই শুনলাম।

তাহার পাশে বসিয়া কখন ক্লান্তিতে মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, একটা কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখেন দরজা খোলার শব্দ হইতেছে। লুডমিলা ঘরে ঢুকিয়া ইয়াগরের কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, একি ?

ইয়াগর শান্তকণ্ঠে বলিল, চুপ্ কর!

তারপর একবার জোরে হাঁ করিল, মাথাটা তুলিয়া হাতটা আগাইয়া দিল। মা উঠিয়া হাতটা ধরিতে তাহার সমস্ত দেহ একবার জোরে কাঁপিয়া উঠিয়া পড়িয়া গেল। অস্ফুট স্বরে সে শুধু বলিল, একটু হাওয়া!

ধীরে মাথাটা বেঁকিয়া কাঁধের উপর আসিয়া পড়িল। বিস্ফারিত নিষ্পলক চোখে ঘরের মৃদু প্রদীপের ছায়া কাঁপিতেছিল। লুডমিলা

ভাল করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল—শেষ হয়ে গেছে!

হঠাৎ চলিতে চলিতে মাথায় সজোরে আঘাত করিলে লোকে যেমন বসিয়া পড়ে লুডমিলা তেমনি অবশ হইয়া বসিয়া পড়িল। দুইহাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিয়া নিরুদ্ধ আবেগে সে গুমরাইয়া উঠিল।

ইয়াগরের অবশ হাত দুইটী তাহার বুকের উপর রাখিয়া মাথাটী বালিশে নামাইয়া মা চোখের জল মুছিয়া লুডমিলার পাশে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে তাহার মাথাটী বুকে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মাথা তুলিয়া মার বুকে মুখ রাখিতে তাহার ঠোঁট দুইটী কাঁপিয়া উঠিল।

—বহুদিন ধরে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। একসঙ্গে আমরা দুজনে নির্ব্বাসিত হয়েছিলাম। একসঙ্গে দুজনে পায়ে হেঁটে নির্ব্বাসনে গিয়েছিলাম—জেলে একসঙ্গে বসে দুজনে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছি।

চীৎকার করিয়া কাঁদিবার জন্য তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অশ্রুভরা সমস্ত আর্ত্তনাদ কণ্ঠে আসিয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। দুটী বিশাল চক্ষু আরও আয়ত হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে অশ্রু নাই। চুপি চুপি মার মুখের কাছে মুখ আগাইয়া লইয়া সে বলে, এমন সময় গিয়েছে, যখন সবাই ভেঙ্গে পড়েছে, বিরক্ত মনে হয়েছে—কিন্তু ওর অন্তরে ছিল অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার। হেসে, হাসিয়ে, ঠাট্টা করে একটা সত্যিকারের পুরুষ-মানুষের মত ও সমস্ত দুঃখ কষ্টকে ঢেকে রাখতে পারতো! দুর্ব্বলকে জাগিয়ে, মাতিয়ে

তুলতে পারতো। যেমন কোমল ছিল ওর অন্তর তেমনি সজাগ ছিল মন। সাইবেরিয়ায় লোকে আলস্যে মরে যায়—সমস্ত জীবনের প্রতি একটা অতি কুৎসিত ভঙ্গী সেখানে আপনা থেকে জন্মায় কিন্তু ও অদ্ভুত উপায়ে সেখানে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ওর নিজের জীবনে যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা ছিল কিন্তু আমি জানি কোনও দিন কেউ ওর নিজের সম্বন্ধে একটা দুঃখের কথাও শোনে নি—কখনও না। আমিই তো সকলের চেয়ে ওর কাছে কাছে থাকতাম—কোনও দিন একটা কথাও শুনিনি। শরীর গিয়েছিল ভেঙ্গে, একান্ত পরিশ্রান্ত—কিন্তু কোনও দিন অনুকম্পা, দয়া বা সেবা কিছুই কারুর কাছে প্রত্যাশা করে নি।

ধীরে উঠিয়া শয্যার ধারে গিয়া ইয়াগরকে একবার চুম্বন করিল। তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নিরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, বন্ধু, বিদায়, সমস্ত জীবন তোমারই মত নিঃশঙ্কচিত্তে এই দায়িত্ব বইবো—বিদায়!

হাঁটু নত করিয়া মৃতকে অভিবাদন জানাইয়া মা লুডমিলার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বারাণ্ডা পার হইয়া দেখিলেন, নীরবে লুডমিলার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

পরের দিন মৃতের শেষ-ক্রিয়ার আয়োজনে মা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যাবেলা দুই ভাই-বোনে বসিয়া চা-খাইতে খাইতে ইয়াগর সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে ঝড়ের মত শাশাঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখ-চোখ তাহার আনন্দ উদ্ভাসিত, কপোল রক্তিম। কোথায় সে গম্ভীর, স্বল্প-বাক, স্থির-দৃষ্টি নারী! তাহার বদলে অন্ধকারে অগ্নি-শিখার মত এ কোন তরুণী! কিসের এক বিপুল আশা যেন তাহার সমস্ত দেহ-মনকে আজ বদলাইয়া দিয়াছে।

আইভানোভিচ গম্ভীর ভাবে শাশাঙ্কার মুখের দিকে চাহিয়া টেবিলে আঙুল ঠুকিতে ঠুকিতে বলিয়া উঠিল, কি ব্যাপার, শাশা, আজ তোমাকে তো ঠিক তোমার মত দেখাচ্ছে না!

অকুণ্ঠ হাস্যে শাশাঙ্কা বলিল, না দেখাতেও পারে!

সোফিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নতুন কিছু আশা পেইচিস্ না কি রে?

ঘাড় নাড়িয়া তেমনি স্মিতমুখে শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, "সত্যি ভাই পেয়েছি! সারারাত ধরে কাল নিকোলের সঙ্গে কথা বলেছি। কি জানি কেন আগে ওকে আমার ভাল লাগতো না! কিন্তু কাল ওর সঙ্গে কথা বলে দেখলাম—ওর সম্বন্ধে আমার সমস্ত ধারণা ভুল হয়েছিল। ও আজ নিজেকে খুঁজে পেয়েছে! যে-বন্ধুত্ব জীবনের গহনতম অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে দেয়, কেমন করে ওর অশিক্ষিত মনে তার স্পর্শ এসে লেগেছে।"

আজ শাশাঙ্কার মুখের চেহারা, তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী, তাহার এই উচ্ছ্বাস, মার বড় ভাল লাগিতেছিল।

শাশাঙ্কা বলিতেছিল, দেখলুম জেলে যে-সব বন্ধুদের সে ফেলে রেখে এসেছে—তাদের চিন্তায় ও ডুবে আছে। জানো, আমাকে কি আশা দিয়েছে? জেল থেকে ওদের লুকিয়ে পালাবার বন্দোবস্ত করতে হবে! নিকোলে বলেছে, বিশেষ কিছুই হাঙ্গামা নেই—অনায়াসে হয়ে যাবে!

সোফিয়া মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুই কি মনে করিস্, শাশা! জেল থেকে লুকিয়ে বার করে আনা কি সম্ভব হবে?

মা—

মা চা পরিবেশন করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

সোফিয়ার প্রশ্নে সহসা শাশাঙ্কার ভ্রূ আবার পূর্ব্বেকার মত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সেই আনন্দ-উদ্দীপ্ত মুখ সহসা আবার গম্ভীর হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিজের মধ্যে যেন সহসা হারাইযা গিয়া গম্ভীব স্বরে শাশাঙ্কা বলিল, এ যে সম্ভব, এ সম্বন্ধে নিকোলেব কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে যা সব বলেছে, তা যদি সত্যি হয়. তা হলে আমাদের একবাব চেষ্টা করে দেখা উচিত। এটা আমাদেব কর্ত্তব্য!

শেষেব কথাগুলি এমন অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে সে বলিয়া ফেলিল যে কিসের এক গোপন লজ্জায় তাহার গণ্ড রক্তিম হইয উঠিল। লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া চেয়ারে চুপ করিয়া বসিযা রহিল।

মা ও তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, ওবে দুষ্টু মেয়ে!

সোফিয়া, আইভানোভিচ বুঝিয়াছিল সহসা শাশাঙ্কার এই লজ্জার হেতু কি! শাশাঙ্কার দিকে চাহিয়া তাহারাও সস্নেহে মৃদু হাসিয়া ফেলিল।

ধরা পড়িয়া যাওয়ার লজ্জা জোর করিয়া দূর করিবার জন্য মাথা তুলিয়া শুষ্ক কণ্ঠে শাশাঙ্কা বলিল, আমি জানি, কেন তোমরা হাসছো! তোমরা ভাবছো বোধহয় যে, কোন ব্যক্তিগত কারণে আমার এ বিষয়ে এত আগ্রহ, না?

শাশাঙ্কার কাছে উঠিয়া গিয়া কোমল কণ্ঠে সোফিয়া বলিল, বেশ তো, তাতেই বা দোষ কি?

উত্তেজিত, বিবর্ণ হইয়া শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, কিন্তু তা সত্যি নয়! তোমরা যদি এ বিষয়ে ভেবে দেখবার ভার নাও—আমি এই ব্যাপারে একদম থাকতে চাই না, থাকবোও না!

আইভানোভিচ বাধা দিয়া বলিল, থামো, শাশা!

নিজের অন্তর দিয়া মা শাশাঙ্কার অন্তর বুঝিয়াছিলেন। কাছে গিয়া আদর করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিলেন। সোফিয়া শাশাঙ্কার পাশে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিল, অদ্ভুত মেয়ে তুই!

যেন তাহা স্বীকার করিয়া শাশাঙ্কা উত্তর দিল, অদ্ভুতই বটে। তবে ইদানীং কেমন বোকা হয়ে গিয়েছি। ছায়া আমার আদৌ ভাল লাগে না আর!

মৃদু তিরস্কার করিয়াই আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, খুব হয়েছে, থামো এখন! কাজের কথা আলোচনা করা যাক। যদি পালাবার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়, তা হলে এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিতীয় মত থাকতেই পারে না। কিন্তু সকলের আগে, আমাদের জানা উচিত যাদের জন্যে এ চেষ্টা হচ্ছে, তারা এ ব্যবস্থা চায় কিনা! ইতিমধ্যে একবার নিকোলের সঙ্গে আমার দেখা করাও দরকার।

শাশাঙ্কা বলিল, কাল আমি এসে জানিয়ে যাব, কোথায় কখন তার সঙ্গে দেখা হবে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে এখন কি করবে ঠিক হয়েছে?

—একটা নতুন ছাপাখানায় কম্পোজিটরের চাকরীর জন্যে চেষ্টা করা

হচ্ছে। যতক্ষণ তা না হয়, আমাদের সহরের ধারে সরকারী বনের মালীর ঘরেই ওর থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে।

মা চায়ের বাসন পরিষ্কার করিতেছিলেন। আইভানোভিচ তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, পরশু দিন পাভেলের সঙ্গে আপনার দেখা করতে হবে এবং দেখা করবার সময়, আমি একখানা চিঠি দেবো—সেইটে তাকে দিয়ে আসতে হবে। তার মতামতটা নেওয়া দরকার! বুঝলেন?

মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, বুঝেছি, নিশ্চয়ই বুঝেছি! ও আমি অনায়াসে পারবো! আমার তো ঐ কাজ!

জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, আমি তাহলে এখন চল্লুম।

নীরবে, সেই আগেকার মত গম্ভীর মুখে শাশাঙ্কা সকলের সহিত করমর্দ্দন করিল। ধীরে গুরুপাদক্ষেপে শাশাঙ্কা চলিয়া গেল। বহু চেষ্টার ফলে তাহার দুই চোখ যাইবার সময় শুষ্কই ছিল।

তাহার বিদায়-পথের দিকে চাহিয়া সোফিয়া মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ রকম একটী বউ কেমন লাগে তোমার মা?

কাঁদিয়া ফেলিবার মত হইয়া মা বলেন, একদিনও ওদের দুজনকে যদি এক সঙ্গে দেখে যেতে পারি!

পরের দিন সকাল বেলা হাসপাতালের দরজায় জনকয়েক লোক দাঁড়াইযাছিল—তাহাদের বন্ধুর মৃত-দেহের প্রতি শেষ সম্মান দেখাইবার জন্য। গুপ্তচরেরা কাণ পাতিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাস্তার অপর পারে কোমরে রিভলভার লইয়া একদল পুলিশ দাঁড়াইয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে হাসপাতালের দরজার সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়া উঠিতে লাগিল।

সেই জনতার মধ্যে মা ও আসিয়াছিলেন। পরিচিত মুখগুলি খুঁজিযা দেখিতেছিলেন এবং আপনার মনে ভাবিতেছিলেন—ওদের দল বলতে মাত্র এই ক'টী লোক!

এমন সময় হাসপাতালের দরজা খুলিয়া গেল। ফুলের মালা এবং লাল রিবনে মোড়া কফিন্ জনতার স্কন্ধে উঠিল। সমবেত সমস্ত লোক একত্র হইয়া সেই কফিনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথার টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিল। সহসা সেই জনতা ভেদ করিয়া একজন দীর্ঘকায় পুলিশ পারিপার্শ্বিকতার দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যেখানে শবাধারটী ছিল, তাহারই দিকে আগাইয়া চলিল। পিছনে তাহার কয়েকজন সৈন্য। শবাধারকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাহারা গোল হইয়া দাঁড়াইল। পুলিশ অফিসারটী তীক্ষ্ণ গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন,

"রিবন সরিয়ে নেওয়া হক!"

সহসা এই আদেশে জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুলিশ অফিসারটীকে ঘিরিয়া লোকে ভিড় করিতে লাগিল। ভিড়ের মধ্য হইতে একটী তরুণ কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, নিপাত যাক এই অত্যাচারের পালা! কিন্তু গণ্ডগোলের মধ্যে তাহার সেই একটী প্রতিবাদের শব্দ কোথায় ডুবিয়া গেল।

রিবন সরাইয়া লওয়ার হুকুমে মার মনও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পাশে একজন দরিদ্রবেশী যুবক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকেই ডাকিয়া মা বলিলেন, দেখো তো বাছা, এ কেমন অন্যায়! বন্ধু মরলে নিজের মনের মতন করে কবর পর্য্যন্ত দেবার ও উপায় নেই—এর মানে কি?

গণ্ডগোল চেঁচামেচি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। জনতার মাথায় শবাধার দোলার মত দুলিতেছিল। বাতাসে লাল সিল্কের রিবনগুলির উড়িবার বিচিত্র শব্দ সেই গণ্ডগোলেরও ঊর্দ্ধে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল।

পুলিশ এবং সৈন্যদের সঙ্গে আসন্ন সংঘর্ষের কথা ভাবিয়া মার অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। চলিতে চলিতে দুধারের লোককে ডাকিয়া তিনি বলেন, কাজ কি বাপু! রিবন গুলো খুলেই না হয় দাও না! তাছাড়া এখন আর কি করা যায়, বল না?

সহসা মা শুনিলেন একটা বলিষ্ঠ শব্দ সেই জনতার ঊর্দ্ধে জাগিয়া উঠিল।

—যাকে তোমরাই যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছ, তার এই শেষ-যাত্রায় আমরা কোন রকম ভাবে যেন আর উত্যক্ত না হই—এই আমাদের দাবী।

মা শুনিলেন পুলিশ অফিসারটী হুকুম দিলেন, রিবনগুলো তলোয়ার দিয়ে ছিঁড়ে ফেলো! খাপ হইতে তলোয়ার খোলার শব্দে মা চক্ষু বুঁজিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল এখনি বুঝি সমস্ত জনতা গর্জ্জন করিয়া উঠিবে। কিন্তু চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, গণ্ডগোল থামিয়া গিয়াছে, সকলে নীরব!

নিজেদের বীর্য্যহীনতার এই প্রকাশ্য প্রমাণে মুহ্যমান হইয়া মাথা নীচু করিয়া তাহারা আগাইয়া চলিল। সারা পথ ভরিয়া শুধু তাহাদের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নীরবে তাহারা এই অপমান সহ্য করিল কিন্তু তাহার বিষ-জ্বালা নীরবে প্রতি অন্তরে ধূমায়মান হইতে লাগিল। ক্রমশঃ পদ-ধ্বনি যেন এক সঙ্গে এক তালে আরও গম্ভীর ছন্দে ধ্বনিয়া উঠিল ; মাথা নীচু করিয়া যাহারা চলিতেছিল, মাথা সোজা করিয়া তাহারা চলিতে লাগিল। সকলের চক্ষু যেন স্থির, নিষ্করুণ হইয়া উঠিল।

যত বেলা বাড়িতে লাগিল, শীতের নিদারুণ হিম বাতাস ততই যেন তীব্র আবর্ত্তময় হইয়া উঠিতে লাগিল। পথের ধূলায় কুণ্ডলী পাকাইয়া, চোখে মুখে চুলে উড়িয়া আসিয়া, ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়া বুকে ঘা দিয়া এক নির্ব্বান্ধব অন্ধকার আর আশঙ্কার আব-হাওয়ায় সমস্ত জনতাকে ছাইয়া ফেলিল।

ফুটপাথ ধরিয়া মা যাইতেছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই মার ভাল লাগিতেছিলনা। পুরোহিত নাই—শোক-সঙ্গীত নাই—তাহার বদলে ভ্রুকুটী-কুটীল সব মুখ, গম্ভীর, নীরব। এ কি-রকম শ্মশান-যাত্রা! তাঁহার মনে হইতেছিল, এই জনতা যেন কবর দিতে চলিয়াছে, ইয়াগরকে নয়, যেন কি একটা অন্য জিনিসকে, তাহার নাম তিনি জানেন না, তাহাকে তিনি আজও মন দিয়া ধরিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ জনতা গোরস্থানে আসিয়া পৌছিল। ভিতরে ঢুকিয়া একটা খোলা জায়গায় শবাধার নামান হইল। শবাধার নামানর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোক কবরের চারিদিকে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল। অফিসারটী শব-বাহকদের একজনকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,

—সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ! পুলিশের কর্ত্তার আদেশ অনুযায়ী আপনাদের জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, কোনও বক্তৃতা এখানে হইতে পারিবে না।—

একজন যুবক আগাইয়া আসিয়া ধীর ভাবে বলিল, আমি মাত্র গোটা দুয়েক কথা বলবো। বন্ধু সব! আমাদের এই পরলোকগত বন্ধু এবং দীক্ষাদাতার কবরে দাঁড়িয়ে, এস আমরা নীরবে এই ব্রত গ্রহণ করি, যেন তাঁর অন্তরের বাসনার কথা আমরা না ভুলি! যে পাপ—যে স্বেচ্ছাতন্ত্র আমাদের আজ নিস্পেষণ করে মেরে ফেলছে, এই কবরে দাঁড়িয়ে নীরবে শপথ কর, যেন তার কবর খুঁড়তে একদিনও না আমরা বিরাম দিই!

সহসা পুলিশ অফিসার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, গ্রেফতার কর!

কিন্তু তাহার কথা সেই বিরাট জনতার চীৎকারের মধ্যে ডুবিয়া গেল। ক্ষিপ্ত জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল, নিপাত যাক জার-স্বেচ্ছাতন্ত্র!

বক্তাটীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতে পুলিশ দেখে, তাহাকে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক্ষণিক ভয়ে মুহ্যমান হইয়া মা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। শুনিলেন, পুলিশের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। চারিদিকে এলোমেলো চীৎকার, মেয়েদের আর্ত্তনাদ! তাহার মধ্য হইতে যুবকটীর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল,—বন্ধুরা! শান্ত হও! নিজেদের এর চেয়ে বেশী মর্য্যাদা দিতে শেখো! আমি বলছি, আমাকে যেতে দাও!

মা চোখ চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন রৌদ্রালোকে ক্ষণে ক্ষণে বেয়নেট ঝলসাইয়া উঠিতেছে।

দৃঢ়কণ্ঠে যুবকটী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, বন্ধুরা, অযথা শক্তি ক্ষয় কেন করছো? ভুলে যাচ্ছো, এখন আমাদের ধারালো করে তুলতে হবে, হাতের তলোয়ারকে নয়, আমাদের মগজকে!

বেড়া ভাঙ্গিয়া লাঠী করিয়া লইয়া জনতা পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল—যুবকটীর কথায় তাহারা লাঠী নামাইল। মা আচ্ছন্নের মত ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া যাইতেই দেখিলেন, আইভানোভিচ দুই হাত দিয়া জনতা সরাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—তোমরা কি একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি সব হারালে? থামো!

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে, দেখিলেন, তাহার একখানি হাত রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। উন্মাদের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আইভানোভিচ, এখান থেকে সরে যাও!

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি—এগোলেই আপনাকে মারবে!

মা সেইখানেই থামিয়া গেলেন। সোফিয়া আসিয়া মার কাঁধে হাত দিয়া তাঁহার দেহের ভার নিজের দেহের উপর লইল। তাহার আর একহাতে একটী কিশোর ছেলে, বিশেষ ভাবে আহত। হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টায় ছেলেটি বলিতেছে—আমাকে ছেড়ে দিন! আমার কিচ্ছু হয় নি!

মার হাতে ছেলেটিকে দিয়া সোফিয়া বলিল,—এই ছেলেটীকে দেখুন দেখি! এই রুমাল দিয়ে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ করে ওকে বাড়ী নিয়ে চলুন! এখানে আপনাকে দেখতে পেলেই গ্রেফতার করবে। শিগ্‌গির এখান থেকে চলে যান!

ছেলেটীকে সঙ্গে লইয়া মা গোর-স্থান হইতে বাহির হইয়া একটা গাড়ী লইলেন।

আইভানকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া মা দেখিলেন সোফিয়ারা তাঁহার পূর্ব্বেই বাড়ী আসিয়া পৌছিয়াছে। সঙ্গে তাহাদের দলের ডাক্তারকেও লইয়া আসিয়াছে।

ডাক্তার আইভানের ক্ষতস্থান ধুইয়া দিয়া ওষুধ লাগাইয়া সেইখানেই তাহাকে সেদিনের মত শোয়াইয়া রাখিল। মার সর্ব্বাঙ্গ রক্তের দাগে ভরিয়া গিয়াছিল। পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে করিতে তিনি শুনিতেছিলেন সোফিয়ারা কথা বলিতেছে। লক্ষ্য করিলেন অদ্ভুত প্রশান্তভাবে তাহারা কথা বলিতেছে, কাজ করিতেছে, যেন এমন বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। সেই ভয়াবহ ঘটনার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাহারা আবার আত্মস্থ হইয়া গিয়াছে। সত্যের আহ্বানে যে-কোনও ভয়াবহ কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করিতে তাহারা সর্ব্বদাই নিজেদের প্রস্তুত এবং প্রশান্ত রাখিতে পারে। তাহাদের অন্তরের এই শক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে মা নিজের অন্তরে এক নূতন সাহস পাইলেন।

পোষাক বদলাইয়া সোফিয়ার সঙ্গে বসিবার ঘরে আসিয়া দেখেন, গোরস্থানের সেই ঘটনা লইয়া আর তাহারা আলোচনা করিতেছে না। যেন তাহা অতীতে, দূরে চলিয়া গিয়াছে। কাল সকালে কি নূতন কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে তাহারই আলোচনা হইতেছে। মুখে তাহাদের ক্লান্তির চিহ্ন কিন্তু চিন্তায় অবসাদের বিন্দুমাত্র লক্ষণ নাই।

তাহারা নিজেদের কাজের সমালোচনাই করিতেছিল। আইভানোভিচ চিন্তিতভাবে বলিতেছিল—প্রত্যেক যায়গা থেকে আজকাল খবর আসছে যে, বই-পত্র পাঠাও! এতে আর চলে না! কিন্তু আজও পর্য্যন্ত আমরা একটা ভালো প্রেস দখলে আনতে পারলাম না। লুডমিলা একা খেটে খেটে মারা যেতে বসেছে! তাকে সাহায্য

করবার একজন লোক না দিতে পারলে শিগ্‌গিরই শুনবো যে সে ও বিছানা নিয়েছে।

সোফিয়া নিকোলের কথা তুলিল। তাহার উত্তরে আইভানোভিচ বলিল, ওকে এখন সহরে রাখলে চলবে না। নতুন ছাপাখানায় ও একবার ঘুরে আসুক। সেখানে ও ছাড়া আর একজন লোকের দরকার!

শান্তকণ্ঠে মা বলিলেন, আমাকে দিয়ে সে কাজ চলবে না?

মার দিকে সস্নেহে চাহিয়া সে বলিল, আপনার পক্ষে সে ভয়ানক কষ্টকর হবে। শহরের বাইরে আপনাকে থাকতে হবে—পাভেলের সঙ্গে দেখাশোনা করা তখন আর চলবে না—

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, পাভেলের দিক দিয়ে অবশ্য সেটা খুব ক্ষতিকর কিছু হবে না। আর আমার পক্ষে জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কোন কথা বলতে পারবো না। বোকার মতন নিজের ছেলের সামনে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে আসা!

কিছুক্ষণ মার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আইভানোভিচ কি কাজ করিতে হইবে তাহা মাকে বুঝাইয়া বলিলেন, মোটের ওপর নতুন ছাপাখানায় যারা কাজ করবে, তাদের দেখাশোনার ভার আপনার ওপর থাকবে!

মা হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছি সব। আমাকে তাদের সকলের রান্না করতে হবে। সে আমি কেন পারবো না?

বিগত কয়েকদিনের ঘটনা মাকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। শহরের বাহিরে অন্য কোথাও থাকিবার নূতনত্ব মার ভাল

লাগিতেছিল। তাই মা জেদ ধরিয়া বসিলেন—তিনি সেখানে যাইবেনই।

কথার মোড় ফিরাইবার জন্য আইভানোভিচ ডাক্তারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ডাক্তার তোমার রুগীর কথা ভাবছো নাকি ?

গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া ডাক্তার বলিল, না আমি ভাবছি, আমরা এত অল্প। পাভেল আর আন্দ্রিকে বুঝিয়ে জেল থেকে ওদের লুকিয়ে বার করতেই হবে। ওদের মতন দুজন দরকারী লোক জেলের ভেতর চুপ করে বসে থাকলে একদম চলবে না।

আইভানোভিচ চোখ নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িয়া মার দিকে চাহিলেন। তাঁহার সামনে তাঁহার ছেলে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাহারা কুণ্ঠাবোধ করিতেছে মনে করিয়া মা সে ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে জেলের দেখা-করিবার ঘরে মা বসিয়া আছেন। সামনে তাঁহার পুত্র পাভেল। হাতের মধ্যে সঙ্গোপনে নিকোলের লেখা পত্র। কোন ফাঁকে তাহা পাভেলের হাতে দিবেন-সেই লক্ষ্য করিয়া আছেন।

—আমি এখন বেশ ভাল আছি। তুমি ভাল আছ তো মা ?

—এই একরকম কেটে যাচ্ছে। আহা ! ইযাগর মারা গেল সেদিন।

বিস্মিত হইয়া পাভেল বলিয়া উঠিল, সত্যি ?

বোকা সরল মেয়েমানুষের মতন মা বলিতে লাগিলেন, কবর

দেবার সময় পুলিশের সঙ্গে হলো মারামারি, একজন লোক ধরাও পড়লো—

সামনে চেয়ারে জেলের সহকারী ওভারসিয়ার বসিয়াছিলেন। হঠাৎ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন—

—ওকি! ওসব কি কথা। বাদ দাও, বাদ দাও ওসব কথা! বোঝোনা, রাজনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলবার এখানে আইন নেই!

মা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুই যেন বুঝিতে পারেন নাই, এমন ভাবে বলিয়া উঠিলেন, তা বাবা, রাজনীতির কথা তো আমি কিছু বলি নি। আমি বলছিলাম একটা মারামারি হয়েছিল সেই সেদিন, তারই কথা। একজনের মাথাও কাটিয়ে দিয়েছিল—

—হয়েছে, হয়েছে, থামো। তোমার ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর কোনো কথা তুলতে পারবে না!

কথাগুলো বলিয়া যেই পিছন ফিরিয়া চেয়ারে বসিতে যাইবে অমনি মা পাভেলের হাতে পত্রটী গুঁজিয়া দিলেন। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মা বাঁচিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর মা বলিয়া উঠিলেন, কি কথা বলবো তাতো বুঝতে পারছি না আর!

পাভেল হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আমিও জানি না, কি কথা বলবো!

ওভারসিয়ারটী চেঁচাইয়া উঠিল, তবে ন্যাকামো করে দেখা করতে আসা কেন? যত কর্ম্ম-ভোগ!

কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহারা তাহাদের উভয়ের কাছে একান্ত নিষ্প্রয়োজন কথা বলিতে লাগিল। পাভেলের দিকে চাহিয়া মার বড়ই ইচ্ছা

হইতেছিল কোনও রকমে নিকোলের কথা তাহাকে যদি জানাইয়া যাইতে পারেন। পাভেল নিশ্চয়ই নিকোলের খবর জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিবার পর মা বলিয়া উঠিলেন, তোমার ধর্ম্ম-পুত্রের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো।

পাভেল নীরব বিস্ময়ে মার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মা মুখে আঙুল দিয়া নিকোলের মুখের বসন্তের দাগের কথা ইঙ্গিতে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

—সে বেশ ভালই আছে। কোন রকম বিপদ-আপদ হয় নি। তোমার মনে আছে—কাজ, কাজ করে সে কি পাগলামীই না করতো। একটা কাজও তার জোটবার সম্ভাবনা হয়েছে।

পাভেল সমস্তই বুঝিল। আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করিয়া সে মাকে অভিবাদন করিল। হাসিয়া বলিল, ও, তার কথা আমার আজকাল প্রায়ই মনে হয়।

মাও বুঝিলেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। পরিতৃপ্ত অন্তরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ীতে আসিয়াই দেখেন শাশাঙ্কা বসিয়া আছে। যেদিন মা পাভেলের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন ঠিক সেই দিন শাশাঙ্কা এখানে আসিত।

—কেমন দেখে এলেন?

—সে বেশ ভালই আছে।

—চিঠিটা দিতে পেরেছিলেন?

—নিশ্চয়ই। রীতিমত কায়দা করে তার হাতে গুঁজে দিয়েছি!

—মা

—পড়লো নাকি ?

—আচ্ছাই বোকা। সেখানে পড়বে কি করে ?

—ওঃ। তাওতো বটে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আচ্ছা, এখন এক হপ্তা অপেক্ষা করা যাক। আপনার কি মনে হয় সে এতে রাজী হবে ?

—কি জানি। মনে হয় রাজী হবে। রাজী না হবার কারণ কি থাকতে পারে ?

অন্য কথা পাড়িয়া শাশাঙ্কা বলিল, ছেলেটী কিছু খেতে চেয়েছিল, ঘরে—

মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিতেই শাশাঙ্কা ডাকিল—শুনুন,—

সহসা তাহার আঁখি-পল্লবের তলায় ছায়া ঘনাইয়া আসিল। ঠোঁট দুইটী কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কম্পিত-কণ্ঠে মার হাত ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল, আমি জানি সে রাজী হবে না কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি কোন রকম করে তাকে বোঝান। বলবেন, আমাদের কাজের জন্যে তাকে চাই-ই। তাকে না হলে চলবে না। আর, আমার মনে হয় জেলে তার ভয়ানক কি একটা অসুখ হয়ত হবে—

শাশাঙ্কার কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল। তাহার নিঃশ্বাস যেন আটকাইয়া আসিতেছিল। সহসা তাহার এই উচ্ছ্বাসে মা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বুকে টানিয়া লইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, জানিস্ তো মা, সে তার নিজের কথা ছাড়া আর কারুর কথা শোনে না—

আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায় তাহারা উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

তারপর অতি সন্তর্পণে তাহার কাঁধ হইতে মার হাতটী নামাইয়া দিয়া আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিয়া শাশা বলিল, তা ঠিক! আমাদের এ রকম বোকার মত লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করা ঠিক নয়! শুধু মাথা গরম করা! সে যাক, এখন ছেলেটীকে কিছু খেতে দেওয়া দরকার!

মা খাবার লইয়া আইভানের পাশে গিয়া বসিলেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাথার যন্ত্রণা কি এখনও সেই রকম আছে ?

—ব্যথা বেশী নেই। তবে মনে হচ্ছে যেন সব গুলিয়ে গিয়েছে। বড় দুর্ব্বল লাগছে!

শাশাঙ্কাকে দেখিয়া আইভানের সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। তাহার সামনে সে খাইতে পারিতেছিল না—ইহা লক্ষ্য করিয়া শাশাঙ্কা ধীরে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া যে-পথ দিয়া সে চলিয়া গেল তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, সুন্দর!

তাহার দিকে চাহিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বয়স কত, বাছা ?

—সতেরো!

—তোমার বাপ মা কোথায় থাকেন ?

—গ্রামে। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমি এখানে আসি। কমরেড আপনার নাম কি জানতে পারি ?

যখন কেহ তাঁহাকে কমরেড বলিয়া ডাকিত তখন তাঁহার মুখে সহসা হাসি ফুটিয়া উঠিত, মন দুলিয়া উঠিত!

—আমার নাম জেনে তোমার কি হবে ?

একটু লজ্জিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সে বলিল,—কেন জিজ্ঞাসা করছিলাম জানেন—আমাদের দলের একজন বন্ধু, সেই আমাদের সমস্ত বইটই পড়ে শোনাতো—সে প্রায়ই পাভেলের মার সম্বন্ধে গল্প করতো—পয়লা মের সমস্ত ঘটনা তার কাছ থেকেই শুনি—

হাতে চামচেটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সে বলিল, আমরা এখানে আমাদের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম—তাঁদের ওখানে যেতে পারিনি! কিন্তু আমি শুনলুম যে সেদিন তিনিও বেরিয়ে পড়েছিলেন—আমি সঠিক খবর জানি! আপনি বিশ্বাস করুন! সবাই বলে, সেই বুড়ী এক অদ্ভুত নারী!

মার সমস্ত মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। বালকের সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিতে তাঁহার ভালই লাগিতেছিল কিন্তু অশোয়াস্তি বোধ হইতেছিল। আত্ম-প্রকাশ না করিবার চেষ্টা তাঁহাকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিতেছিল।

—ওকি, কিছু রেখো না—খেয়ে নাও সব! বেশী করে খাও দেখি—কালই আবার দলে গিয়ে সকলের সঙ্গে চলবার শক্তি পাবে।

সহসা মা উত্তেজিত হইয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিয়া উঠিলেন, তোমাদের মত নবীন সবল বাহু, তোমাদের মত স্বচ্ছ পবিত্র হৃদয়, এই আন্দোলন এই সব শক্তির ওপর নির্ভর করছে! যা কিছু পাপ, যা কিছু নীচ, হেয় তা থেকে এই সব জিনিসই তো তোমাদের দূরে রেখেছে!

এমন সময় সহসা বাহির হইতে দরজা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে সোফিয়া ঘরে ঢুকিল। খোলা দরজা দিয়া এক ঝলক হেমন্তের হিম-বায়ু সেই সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

হিমে সোফিয়ার মুখের রক্ত যেন জমিয়া গিয়াছিল। হাসিয়া সে বলিয়া উঠিল, বড়লোক বৌএর দিকে বর যেমন করে প্রথম প্রথম দৃষ্টি রাখে, গুপ্তচররা আমাকে ঠিক সেই রকম নজরে নজরে রেখেছে। এখানে আর থাকা চল্লো না!

সন্ধ্যাবেলা চা পান করিবার সময় সোফিয়া মাকে ডাকিয়া বলিল আবার সেই গ্রামে বই নিয়ে যেতে হবে। লুডমিলা এরি মধ্যে আরও তিনশো বই ছেপে ফেলেছে। মরবে—ওটা খেটে খেটে মরবে!

—যেতে তো সর্ব্বদাই প্রস্তুত! কখন যেতে হবে?

—যদি কালই যেতে পারেন তো ভাল হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, সেবারে যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন এবারে সে-পথ দিয়ে আর যাবেন না। নিকোলস্ক হয়ে ঘোড়ায় চড়ে আপনাকে যেতে হবে। পথে তিনবার আপনাকে ঘোড়া বদলাতে হবে!

—তা না হয় হলো কিন্তু তিনবার ঘোড়া বদলানো তো সহজ ব্যাপার নয়! খরচ হবে যে বিস্তর!

—খরচ বাড়ানোর পক্ষপাতী আমি আদৌ নই। তবে সেখানকার ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়। ধর-পাকড় সেখানে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। রাইবিন বোধহয়—বোধহয় কেন নিশ্চয়ই গা-ঢাকা দিয়েছে। সেখানে যেতে ভয় করবে না তো আপনার?

এই প্রশ্নে মা লজ্জিত এবং অপমানিত বোধ করিলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, আমাকে কবে তোমরা ভীত দেখেছ? প্রথম দিন থেকেই আমার অন্তরে আমার জন্যে কোন ভয় ছিল না। আমার ভয় পায় কি না পায়, সে কথা জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। কিসের জন্যে আমার ভয় পাবে? তারাই ভয় পায়—যাদের আগলে নিয়ে

বসে থাকবার কিছু আছে। আমার কি আছে? শুধু একটা ছেলে। তারই জন্যে আগে ভয় পেতো, শঙ্কিত হয়ে উঠতাম। মনে হতো সে কি যন্ত্রণাই না ভোগ করবে। যন্ত্রণা যদি সে না ভোগ করে—তবে আমার আর কিসের ভয়?

মাব কণ্ঠস্বরে সোফিয়া লজ্জিত হইল। অনুনয়ের কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা কবিল, আপনি বাগ করলেন।

—না রাগ করিনি। তবে একটা কথা তোমাদের বলি—তোমরা নিজেদেব মধ্যে কাউকে এবকম করে আব জিজ্ঞাসা করো না—ভয় পাচ্ছ কি না।

সোফিয়া অপরাধীব মত চেযার হইতে উঠিয়া মার হাত ধরিয়া বলিল, দেখুন, আব কোন দিন এ অপরাধ করবো না। আমাকে ক্ষমা করুন।

মা আদরে সোফিয়াকে বুকে টানিয়া লইলেন। পরের দিনের যাত্রার আযোজনের ব্যাপার লইযা তিনজনে পরামর্শ করিতে বসিয়া গেল।

পরের দিন প্রত্যূষে একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া মা নিকোলস্ক গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌছাইতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল।

গাড়ী বিদায় করিয়া গ্রামের সরাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চা আনিতে বলিয়া তিনি সরাইখানার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার সামনেই খোলা মাঠ। মাঠের ধারেই একটা বাড়ী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সেটা গ্রামের টাউন-হল।

হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কোথা হইতে একটা কলরব ভাসিয়া আসিল। দেখেন, মাঠের মধ্য দিয়া গ্রামের

পুলিশ সার্জ্জেণ্ট জোরে ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছেন। অদূরে একদল লোক জটলা করিয়া শব্দ করিতে করিতে আসিতেছে।

একটী ছোট মেয়ে আসিয়া মাকে চা দিয়া অভিবাদন জানাইল। টেবিলে ডিস্ কাপগুলি রাখিয়া বালিকাটী বলিয়া উঠিল, একটা চোর এইমাত্র ধরা পড়েছে। এই দিকেই চোরটাকে নিয়ে আসছে!

—চোর? কি রকম চোর?

—তা আমি কি জানি!

—সে করেছিল কি?

—তাও আমি কি করে বলবো, বাঃ! আমি শুন্‌লুম ওরা বলাবলি করছে যে, একটা চোর ধরা পড়েছে। আমাদের চৌকিদার ছুটে বলে গেল—সে ব্যাটা ধরা পড়েছে!

জানালার বাহিরে মা দেখিলেন ক্রমশঃ লোকের ভিড় বাড়িতেছে। সকলেই টাউন হলের দিকে চলিয়াছে। তাড়াতাড়ি চা শেষ করিয়া কৌতুহল বশতঃ মা ও টাউন হলের দিকে অগ্রসর হইলেন।

যখন টাউন হলের সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, তখন সহসা তাঁহার মনে হইল যেন তাঁহার হাতপা সমস্ত অবশ হইয়া গিয়াছে। নিঃশ্বাস বোধহয় আর পড়িতেছে না। দেখিলেন, পিছ-মোড়া করিয়া হাত বাঁধিয়া পুলিশের লোকে রাইবিনকেই ধরিয়া আনিতেছে।

বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করিয়া মা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। রাইবিনের আসার পথে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। রাইবিন ঠোঁঠ নাড়িয়া কি যেন বলিয়া গেল। শব্দগুলি কাণে আসিল, কিন্তু তাহার অর্থ মস্তিষ্কের শূন্য অন্ধকারের মধ্যে কোথায় হারাইয়া গেল।

কোনও রকমে অন্তরের শঙ্কা লুকাইয়া রখিয়া মা পাশের একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে কি ?

লোকটা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ ! বলিযাই লোকটা চলিয়া গেল।

ভিড়ের মধ্য হইতে একটি স্ত্রীলোক চেঁচাইয়া উঠিল, ও বাবা ! চোরটার চেহারা কি ভয়ানক ! উঃ !

সহসা রাইবিনের গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—তোমরা শোন—আমি চোর নই ! আমি চুরি করি না ! আমি পরের জিনিসে আগুন জ্বালিয়ে দিই না। আমার অপরাধ, আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ছিলাম—তাই এরা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। যে-সমস্ত বইএ তোমাদের মত কৃষকের জীবনের সমস্ত সত্যি কথা লেখা থাকে—সে সব বইএর জন্যেই আজ আমার হাত এই রকম করে বাঁধা। আমিই গ্রামে গ্রামে সেই সব বই বিলি করে বেড়িয়েছি !

রাইবিনকে ঘিরিয়া জনতা আরও সঙ্ঘবদ্ধ হইল। তাহার ভয়লেশহীন কণ্ঠস্বর মার দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া দিল। জনতার প্রত্যেকের মুখের দিকে মা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। স্পষ্ট দেখিলেন, তাহারা সকলেই শঙ্কিত, সন্দিগ্ধ !

সহসা আবার রাইবিনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে বলিতেছে—তোমাদের মত আমিও একজন কৃষক। আমার কথা বিশ্বাস কর—সেই সমস্ত বইএ যে-সব কথা লেখা থাকে তার প্রত্যেকটা অক্ষর সত্যি ! আর জেনো—সেই সত্য প্রচারের জন্যে হয়ত আমাকে জীবন দিতে হলো। ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরেছে—নির্ম্মম নির্দ্দয় ভাবে এবং আরও মারবে—যতক্ষণ না জানতে পারবে কোথা থেকে

আমি সেই সব বই সংগ্রহ করেছি। কিন্তু আমার কথা মনে রেখো—মনে রেখো, ত্বুবেলার ত্বটুক্‌রো রুটী সংগ্রহ করার চেয়ে সত্যকে বোঝা ঢের বেশী দরকারী!

জনতার মধ্য হইতে একজন শঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এ লোকটা বলে কি?

আর একজন তাহার উত্তরে বলিল, ওর আর ভয় কি? ত্বুবার তো আর মরবে না?

জনতার উর্দ্ধে সহসা সার্জ্জেণ্টের মূর্ত্তি দেখা দিল। তিনি কমিশনারকে খবর দিতে গিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া জনতা সরিয়া দাঁড়াইল। টাউন হলের কয়েক ধাপ সিড়িরউপর উঠিয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—এখানে এত ভিড় কিসের? কি বকছে এই লোকটা?

সিঁড়ির নীচের ধাপে রাইবিন দাঁড়াইয়াছিল। নামিয়া আসিয়া সার্জ্জেণ্টটী চুলের মুঠী ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তুই বলছিলি, পাজী বদমায়েস?

জনতা একেবারে নীরব হইয়া গেল। ত্বঃখে, মা মাথা নত করিয়া রহিলেন। শুনিলেন, তবুও রাইবিন চেঁচাইতেছে,

—দেখ, তোমরা সবাই দেখ—যা বলছিলাম তা সত্যি কিনা!

—চুপ্ কর্!—বলিয়া সার্জ্জেণ্টটী সজোরে রাইবিনের মুখে আঘাত কবিল। রাইবিন ঘুরিয়া পড়িল। তবুও সে বলিয়া উঠিল,

হাত বেঁধে রেখে ওরা এই রকমভাবে নির্য্যাতন করে!

ক্ষিপ্ত হইয়া সার্জ্জেণ্টটী রাইবিনের সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল।

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল—ওরকম করে মারবার কি দরকার?

আর একজন বলিয়া উঠিল—মেরোনা, মেরোনা ওকে!

কমিশনারের আসিতে দেরী দেখিয়া সার্জ্জেণ্টটী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইলে জনতা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ওর হাত খুলে দাও!

চৌকীদাররা বিপন্ন হইয়া পড়িল। অনবরত তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, হাত খুলে দাও ওর!

রাইবিন সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে জনতার দিকে চাহিয়া বলিল, আমার হাত খুলে দাও, আমি পালাব না, কার কাছ থেকে পালাব? আমার সত্য আমার অন্তরে রয়েছে—তা থেকে আমি কোথায় পালাবো?

জনতার উপর্য্যুপরি চীৎকারে চৌকীদার রাইবিনের হাত খুলিয়া দিল।

এমন সময় পুলিশ কমিশনার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গম্ভীর-ভাবে রাইবিনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি দিয়া তাহার আপাদ-মস্তক মাপিয়া লইয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি? লোকটার হাত খোলা কেন?

একজন চৌকিদার কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর দিল,—হাত বাঁধাই ছিল, তবে লোকেরা বড় গোলমাল করছিল—ওর হাত খুলে দিতে বলছিল—

ঘুরিয়া জনতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, লোকে! লোকে কে? বাঁধ ওর হাত!

তারপর নিজের কটীবদ্ধ অসিতে হাত রাখিয়া গম্ভীর ভাবে আদেশ দিলেন, দূর করে দাও কুকুরদের!

পুলিশের লোকেরা রাইবিনের হাত বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হইল। রাইবিন বাধা দিল। বলিয়া উঠিল, আমি পালাচ্ছিনা—তোমাদের সঙ্গে মারামারিও করতে চাই না। কেন আমার হাত বাধছ—

পুলিশ কমিশনার অগ্রসর হইয়া রাইবিনকে সজোরে আঘাত করিল। রাইবিন চীৎকার উঠিল, ঘুষি মেরে সত্যকে মেরে ফেলতে পারবে না তোমরা।

আবার আঘাত। রাইবিন কুৎসিত গালাগাল দিয়া উঠিল। রাগে উন্মাদ হইয়া কমিশনার ঘুষি মারিবার জন্য অগ্রসর হইতে রাইবিন মাথা নীচু করিয়া লইল। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কমিশনার ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। জনতার মধ্য হইতে একটা চাপা হাসি আর উল্লাসের রোল উঠিল।

ক্রমশঃ উদাস জনতা উদ্বেল হইয়া উঠিতে লাগিল। চোখের সম্মুখে সেই অত্যাচারে তাহারাও উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। একজন অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, হুজুর, ও অপরাধ করে থাকে, ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিচার করুন। এরকম ভাবে মারবেন না।

জনতার মধ্য হইতে বহুকণ্ঠে চীৎকার ধ্বনিয়া উঠিল. দোহাই হুজুর মারবেন না।

রাইবিন হাত দিয়া মুখের রক্ত সরাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতেই মার চোখের উপর তাহার চোখ গিয়া পড়িল।

মা ভাবিতে লাগিলেন, আমাকে কি চিনতে পারলো?

মা তাহার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কিন্তু ফিরিতেই দেখিলেন একজন লোক তাহার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সহসা তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইলেন।

—মা

একজন কৃষক রাইবিনের কানে কানে কি বলিল। তাহার উত্তরে রাইবিন বলিয়া উঠিল, দুঃখ কিসের ভাই? জগতে আমিতো আর একলা নই! আজ আমি যেখানে আছি, কাল হয়ত আমি সেখানে আর থাকবো না কিন্তু সেইখানে থাকবে আমার স্মৃতি। আমার স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকবে এই সত্যসাধনার কথা!

মার মন বলিয়া উঠিল, রাইবিন আমাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলে গেল!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মুখের ক্ষত হইতে ঝরিয়া-পড়া রক্ত সরাইয়া রাইবিন বলিতে লাগিল, আজকে তারা দিলো একটা নীড় ভেঙ্গে কিন্তু আমি জানি, এমনি শত শত নীড় গড়ে উঠছে, গড়ে উঠবে। তারপর একদিন আসবে সেদিন সেই সব নীড় থেকে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমরা বেরিয়ে পড়বে স্বাধীনতার অবারিত আকাশে—সেদিন আসবে মানুষের মহামুক্তির দিন!

জনতার মধ্য হইতে একজন নারী এক বালতি জল লইয়া রাইবিনের মুখ ধোয়াইয়া দিতে লাগিল। তাহার নয়নে অশ্রু-ধারা!

আকাশে সন্ধ্যার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল। এখানে আর জটলা করা উচিত নয় বিবেচনায় পুলিশের লোকেরা রাইবিনকে লইয়া চলিয়া গেল।

যে যাহার দল বাঁধিয়া আবার বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। একজন বৃদ্ধ কৃষক মার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আপনার মনে বলিতেছিল, এখানে এই-ই ঘটছে নিত্য।

গম্ভীরভাবে তাহার কথায় সায় দিয়া মা বলিলেন, দেখছি তো তাই!

হঠাৎ লোকটী মার দিকে ভাল করিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি করেন?

—আমি এখানে এসেছি পশম কিনতে।

—ও সব এখানে সুবিধে হবে না!

হঠাৎ মার মনে একটা মতলব আসিল। তিনি বেশ সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। আজ রাত্তিরের মত আপনার বাড়াতে একটু আশ্রয় পেতে পারি?

মাটীর দিকে চাহিয়া একটু চিন্তা করিয়া নির্ব্বিঘ্নভাবে কৃষকটী উত্তর দিল, রাত্তিরে থাকবেন? তাতে আর কি? তবে আমার বাড়ী যা আছে তা একরকম থাকবার অযোগ্য!

—তাতে কি! কোন দিন ভাল বাড়ীতে থাকা আমারও অভ্যেস নেই।

কৃষকটী আপাদমস্তক আর একবার মাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, আপনি আমার বাড়ীতে আসতে পারেন!

—তাহলে একবার সরাইখানাটা হয়ে যেতে হবে। সেখানে আমার একটা ব্যাগ আছে। যদি তুমি দয়া করে সেটা হাতে নাও!

—নিশ্চয়ই নেবো, চলুন!

পথে চলিতে চলিতে মার কেমন মনে হইল যে, লোকটী বুঝিতে পারিয়াছে। ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোনও পরিবর্ত্তন নাই। অর্থহীন পরিবর্ত্তনহীন মুখভঙ্গী।

সরাইখানায় আসিয়া লোকটী জিজ্ঞাসা করিল, কই আপনার ব্যাগ কোথায়?

মা দেখাইয়া দিলেন। ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইয়া কৃষকটা সরাই-খানার সেই বালিকাটীকে ডাকিয়া বলিল, মেরিয়া, খাওয়া হয়ে গেলে তুমি এঁকে আমার বাড়ীতে পৌছে দিও! ব্যাগটা দেখছি একেবারে খালি!

আর কোনও কথা না বলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সরাইখানার দাম চুকাইয়া দিয়া মেয়েটীকে সঙ্গে লইয়া মা কৃষকটার বাড়ীর দিকে চলিলেন। পথে ভাবিতে লাগিলেন লোকটা ধরাইয়া দিবে নাকি? না, তিনিই লোকটার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন?

একটা জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের সামনে আসিয়া দরজা ঠেলিয়া মেয়েটী ডাকিল, ও কাকীমা, একজন লোক এসেছে বাইরে! বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

গৃহকর্ত্রী আসিয়া মাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। কুঁড়ে ঘরটী ছোট কিন্তু তাহার ভিতরকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া মা বিস্মিত হইলেন। যে মেয়েটী তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল তাহার বয়স বেশী নয়, সেই গৃহকর্ত্রী। নাম—তাতিয়ানা।

ঘরের মধ্যে কাঠের টেবিলে একটী ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তাহারই আলোয় দেখিলেন, তেমনি অর্থহীন মুখে সেই কৃষকটি বসিয়া আছে। যতখানি দৃষ্টি যায়, ঘরের চারিদিক একবার দেখিয়া লইলেন। ব্যাগটী কিন্তু দেখিতে পাইলেন না।

স্ত্রীকে ডাকিয়া সে বলিল, শিগ্‌গির পিটারকে ডেকে আন তো!

মা শঙ্কিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ব্যাগটি কোথায়?

বেশ সহজভাবে কৃষকটী উত্তর দিল, নিরাপদ যায়গাতেই আছে!

কিছুক্ষণ আগে সরাইখানায় মেয়েটার সামনে আমি বলেছিলাম যে ব্যাগটা খালি কিন্তু হাতে করেই বুঝেছিলাম রীতিমত ঠাসা ছিল ব্যাগটা।

—তাতে হয়েছে কি?

যেখানে বসিয়াছিল, সেখান হইতে উঠিয়া কৃষকটী ধীরে মার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল। তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি লোকটীকে চেনেন?

মা চমকাইয়া উঠিলেন কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন—হাঁ, আমি ওকে চিনি!

কৃষকটী হাসিয়া উঠিল। বলিল, তা আমি বুঝতেই পেরেছিলাম! আপনি মাথা নেড়ে ইসারা করলেন, আর সে মাথা নেড়ে তার উত্তর দিল। ব্যাপার দেখে আমি ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে কানে কানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনাকে চেনে কি না! সে বল্লে, আমাদের চেনা অনেকেই এখানে আছে। মার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া কৃষকটী বলিতে লাগিল, একটা শক্ত মানুষ বটে! সত্যি কথা বলবার মত সাহস আছে ওর! কি মারটাই খেলো কিন্তু এক তিল কথার এদিক ওদিক করলো না!

কৃষকটীর কথা শুনিয়া এতক্ষণে মার অন্তরের সন্দেহ এবং শঙ্কা দূর হইল।

কৃষকটী পিছন দিকে হাত করিয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল। হঠাৎ মার দিকে ফিরিয়া বলিল, ব্যাগটী তুলেই আমার কি মনে হয়েছিল জানেন, ব্যাগটীতে সেই সব বই আছে! সত্যি নয়?

—মা

—হাঁ! ওকেই দেবো বলে বইগুলো নিয়ে এসেছিলাম। বাইবিনের সেই রক্ত-ঝরা মুখের কথা মনে পড়িতেই মার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর কৃষকটী বলিল, কিছু কিছু বই আমরাও পেয়েছি। কিন্তু খুবই সামান্য। আমি নিজে ভাল পড়তে পারি না। আমার এক বন্ধু আছে, সেই আমাকে পড়ে শোনায়। খাঁটী কথা সব বই গুলোতে লেখে! আমার স্ত্রীও বেশ পড়তে জানে! এসব ব্যাপারে তারই উৎসাহ বেশী।

কিছুক্ষণ নিজেই কি চিন্তা করিয়া সে বলিল, এখন বইগুলোর কি ব্যবস্থা করবেন ঠিক করেছেন?

মা কৃষকটীর দিকে চাহিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

কিন্তু তখন বই বা ব্যাগের কথা কিছুই মার মনের সামনে ছিল না। তাঁহার মানস চক্ষের সম্মুখে রাইবিনের সেই রক্ত-ঝরা মুখ ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠিতেছিল। নীরবে তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

তিনি আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে মানুষকে দম বন্ধ করে কায়দায় ফেলে থ্যাৎলাবে—বলবার জো নেই কিছু, জিজ্ঞাসা করবার জো নেই কিছু, অমনি প্রহার!

কৃষকটী বলিয়া উঠিল, শক্তি! অগাধ শক্তি ওদের হাতে!

কোথা থেকে পায় তারা সেই শক্তি? আমাদের কাছ থেকেই তো! তাদের যা কিছু শক্তি, তার সমস্ত জোগান দি তো আমরাই!

এমন সময় বাহিরে পায়ের শব্দ হইল। পিটারকে সঙ্গে লইয়া

কৃষক-পত্নী ঘরে ঢুকিল। কাহারও পরিচয় করাইয়া দিবার অপেক্ষা না করিয়া পিটার নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল—অনুমতি করুন নিজের পরিচয় আমি নিজেই দিই, আমার নাম পিটর। আমি আপনাদের ব্যাপার কিছু বুঝি। আমি লিখতে পড়তেও জানি সুতরাং নির্ব্বোধ নই একথা বলা যেতে পারে।

মাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য পিটর বলিল, আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। আপনার ব্যাগ আমার বাড়ীতে রয়েছে। ষ্টিফেন আপনার কথা আমাকে গিয়ে বলতে আমি সব বুঝলাম। ওকেও বলে দিলাম এ সব ব্যাপারে, বুঝলে বন্ধু, একেবারে চুপটী করে থাকবে। মুখ দিয়ে একটীও কথা বার কোরো না! আপনি ভয় পাবেন না—সব ঠিক হয়ে যাবে!

লোকটার সরল এবং স্পষ্ট কথায় মার মন প্রশান্ত হইয়া উঠিল।

সে মার পাশে গিয়া বসিল। বলিল, বইগুলোর সম্বন্ধে আপনাকে আমরা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি। আমাদের এখন বই-ই চাই!

ষ্টিফেন বলিয়া উঠিল, উনি সব বইগুলোই আমাদের দিয়ে যেতে চান!

উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া পিটর বলিল, চমৎকার! সমস্ত গুলোরই ব্যবস্থা আমরাই করবো!

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আন্দোলন-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া আলোচনা চলিল। পরের দিন সকালবেলা ভোর না হইতে তাতিয়ানা মাকে ঘুম হইতে তুলিয়া দিয়া শহরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিল।

বিদায় লইবার সময় আদর করিয়া তাতিয়ানার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, সময় সময় কি রকম মজাব ঘটনা সব ঘটে।

তাতিয়ানা জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

—এই তোমাদেব সঙ্গে আলাপ! এই বাত্রি-বাসের মধ্যে এই পরিচয়, আশ্চর্য্য নয়?

যথারীতি সম্ভাষণেব পব মা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া কড়া নাড়িতে আইভানোভিচ আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

মাকে দেখিয়া আনন্দে সে বলিয়া উঠিল—বাঃ, এত শীগ্‌গির কাজ সেরে চলে আসতে পারলেন? ধন্য আপনি।

ঘরের ভিতব ঢুকিতেই সে বলিল, কাল বাত্তিরে এখানে সার্চ্চ হয়ে গিয়েছে। কেন যে হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। ভাবলাম আপনিই বুঝি বা ধরা পড়েছেন। কিন্তু তখনি মনে হলো, আপনাকে ধরলে আমাকেও ধরে নিয়ে যেতো!

খাবার ঘরের একটা বেঞ্চে বসিয়া সে বলিতে লাগিল, তবে আমার চাকরীর মাথা ওঁরা খেয়েছেন! যেখানে চাকরী করতাম, সেখানকার কর্ত্তাদের কাছে আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবার হুকুম চলে গিয়েছে। অবশ্য তাতে আমি বিশেষ কিছুই দুঃখিত নই। আমার চাকরী কি ছিল জানেন? যে সমস্ত কৃষকের ঘোড়া নেই—তাদের নামের তালিকা করা! তার জন্যে আমি মাইনে পেতাম। মাইনে নিতে আমার লজ্জা হতো। যাদের ঘোড়াটী পর্য্যন্ত নেই তাদেরই টাকায় আমার মাইনে আসতো। নিজে হঠাৎ চাকরীটা ছেড়ে দিলে

বে-মানান্ হতো। বন্ধুদের কাছে চাকরী ছাড়ার একটা কৈফিয়ৎ তো দিতে হবে!

মা ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, একজন দৈত্য যেন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বাহিরের দেয়ালে অনবরত লাথি মারিযাছে আর তাহার ধাক্কায ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিস ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

মার ক্ষুব্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া আইভানোভিচ হাসিয়া বলিল, তারা সরকারের কাছ থেকে অকারণে মাইনে নেয় না, সেইটে দেখিয়ে গিয়েছে!

রুটীর টুকরো, নোংরা প্লেট, এলোমেলো বই, কাগজ, কয়লা সব এক জায়গায় করিয়া কে যেন চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে।

—তাঁরা বোধ হয় শীগ্‌গিরই আর একবার আসবেন। সেই জন্যে আমি এ সব আর গুচোই নি। সে যাক্, আপনার কি হলো বলুন?

মা প্রথমে রাইবিনের কথা বলিতে লাগিলেন। মা দেখিলেন আইভানোভিচ স্থির স্পন্দন-হীন ভাবে তাঁহার কথা শুনিতেছে। ক্রমশঃ তাহার মুখের চেহারা বদলাইতে লাগিল। এত গম্ভীর কঠিন মুখের চেহারা মা আর কখনও দেখেন নাই।

মার কথা শেষ হইলে গম্ভীরভাবে আইভানোভিচ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আপনার ব্যাগ কোথায় রাখলেন?

—রান্নাঘরে!

—আমাদের দরজার কাছে একজন গুপ্তচর দাঁড়িয়ে আছে। এতগুলো বই আর কাগজ তার সামনে দিয়ে তো বার করে নিয়ে

যাওয়া যাবে না! ভেতরেও লুকোবার উপায় নেই। আজ রাত্রেই আবার ওরা আসবে। তোমার ব্যাগ বই-পত্র দেখলেই তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। নিরুপায়! কাগজগুলো সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে!

—কি কাগজ পোড়াবে?

—আপনার ব্যাগে যা আছে।

তিনি যে তাঁহার কার্য্যে সফল হইয়া আসিয়াছেন সে কথা এখনও বলেন নাই। একটা গোপন আনন্দে মার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, ব্যাগে এক টুকরোও কাগজ নেই।

তারপর মা বাকি সব কাহিনী বলিলেন। আনন্দে গদ-গদ হইয়া আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল—আমার নিজের মাকেও যতখানি ভালবাসতে পারি নি—তার চেয়ে ঢের বেশী তোমাকে ভালবাসি, মা। আমার এ উচ্ছ্বাসে কিছু মনে করো না! তুমি অপূর্ব্ব!

উদ্বেল আনন্দের জোয়ারে মার বুক ভরিয়া আসিয়াছিল। দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। তাহারই মধ্যে হাসিয়া তিনি বলিলেন—আমার প্রত্যেক রক্ত-কণা দিয়ে তোদের ও যে আমি ভালবাসি!

মার পাশে আসিয়া সে বলিল। তাহার দিকে চাহিয়া ধীরে মা বলিলেন, যদি পাভেল আর আন্দ্রিকে জেলের বাইরে আনা যেতো—

মাথা নত করিয়া আইভানোভিচ বলিল, অবশ্য শুনলে আপনার কষ্ট হবে কিন্তু আপনি তো পাভেলকে জানেন। সে এখন জেল থেকে কিছুতেই পালিয়ে আসবে না। সে চায় বিচার হক—বিচারে যা শাস্তি হবার হক! তারপর সাইবেরিয়া থেকে সে পালিয়ে আসবে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, সে যদি মনে করে তাতে আন্দোলনের সুবিধে হবে, তবে সে তাই করুক!

মার মুখ দিযা সেই কথা শুনিয়া আইভানোভিচ লাফাইয়া উঠিল। বলিল, এই তো চাই মা! জানেন, এই কয়েক মুহূর্ত্ত যে আপনার সঙ্গে কথা হলো—এর মধ্যে আমার জীবনের সব চেয়ে সুন্দব মুহূর্ত্তগুলি থেকে গেল। এখন দরকার হচ্ছে, রাইবিনের ব্যাপারটা নিয়ে একটা ছোট্ট বই লেখা! সেই গ্রামেই প্রচার করতে হবে। আমি এখনই লিখে দেবো। যত তাড়াতাড়ি পাবে লুডমিলা সেটা ছাপিয়ে ফেলবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—গ্রামে বিলি কববার ব্যবস্থা করবে কে?

—কেন আমি?

—না, আপনি আর নন! নিকোলেকে একবার বলে দেখি!

—আমি তাহলে কি করবো?

—অনেক কাজ আছে। ভাববেন না!

আইভানোভিচ কাগজ কলম লইয়া তখনই লিখিতে বসিয়া গেলেন। মা ঘর গোছাইতে লাগিলেন। লেখা শেষ হইয়া গেলে কাগজ কখানি মার কাছে দিয়া বলিল, আপনি আপনার পোষাকের তলায় এগুলো রেখে দিন্। মনে রাখবেন কিছুক্ষণ পরে পুলিশের লোক এসে আপনাকেও সার্চ্চ করতে পারে!

সন্ধ্যার দিকে ডাক্তার-বন্ধুটী আসিল। চঞ্চলভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে বলিয়া উঠিল—ব্যাপারখানা কি? কর্ত্তাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কাল রাত্তিরে সাত যায়গায় খানাতাল্লাসী হয়ে গিয়েছে—আমার রুগীটি কোথায়?

—সে পরশু দিনই চলে গিয়েছে। এতক্ষণে হয়ত সে কোথাও দল বেঁধে বই পড়ে শোনাচ্ছে।

—বল কি হে? ভাঙ্গা মাথার খুলি নিয়ে, সে পড়ে শোনাবে কি হে?

—আমিও তাকে তাই বোঝাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝলো না! সে যাক্—এখানে আজ রাত্তিরে কয়েকজন অতিথি আসবার কথা আছে। তুমি এখন যাও!

মার দিকে চাহিয়া বলিল—আর কাগজগুলো একেই দিয়ে দিন্। লুডমিলাকে দিয়ে দেবে!

মা কাগজগুলি ডাক্তারের হাতে দিয়া দিলেন।

—এই! আর কিছু কাজ আছে?

—না! লক্ষ্য রেখো—দরজায় গুপ্তচর দাঁড়িয়ে আছে।

—আমারও দরজায় দাঁড়িয়ে আছে! এখন, বিদায়!

রাত্রির অতিথিব আগমন-অপেক্ষায় তাঁহারা দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে যাহাতে তাঁহার পাশে বসিয়া আছেন তিনি ছাড়া আর কেহ না শুনিতে পায় এমন ভাবে আইভানোভিচ গল্প করিতেছিল—তাহার যে-সব বন্ধু এখন সাইবেরিয়ায় আছে, তাহাদের কথা; যাহারা সাইবেরিয়া হইতে পালাইয়া আসিয়া গোপনে ছদ্ম-নাম লইয়া তাহাদের সঙ্গে কাজ করিতেছে তাহাদের সকলের কথা। সেই সব নাম-হীন বীরপুরুষদের অপরূপ কাহিনীর প্রতিধ্বনিতে অন্ধকার ঘরটী ভরিয়া উঠিল।

যাহাদের কখনও চোখে দেখেন নাই, সেই সমস্ত নামহীন নিঃশব্দ কর্ম্মীদের মূর্ত্তি, মার কল্পনেত্রে সম্মিলিত হইয়া একটা বিরাট

অতিকায় মানবের মূর্তি পরিগ্রহ করিল। বীর্য্য এবং পৌরুষের সে যেন অক্ষয় ভাণ্ডার। ধীরে কিন্তু বিরাম বিহীন ভাবে এই ধরণীর রাজপথ দিয়া সে চলিয়াছে, যে-সত্য মৃতকে দেয় জীবন, সেই সত্যের বাণী প্রচার করিয়া, সকল শ্রেণীর মানুষকে সমান স্নেহে বরণ করিয়া—লোভ, অত্যাচার এবং মিথ্যাচার হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার মহা-আশ্বাস বাণী তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপে বাজিয়া উঠিতেছে।

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যখন পুলিশ আসিল না তখন তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ভোর বেলার দিকে মা শুনিলেন রান্নাঘরের দিকের জানলায় কে যেন টোকা দিতেছে। বহুক্ষণ ধরিয়া ঠিক একইভাবে আস্তে আস্তে শব্দ হইতে লাগিল। তখনও আকাশে অন্ধকার রহিয়াছে। তখনও শহর নিস্তব্ধ নীরব।

বিছানা হইতে উঠিয়া দরজার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

অপরিচিত-কণ্ঠে একজন উত্তর দিল, আমি।

—কে তুমি?

—খুলুন না বলছি!

কণ্ঠে করুণ মিনতি!

মা দরজা খুলিতেই ইগনেটী ঢুকিয়া মাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, তা'হলে ভুল করি নি, মাঠাকরুণ! ঠিক জায়গায় আস্‌তে পেরেছি!

মা দেখিলেন তাহার কোমর পর্য্যন্ত কাদায় ভরা। মুখ বিশুষ্ক, চোখ ঝিমাইয়া আসিতেছে।

দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে চুপিচুপি মাকে বলিল, জানেন মাঠাকরুণ, আমাদের ওখানে বড বিপদ হয়েছে।

—আমি তা জানি।

ইগনেটী বিস্মিত হইয়া গেল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানলেন কি করে?

অল্প কথায় মা ইগনেটীকে ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছে?

—সবাই তো তখন ছিলনা। পাঁচজনকে ধরে নিয়ে গ্যাছে। আমি র'য়ে গেছি। ব্যাটারা নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। খুজুকগে যাক্। আমি আর ওখানে ফিরে যাচ্ছি না। ওখানে এখনও সাতজন পুরুষ আর একটী স্ত্রীলোক আছে। তারা সবাই কাজের লোক, বিশ্বস্ত।

মা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন করে এ বাড়ী খুঁজে পেলে? এতদূর পথ এলেই বা কি করে?

কোটের হাতা দিয়া মুখটা একবার মুছিয়া লইয়া সে বলিল, বনের ওধারে আপনার মনে আছে আমাদের আলকাতরার কারখানা। হুজুররা রাত্তিরে সেইখানে এসে জড হন। কিন্তু তার আগেই বাগানের মালী এসে রাইবিনকে খবর দিলো—তারা এসেছে! সাবধান! রাইবিন কি দমবার পাত্তর! খুড়ো তক্ষুণি আমাকে ডেকে বল্লে, ইগনেটী দৌড়ে শহরে যা! তোর মনে আছে সেই বুড়ীর কথা? তার কাছে একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে। বলেই তাড়াতাড়ি কি একটা লিখে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—ব্যাস্—বেরিয়ে পড় এইবার। বেরিয়ে ছুটে বনের মধ্যে এসে ঢুকলাম। ঝোপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে শুনতে

পেলাম তারা আসছে—ভারী পায়ের শব্দে বন ভরে উঠেছে। শব্দ শুনে মনে হলো অনেক লোক—ভাড়ারে ইঁদুর পড়ার মত চারি-দিকে শব্দ উঠছে। অনেকক্ষণ ধরে ঝোপের মধ্যে চুপ করে বসে রইলাম। আমার কাছ দিয়েই তারা পেরিয়ে গেল। তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়ালাম। দুরাত্তির আর একবেলা ধরে না খেয়ে না দাঁড়িয়ে হেঁটে চলে এসেছি। হপ্তাখানেক আর পা তুলতে পারবো না।

কথা বলিবার সময় তাহার চোখ দুইটি মাঝে মাঝে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, এই ব্যাপারে সে নিজের উপর রীতিমত খুসী হইয়াছে।

—হাত পা সব ধোও। একটু গরম চা তোমার এক্ষুণি খাওয়া দরকার।

—দাঁড়াও, মাঠাকুরুণ, তার আগে চিঠিটা তোমায় দিই। এই বলিয়া বহুকষ্টে হাতদিয়া ধরিয়া পাখানি একটা বেঞ্চীর উপর রাখিল। ধীরে ধীরে কাদায়-ভরা পা জড়ানো ন্যাকড়া খুলিতে লাগিল।

এমন সময় আইভানোভিচ ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই ইগনেটী শঙ্কিত হইয়া যেই পা মাটীতে রাখিয়া দাঁড়াইতে যাইবে, অমনি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল। তাহার পা একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল।

তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বসান হইল। তাহার ভয় দূর করিবার জন্য আইভানোভিচ অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ কমরেড? কিছু মনে করো না ভাই, আমি তোমার পায়ের বাঁধা খুলে দিচ্ছি।

এই বলিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া আইভানোভিচ পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিতে ইগনেটী নিজের পায়ের চেহারা দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইয়া উঠিল। বলিল, বাঃ!

আইভানোভিচ তাহার পায়ের দিক চাহিয়া বলিল, এক্ষুণি স্পিরিট দিয়ে ভাল করে ঘসে দিতে হবে।

তাহার কথায় লক্ষ্য না করিয়া ইগনেটী মাকে ডাকিয়া পায়ের ন্যাকড়ার ভিতর লুকানো চিঠিটি মাকে দিল। মা আইভানোভিচকে চিঠিটি পড়িতে বলিলেন।

"মা, এ ব্যাপার যেন নীরবে সহ্য করে যেও না। সেই মহিলাটি যিনি তোমার সঙ্গে এসেছিলেন, এই দরিদ্র কৃষকদের জন্য আরও বই লিখতে তাঁকে বলো। এই আমার শেষ অনুরোধ। রাইবিন।"

বিষণ্ণ স্বরে মা বলিয়া উঠিলেন, টুটী টিপে ধরেছে, তবুও সে—

যেন কোনও মহান দৃশ্য এখনি চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তাহারই প্রতি সম্ভ্রম দেখাইবার জন্য আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, চমৎকার! এইতো সুন্দর, মাথাকে দেয় নাড়া, অন্তরেও জাগিয়ে তোলে সাড়া।

ইগনেটী নীরবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। নীরবে রান্নাঘর হইতে এক টব গরমজল লইয়া আসিয়া ইগনেটীর পায়ের কাছে বসিয়া তাহার পা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন।

বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া ইগনেটী তাড়াতাড়ি বেঞ্চীর ভিতরে পা ঢুকাইয়া বলিয়া উঠিল, এ আপনি কি করছেন?

মা--

—শিগ্‌গির পা-টা দাও।

ইগনেটী বেঞ্চির তলায় যতদূর যায় পা ঢুকাইয়া দিল। তাহার কণ্ঠস্বর হঠাৎ ধরিয়া গেল। সে কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, একি, একি আপনি করছেন! একি আপনার উচিত!

মা কোনও কথা না বলিয়া ইগনেটীর পা ধরিয়া গরম জল দিয়া ধুইতে লাগিলেন। বিস্ময়ে এবং সঙ্কোচে ইগনেটী পাথর হইয়া গেল।

আইভানোভিচ স্পিরিট আনিবার জন্য চলিয়া গেল। মা নিকোলস্ক গ্রামে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন ইগনেটীকে তাহার কথা বলিতে লাগিলেন। সেই নির্মম প্রহারের কথা শুনিয়া ইগনেটী অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল, তা কি কখনও হতে পারে!

মনে মনে সেই দৃশ্য স্মরণ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, ঐ জন্যে লোক গুলোকে দেখলেই আমার ভয় করে—সাক্ষাৎ যমদূত!

এমন সময় আইভানোভিচ এক শিশি স্পিরিট আনিয়া রান্নাঘরে উনানে কয়লা দিবাব জন্য গেল। তাহার দিকে চাহিয়া ইগনেটী ·জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্দর লোক নাকি?

—আমাদের দলে ভদ্দর লোক, ইতবলোক কেউ নেই। সকলেই কমরেড।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া ইগনেটী বলিয়া উঠিল, অনেক কিছুই বুঝি না আমরা।

—কি বোঝনা তোমরা?

—একদিকে দেখি এই ভদ্দরলোকেরাই আমাদের চাবুক মারছে, আর একদিকে দেখি এরাই আবার আমাদের পা ধুয়ে দিচ্ছে। এ দুয়ের মধ্যিখানে কি আছে, কে জানে?

সহসা ঘরের দরজা সজোরে খুলিযা গেল। আইভানোভিচ সেই খোলা দবজার কাছে দাঁডাইযা বলিয়া উঠিল,

—মধ্যিখানে কাবা আছে জানো? যে-হাত তোমাদেব গায়ে চাব্‌ক তোলে সেই হাত-ধোওয়া জল যারা ছবেলা দেবতার প্রসাদ বলে গ্রহণ করে—আর যাদের পিঠে চাবুক পড়ে তাদেরই রক্ত চুষে যারা আবাব খায—মধ্যিখানে আছে তারা।

ইগ্‌নেটী সম্ভ্রমে আইভানোভিচেব দিকে মাথা তুলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিযার পর বলিল, ঠিক তাই!

কিছুক্ষণ মালিসের পব ইগনেটী পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। বেশ স্বচ্ছন্দে ঘরের মধ্যে পাযচাবি করিতে লাগিল। খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল, এযে একেবারে নতুন পা হযে গেল। সত্যি, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনাদের!

হঠাৎ খুব গম্ভীর মুখ করিয়া সে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, কি করে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তাও জানি না ভাল করে!

আহারের সময় টেবিলে ইগনেটী বলিতে আরম্ভ করিল, কাগজ-পত্তর সব আমিই বিলি করতাম। হাঁটতে আমার মতো আর ছুটী নেই! খুড়ো আমাকে ডেকে বাণ্ডিলটা হাতে দিয়ে বলতো—এইবার এগুলো বিলি করে দিয়ে এসো। মনে থাকে যেন, যদি ধরা পড়ো, তা হলে তুমি একা—একাজে তোমার জানা-শোনা আর কেউ নেই। তথাস্তু বলে আমি বেরিয়ে পড়তাম।

—আচ্ছা, কত লোকে বই নেয়?

—যারা পড়তে পারে তারাই নেয়। অনেক বড়লোকও বই নিয়ে পড়ে। অবশ্য তারা আমাদের কাছ থেকে নেয় না! আমাদের হাতে

এসব বই দেখতে পেলে তখনই লোহার বালা গড়িয়ে হাতে পরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে।

আইভানোভিচ নূতন লেখাটা বিলি করিবার কথা তুলিল।

—বাইবিল সম্বন্ধে নতুন যে কাগজখানা লেখা হয়েছে, সেগুলো গ্রামে পৌঁছে দেবার কি করা যায় এখন?

ইগনেটী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, এরি মধ্যে লেখা হয়ে গেল?

—নিশ্চয়ই।

—আমাকে দিন, আমিই নিয়ে যাব।

মা হাসিয়া বলিলেন, কিছুক্ষণ আগেই না বলেছিলে, গ্রামে আর ফিরবে না—পুলিশ দেখলে তোমার ভয় করে?

একটু মুস্কিলে পড়িয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে ইগনেটী উত্তর দিল, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু বিশ্রাম করবো ভেবেছিলাম। তাই বলেছিলাম, গ্রামে আর ফিরবো না। আর ভয়ের কথা বলছো! ভয় পায় সত্যি! তবে ভয়, ভয়, কিন্তু কাজও তো আবার কাজ। আপনারা হাসছেন? ভয় পায়—সে তো সত্যি কথা—তা বলে কাজ করবো না? আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় করে না? তবুও যদি দরকার হয়, তাও পড়তে হবে তো।

—কিন্তু তোমাকে সেখানে যেতে হবে না।

—তা হলে আমি কি করবো? কোথায়ই বা আমি যাবো?

—তোমার বদলে সেঁখানে আর একজন লোক যাবে। তুমি তাকে পথঘাট লোক-জন সব বাৎলে দেবে।

কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া অনিচ্ছাসত্বে যেন সে মত দিল।—আচ্ছা তাই হক।

—তোমাকে একটা পাস-পোর্ট দেওয়া হবে! সেই পাস-পোর্ট নিয়ে তোমাকে একটা কোনও বনের মালী হয়ে থাকতে হবে।

কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, ও কাজ আমি করবো কি করে! চাষারা লুকিয়ে বন থেকে প্রায়ই কাঠ কাটতে আসে। ধরা পড়লে তাদের তো পুলিশে দিতে হবে। সে আমি কি করে করবো?

মা এবং আইভানোভিচ হাসিয়া উঠিলেন।

—তোমার ভয় নেই। যাতে তাদের ধরিয়ে না দিতে হয়, তার ব্যবস্থা আমরা করে দেবো।

মা আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন, হায়রে মানুষের জীবন। দিনে পাঁচবার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে, পাঁচবার আবার সেই পোড়া চোখে হাসি ফুটে উঠে।

গভীর রাত্রি। বনের মধ্যে এক কাঠের ঘরে নিকোলে এবং ইগেনটী মুখোমুখি বসিয়া। ইগনেটী চাপা গলায় বলিতেছিল—মধ্যিখানের জানালায় চারবার?

—চারবার।

—প্রথমে তিনবার এই রকম করে টোকা মারবে। টেবিলের উপর মধ্যম আঙুলের টোকা দিয়া সে দেখাইয়া দিল।

—তারপর একটুখানি থেমে আর একবার টোকা মারবে! একজন চাষী এসে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করবে—ধাই-এর কাছ থেকে আসছো বুঝি! তুমি অমনি বলবে যে, হাঁ আমি ধাই-গিন্নীর কাছ থেকেই আসছি। আর কিছু করতে হবে না। সে-ই তখন সব করবে।

তাহাদের এই সব গোপন ইঙ্গিতের কথা শুনিতে শুনিতে মা হাসিতেছিলেন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন, এরা এখনও ছেলেমানুষ।

—তা হলে ভুলে যাবে না তো হে? প্রথমে মুরাটভে যাবে। সেখানে দাদাঠাকুরের খোঁজ করবে, তারপব—

নিকোলেব স্মৃতি-শক্তির উপর অযথা সন্দেহ করিয়া ইগনেটী আবার গোড়া হইতে সঙ্কেতগুলি বলিয়া যাইতে লাগিল। তারপব হাত বাড়াইয়া নিকোলের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সে বলিল—এখন তাহলে আমি যাই।

মা বলিলেন, অন্ধকারে বাড়ী চিনে যেতে পারবে তো?

—নিশ্চয়ই।

মাকে নিভৃতে পাইয়া নিকোলে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, জেল থেকে ওদের বার করে নিয়ে আসাব ওরা কি ঠিক করলো?

—ওরা কাল সব ঠিক করবে বলেছে।

—ওদের তুমি একটু বুঝিয়ে বলো। তোমাকে আমি বলছি তুমি দেখো কত সহজ ব্যাপার। জেলের পিছন দিকে জেলের পাঁচিলের কাছে একটা ল্যাম্প-পোষ্ট আছে—বোধ হয় দেখে থাকবে। ল্যাম্প-পোষ্টের সামনেই খানিকটা খালি জায়গা পড়ে আছে আর তার বাঁ দিকে কবর। ডানদিকে রাস্তা—রাস্তার পর শহর। ব্যাপারটা হবে এই রকম, একজন ল্যাম্প-পরিষ্কার-করা লোক কাঁধে মই নিয়ে, যেমন নিয়ম, ল্যাম্প পরিষ্কার করতে আসবে। মইটা যেমন জেলের গায়ে রোজ ঠেকিয়ে রাখে তেমনি করে রাখবে। খানিকটা মইটার ওপর উঠে, ল্যাম্প পরিষ্কার করতে করতে পাঁচিলের দেওয়ালে একটা হুক টাঙিয়ে একটা দড়ির মই হুকে আটকে পাঁচিলের ওপারে ফেলে দেবে। তারপর সে চলে আসবে। জেলের ভেতর তাদের জানিয়ে দিতে হবে কবে

কখন এই ব্যাপাব ঘটবে। তখন তাবা ইচ্ছা কবে জেলেব মধ্যে একটা গণ্ডগোল তৈবী কববে। গণ্ডগোলেব মধ্যে তাবা দুজনে দড়িব মই বেয়ে সবে পড়বে। তাবপব তো আমবা আছিই। মনে বাখবেন, দিনেব বেলা এ কাণ্ডটা ঘটাতে হবে। দিনেব বেলা জেল থেকে কয়েদী পালাবে, একথা কেউ সন্দেহ কবতে পাববে না।

—এ তো বিশেষ কঠিন বলে মনে হচ্ছে না।

—না, কঠিন মোটেই নয়। আমি দড়িব মই, হুক, এবং ল্যাম্প-পবিষ্কাব-কবা লোক সব তৈবী কবে বেখেছি। আমি যাঁব আশ্রয়ে আছি এই বুড়ো—এই বুড়ো যাবে মই ঘাড়ে কবে।

বাহিবে ভাবি পায়েব শব্দ এবং সেই সঙ্গে কাশিব শব্দ শোনা গেল। নিকোলে বলিয়া উঠিল, ভূতটা আসছে।

দবজা খুলিতেই টব মাথায় একটী বৃদ্ধ লোক ঘবেব ভিতব আসিয়া নবাগত লোক দেখিয়া অভিনন্দন কবিল।

—ঐ ওকে জিজ্ঞেসা কব তুমি, মা।

বৃদ্ধ রুক্ষস্ববে বলিয়া উঠিল, আমাকে? আমাকে আবাব কি জিজ্ঞাসা কববে?

—সেই জেল থেকে ওদেব বাব কবে আনার কথা।

—ওঃ।

নিকোলে তাহাকে পরখ কবিয়া দেখিবার জন্য বলিল, ইয়াকুব, এই সহজ ব্যাপার ইনি সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন না।

—হুঃ। বিশ্বাস করেন না মানে বিশ্বাস করতে চান না। তুমি আর আমি বিশ্বাস করতে চাই আমরা বিশ্বাস করি। এতো সোজা কথা—হাঙ্গামা কোথায় এর মধ্যে?

মা বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই নুয়ে-পড়া বৃদ্ধটীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, নিকোলে, তুমি তো জানো, এ ব্যাপারে আমার কথাই শেষ কথা নয়।

—তা জানি। কিন্তু আপনি ওদেব বুঝিয়ে বলুন। আমি যদি একবার বেরুতে পারতাম! জোর করে ওদেব মত করাতাম।

খানিকক্ষণ চিন্তা করিয়া মা বলিলেন—তুমি ভুলে যাচ্ছ, নিকোলে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবার ভাব পাভেলের ওপর।

বৃদ্ধটী চুপ করিয়া শুনিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, পাভেল কে হে?

—আমার ছেলে।

ঘাড নাডিয়া পাইপে তামাক গুঁজিতে গুঁজিতে সে বলিল, তাব নাম আমি শুনেছি। আমার ভাইপোটা প্রাযই তার নাম বলতো। সে ব্যাটাও জেলে। শুন্‌ছি হারামজাদারা তাকে সাইবেরিয়াতে পাঠাবে।

পাইপটী ধবাইয়া ঘবের মেঝের দুধারে থুতু ছড়াইতে ছড়াইতে বৃদ্ধ বলিল, তাহলে উনি চান না। বেশ, ভাল কথা। ওঁর নিজের ছেলে তার সম্বন্ধে উনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন। যার যেমন ইচ্ছে তাকে তাই করতে দেওয়া উচিত। জেলে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? বেরিয়ে আসতে চাও? এসো। চলে আসতে তোমার ক্লান্তি লাগে? এসো না, বসে থাক। তোমার সর্ব্বস্ব লুঠ করেছে? করেছে, চুপ করে বসে থাকো। তোমাকে মেরেছে? মারুক, সহ্য করো। তোমাকে মেরে ফেলেছে? বেশ, মরেই থাকো। আমি আমার ভাইপোটাকেই সরাবো।

ভোর বেলা মা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

রবিবার দিন জেলে পাভেলের সহিত আবার দেখা হইল। হাতে একটা কাগজের কুচি লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আসিবার সময় পাভেল বলিল, রাগ ক'রো না, মা।

মা বুঝিলেন চিঠিতে কি লেখা আছে। কাতর অনুনয়ের দৃষ্টি লইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু সে মুখে কোনও উত্তর ফুটিয়া উঠিল না। বাড়ীতে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠিটি আইভানোভিচের হাতে দিলেন। সে পড়িতে লাগিল—

কমরেড, আমরা এরকম ভাবে পালাতে চাই না। আমরা পারি না, আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ না। আমরা যদি এ রকম ভাবে পালিয়ে যাই, তা হলে আমাদের সহযাত্রী বন্ধুদের শ্রদ্ধা আমরা হারাবো। তার চেয়ে, নতুন যে কৃষকটি ধরা পড়েছে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা তোমরা ভাবো। তার জন্যে যদি তোমরা কষ্ট পাও, তোমাদের সে কষ্ট সার্থক হবে। এখানে তার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। প্রতি মুহূর্ত্তই একটা না একটা ঝগড়া বাঁধছে আর শাস্তি পাচ্ছে। এরই মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অন্ধকার সেলে আটকে রাখা তার হয়ে গিয়েছে। তার জন্যে আমরা সবাই যতটুকু পারি চেষ্টা করি। মাকে বুঝিয়ে বলো—তিনি হয়ত সব বুঝবেন। মাকে একটু দেখো। পাভেল।

মা সোজা হইয়া বসিলেন। পুত্র গর্ব্বে তাঁহার বুক ভরিয়া আসিল। সংযত স্থির কণ্ঠে তিনি বলিলেন, আমাকে বোঝাবার কি আছে? বরঞ্চ ও যা বলেছে—রাইবিন সম্বন্ধে ভেবে দেখা যাক, তাকে কি করে জেল থেকে বার করা যায়।

স্থির হইল এ সম্পর্কে সমস্ত ভার শাশাঙ্কা লইবে।

কিছুক্ষণ পরে লুডমিলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ঘোষণা করিল

সে সামনের সপ্তাহে বিচারের দিন পড়িবে। স্থির সংবাদ! সে দিনই বিচার শেষ হইয়া যাইবে। শাস্তি নাকি ইহারই মধ্যে স্থির হইয়া গিযাছে।

সুনিশ্চিত বেদনাব আগমন-লগ্নের অসহ্য অপেক্ষায় মাত্র একটি দিন, নিদারুণ দুর্ভাবনার আর আশঙ্কার মধ্যে কাটিল। দ্বিতীয় দিনও সেইভাবে অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন শশাঙ্কা আসিল।

সব ঠিকঠাক। আজই এক ঘণ্টার মধ্যে!

আইভানোভিচ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত শিগ্‌গির। এরি মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল?

কেন দেরী হবে? শুধু বাকি ছিল একটা লুকোবার যায়গা ঠিক করা আর একটা নতুন পোষাক সংগ্রহ করা। আব যা কিছু, সে সমস্ত ভার তো সেই বুড়ো ইয়াকুব নিজে নিয়েছে। নিকোলে আর আমি ছদ্মবেশে ওখানে থাকবো। গাযে একটা ওভারকোট, মাথায় একটা টুপি চাপিয়ে, ওকে আমরা নিয়ে যাবো!

জানালার কাছে দাঁড়াইয়া চাপা গলায় তাহারা কথা বলিতে লাগিল। শাশাঙ্কা বলিতেছিল—বুড়োটা ওর ভাইপোকেও বার করে আনবার বন্দোবস্ত করেছে। তবে দড়ির মইটা যেখানে থাকবে—জেলের ভেতর থেকে সেটা দেখা যায়। অন্য অনেকে না ওদের সঙ্গে চলে আসে!

তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমি ও যাব!

আইভানোভিচ মাকে বুঝাইয়া বলিল, লক্ষীটি মা, আপনি সেখানে যাবেন না। মিছিমিছি ধরা দিয়ে কি লাভ বলুন!

তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে মা জেদ করিয়া বলিলেন, না, আমি যাবই !

শাশাঙ্কা মার দিকে অগ্রসর হইয়া ঘাড় দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, তবুও আশা করেন, সে আসবে ? আমি আপনাকে বলছি, মা, সে কখনও পালাবার চেষ্টা করবে না।

শাশাঙ্কাকে জড়াইয়া ধরিয়া তবুও মা বলিয়া উঠিলেন, সে যাই হক, বাছা, তবুও তোদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে চল !

শাশাঙ্কা বুঝিল মা যাইবেনই।

কিন্তু দেখুন, আমরা তো কেউ এক সঙ্গে যাবো না ! আপনাকে যেতে হলে একলা সেখানে যেতে হবে। ধরুণ, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, সেখানে কি করতে গিয়েছেন, কি বলবেন ?

তাহারা রাজী হইয়াছে এই আনন্দে মা বলিয়া উঠিলেন, সে তখন আমি দেখবো'খন !

এক ঘণ্টা পরে মা জেলের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হঠাৎ ঝড় বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। মাথার উপরে নীল সাগরে ভেলা বায়ুতাড়িত হইয়া পবন-বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মা পিছন দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সমস্ত শহর ঝড়ে আর ধূলিতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে সেই কবর-ভূমি। তাহারই দক্ষিণে, তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন তাহার মাত্র সত্তর ফিট দূরে, কারাগার ! কবর-ভূমির ধার দিয়া একজন সৈনিক ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া হাটিয়া চলিয়াছে এবং তাহার পাশে আর একজন সৈনিক মনের আনন্দে শীষ

দিতে দিতে চলিয়াছে। ইহারা দুইজন ছাড়া সে-সময় সেখানে আর একটীও প্রাণী ছিল না।

সেখানে আসিবার একটা কিছু কারণ বাহির করিবার তাগিদে হঠাৎ মা সোজা সৈনিক দুইটির দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা এখানে একটা ছাগল আসতে দেখেছ তোমরা?

তাহাদের একজন উত্তর দিল, না।

ছাগল খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাদের ছাড়াইয়া কবর-ভূমির প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। মাঝে মাঝে আড়চোখে দক্ষিণ এবং পিছন দিকে চাহেন। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সহসা তাঁহার পা যেন ধরিয়া আসিল। সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলেন, কারাগারের অপর দিক হইতে একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ লোক আসিতেছে। তাহার কাঁধে একটি ছোট্ট মই। মা পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, সৈনিক দুইটি ঘোড়াটাকে লইয়া ঘুর-পাক খাওয়াইতেছে। সামনে চাহিতেই দেখিলেন, জেলের দেয়ালের গায়ে তখন মই লাগাইয়া সে উপরে উঠিয়াছে। তাহার পর আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখিলেন, রাইফিলের মাথা পাঁচিলের উপরে দেখা দিল, তাহার পর, তাহার সমস্ত দেহ। তাহার পিছনে আর একজন লোক সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। আর একজন লোকের মূর্ত্তি দেখা গেল কিন্তু সে সিঁড়ি দিয়া আর নামিল না। পাঁচিলের ওপারে কারাগারের মধ্যেই সে অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বাগানের উল্টো দিক দিয়া শহরের পথে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

—মা!

মা কানে আর কিছু শুনিতে পাইতেছিলেন না। চারিদিক হইতে নানারকম শব্দের টুকরা তাঁহার কানে আসিয়া বাজিতেছিল। কোথায় অনবরত কে বাঁশী বাজাইতেছে, কাহারা চীৎকার করিতেছে চারিদিকে শব্দের ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল। অদূরে দেখিলেন পুলিশের লোকেরা ছুটাছুটি করিতেছে।

একজন পুলিশ কনেষ্টবল দৌড়াইয়া আসিয়া মাকে ডাকিয়া বলিল, এই দাঁড়া বুড়ি। এখান দিয়ে দাড়ি-ওয়ালা একটা লোককে দৌড়ে যেতে দেখেছিস্?

হাঁ, দেখেছি হুজুর, এই বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে গেল!

আবার বাঁশী বাজিল। চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া বাগানে ঢুকিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিতেই আইভানোভিচ মাকে আনন্দে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, ভালয় ভালয় ফিরে এসেছেন তাহলে? কি রকম কি হলো?

মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সমস্ত হয়ে গিয়েছে!

যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আইভানোভিচ বলিয়া উঠিল, আপনাদের বরাত ভালো। ভগবানই জানেন, আপনার জন্যে আমার কি দুর্ভাবনাই না হচ্ছিল! এখন শুনুন, বিচারের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। আপনি বিচারের জন্যে কোনও ভয় পাবেন না। যত শিগ্‌গির ওটা চুকে যায়, পাভেল তত

শিগ্‌গির ছাড়া পাবে! সাইবেরিয়ায় ওকে আমরা যেতে দেবো না! পথ থেকেই ওকে সরিয়ে ফেলবো!

ব্যাকুল হইয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি জজদের কাছে ভিক্ষাস্বরূপ কিছু চাইতে পারি না?

আইভানোভিচ লাফাইয়া উঠিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, ছিঃ, মা, কি বলছেন আপনি! আমাদের এরকম করে অপমান করবেন না!

মা লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমাকে ক্ষমা কর, তোরা! আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি! কিসের যে ভয় তা বুঝতে পারি না। মনে হয় তারা পাভেলকে অপমান করবে। বলবে হয়তো, "এই চাষার ছেলে!" আর সে যা—ছেলে তখনি হয়ত রেগে কি যা-তা একটা উত্তর দেবে—আন্দ্রিটাও আছে—জ্ঞান হারাতে ওদের এক মিনিটও সময় লাগে না হয়ত তখন এমন একটা কাণ্ড করে বসবে যাতে এমন শাস্তি হবে যে আর হয়ত ওদের জীবনে দেখতেই পাবো না!

বহুক্ষণ ধরিয়া নানাভাবে মা তাঁহার অন্তরের এই অসহায় দুর্ব্বলতার কথা আইভানোভিচকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু আইভানোভিচ যে বুঝিল তাহা তাঁহার মনে হইল না।

বিচারের দিন অন্য সকলের সহিত মাও আদালতে বিচার-গৃহে গিয়া বসিলেন। তাঁহার পাশে যে নারীটি বসিয়াছিল, মাকে আসিতে দেখিয়াই সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, তোর ছেলেটাই তো আমাদের ছেলেটার মাথা খেলো! মা চাহিয়া দেখিলেন, সাময়লভের মা!

বৃদ্ধ সিজভও আসিয়াছিল। সাময়লভের মাকে তিরস্কার করিয়া সিজভ বলিয়া উঠিল, চুপ্ কর, নাটালিয়া!

মা নির্ব্বাক নিস্পন্দ আতঙ্কে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

জানালাগুলি প্রায় ছাদের কাছে গিয়া লাগিয়াছে। সেখান হইতে শীতের দিনের মৃদু ম্লান আলো ঘরে আসিয়া পড়িতেছে। সামনের দুইটি জানালার মধ্যখানে জারেব একটা প্রকাণ্ড ছবি—সোণালী ফ্রেমটা ঝিকঝিক করিতেছে।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দেখিলেন, একজন লোক আসিয়া গম্ভীরভাবে কি বলিয়া গেল আর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। সিজভের হাত ধরিয়া মা ও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বামদিকের কোণে একটা বড় দরজা খুলিয়া গেল। একজন বৃদ্ধলোক দুলিতে দুলিতে আসিয়া চেয়ারে বসিল। তাহাব পিছনে চার পাঁচজন আরও লোক আসিল। কিছুক্ষণ পরে পুলিশের পোষাক পরা একজন লোক কি সব বলিল। বৃদ্ধ লোকটি গম্ভীরভাবে ঘাড নাডিয়া দুইটা ঠোটের ফাঁক দিয়া চিবাইয়া বলিলেন, আরম্ভ হক—

সিজভ মার কানে কানে বলিয়া উঠিল, দেখ দেখ!

মা দেখিলেন ঘরের আর একদিকের দেয়ালের গা হইতে আর একটা দরজা খুলিয়া গেল। একটা তারের বেড়া দেওয়া যায়গার ভিতরে খোলা তলোয়ার হাতে প্রথমে একজন সৈনিক প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে সারি বাঁধিয়া আসিল, পাভেল, আন্দ্রি, ফিডিয়া, সাময়লভ, গুসেভরা দুই ভাই, বুকিন, সোমভ, আর দুইটি ছেলে, তাহাদের নাম মা জানিতেন না। মাকে দেখিয়া পাভেল মৃদু হাসিয়া অভিবাদন জানাইল—আন্দ্রি মুখ ভ্যাঙচাইতে লাগিল। মার মনে হইল, তাহাদের হাসিতে যেন ঘরের গুমোট কাটিয়া গেল।

মার কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি সিজভ বলিয়া উঠিল, দেখছো, ছোঁড়ারা কি রকম শক্ত রয়েছে! একটাও কাঁপছে না!

এমন সময় শুরু গম্ভীর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কে হাঁকিয়া উঠিল, চুপ কর সব!

দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

বিচার আরম্ভ হইল। বৃদ্ধলোকটী আসামীদের দিকে না চাহিয়া অস্পষ্টস্বরে কি প্রশ্ন করিতেছিল—মা আদৌ বুঝিতে পারিতেছিল না। পাভেল তাহার কথার উত্তর দিতেছিল—শান্ত, গম্ভীর ভাবে, অতি স্বল্প কথায়। বিচারক এবং বিচার-সংক্রান্ত যে সমস্ত লোক সেখানে সমাগত হইযাছিল, মা তাহাদের মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার স্পষ্ট ধারণা হইল যে, ইহারা কখনই নিষ্ঠুর হইতে পারে না। ইহাদের মুখে নিষ্ঠুরতা বা বীভৎসতার তো কোন লক্ষণ নাই।

পোর্সিলেনের মত রঙ-করা-মুখ একটী লোক অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি বলিয়া গেল। তারপর চারজন উকিল আসামীদের কাছে গিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিল।

প্রথম বৃদ্ধ লোকটীর পাশে আর একজন বিচারক বসিযাছিলেন। স্ফীতকায় দেহটী আর্মচেযারে যেন ধরিতেছিল না। তাঁহার পাশে লাল গোঁপ-ওয়ালা আর একজন লোক চেয়ারে মাথা ঠেসান দিয়া চোখ বুঁজিয়া কি ভাবিতেছিল। দ্বিতীয় বিচারকের পিছনে শহরের মেয়র বসিয়াছিলেন। স্ফীতোদরটীকে ওভার-কোট দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলেন।

সহসা মা শুনিলেন পাভেল ক্রুদ্ধস্বরে সকলকে শুনাইয়া বলিতেছে, আসামী আর বিচারক বলে এখানে কেউ নেই! এখানে আছে শুধু বন্দী আর বিজেতা!

সমস্ত ঘর একেবারে নীরব হইয়া গেল। মা শুধু শুনিতে পাইতে-ছিলেন—বিচারকের হাতে কলম চলার শব্দ এবং তাঁহার নিজের হৃদ-স্পন্দন।

প্রথম বিচারকটী জিজ্ঞাসা করিলেন, আন্দ্রিনাখোদকা, তুমি দোষ স্বীকার করছো—

কে যেন কাহার কানে বলিল, এই, এইবার ওঠ্।

আন্দ্রি ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। গোঁপে হাত বুলাইতে বুলাইতে একবার আড চোখে বিচারকদের দেখিয়া লইয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, দোষ স্বীকার কিসের জন্যে কেনই বা করতে যাবো? কাউকে হত্যা করিনি, চুরিও করিনি। যে জীবন-ধারার মধ্যে থাকলে মানুষ হত্যা আর চুরি করতে বাধ্য হয়—আমি শুধু জানিয়েছি যে সে-জীবন-ধারার সঙ্গে আমার কোনও যোগ নেই।

বৃদ্ধ বিচারকটী স্পষ্টস্বরে জোরে বলিয়া উঠিল, তোমার অত কথা আমরা শুন্তে চাই না। শুধু বলো, হাঁ কি না!

আন্দ্রি ফিডরের দিকে চাহিয়া বলিল, ফিডর, তুমি উত্তর দাও!

এক লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফিডর বলিল, আমি আবার কি বলবো! কোন কথা এখানে আমি বলতে চাই না! কি অধিকার আছে এঁদের আমাদের বিচার করবার?

স্থুলোদর বিচারকটি ঘাড় বেঁকাইয়া বৃদ্ধ বিচারকটীর কানে কানে কি বলিলেন। তিনি মাথা তুলিয়া আসামীদের একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া মাথা নীচু করিয়া কি লিখিতে লাগিলেন। তারপর আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া একটানা ভাবে কি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বক্তৃতার শেষে সরকারী উকিল কয়েকজন লোককে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতে

লাগিল। একজন সৈন্য আসিয়া সাক্ষ্য দিল। সে বলিল, পাভেলকে ওদের দলের সর্দার বলে ওরা মানে!

বৃদ্ধ বিচারকটা ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর নাখোদকা?

—সে ও একজন সর্দার!

বিচারকদের দিকে চাহিয়া মার মনে হইতেছিল, তাহারা সকলেই যেন অবসন্ন, অসুস্থ। তাহাদের অঙ্গ-সঞ্চালনে, কথাবার্ত্তায়, প্রত্যেক ভঙ্গীতে মনে হইতেছিল, একটা রোগতিক্ত পাণ্ডুর অবসন্নতা যেন তাহাদের গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের ভঙ্গী দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল, এই পুলিশ, কনেষ্টবল, উকিল, পেয়াদা, এই আদালত, এই বাধ্য হইয়া আর্মচেয়ারে বসিয়া থাকা, এবং যে সমস্ত ব্যাপার তাহারা আগে হইতেই জানে, তাহার সম্বন্ধে গম্ভীরভাবে এই সব প্রশ্ন করা—সমস্তই যেন এক অতি জঘন্য বিরক্তিকর ব্যাপার! তাঁহাদের দেখিয়া ভয় করিবার পরিবর্ত্তে মার মনে হইতেছিল দয়া করাই উচিত।

আসামীদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহারা নিজেদের মধ্যে হাসা-হাসি করিতেছে, আদালতে কি হইতেছে, তাহার প্রতি তাহাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। বিচারক, এটর্ণী, উকিল, পুলিশ ইহাদের কোনও কথার সঙ্গে যেন তাহাদের কোনও যোগ নাই।

দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য আদালতের কাজ বন্ধ হইল। ঘর খালি করিয়া সকলকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মা শুনিলেন, তাঁহার পাশেই কে যেন বলিতেছে, বাঁ দিকের এই মেয়েমানুষটা?

আর একজন তাহার উত্তরে বলিল, হাঁ!

মা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন দুইটা লোক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া

কি কথা বলিতেছে। তাহাদের কোথায় যেন দেখিয়াছেন, কিছুতেই স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে পেয়াদা হাঁকিল, আসামীদের যারা আত্মীয়, তারা টিকিট দেখিয়ে ঢোকো!

পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, টিকিট? একি সার্কাস না কি!

আবাব বিচারগৃহে যে যাহার আসনে আসিয়া বসিল। বিচারকদের আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বসিল। আদালতে বসিতেই সরকারী উকিল বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল।

তাহার বক্তৃতা শুনিতে বৃদ্ধ সিজভ অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা সব!

আসামীরা তেমনি নিজেদেব মধ্যে গল্প লইয়াই ব্যস্ত ছিল। তাহাদের সম্বন্ধে কি বলা হইতেছে তাহা শুনিবার জন্য তাহাদের কোনও আগ্রহ ছিল না।

মা বিচারকদের দিকে চাহিযাছিলেন। তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া মার স্পষ্ট ধারণা হইল যে এই বক্তৃতা শুনিতে তাঁহাদের কাহারও ভাল লাগিতেছেনা।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সরকারী উকিলের বক্তৃতা শেষ হইয়া গেল। মাথা নীচু করিয়া বিচারকদের অভিবাদন জানাইয়া তিনি আপনার আসনে গিয়া বসিলেন।

আইভানোভিচ আসামীদের পক্ষ হইতে একজন উকিল ঠিক করিয়াছিল। তিনি কিছুক্ষণ বলিবার পর সহসা আসামীদের দিক হইতে পাভেল উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সেইভাবে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সকলে নীরব হইয়া গেল।

পাভেল গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল,—আপনাদের এই আদালতে দাঁড়িয়ে আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে উঠিনি, আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইওনা। আমি শুধু সেই বিচারকে গ্রাহ্য করি, যে-বিচার আসবে আমাদের দলের তৈরী আদালত থেকে। তবুও কয়েকটা কথা বলতে চাই। যে-কথা আপনারা কিছুতেই বুঝতে পারছেননা, সেটা একটু আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।

সহসা তাহার সেই গম্ভীর স্থির স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে সমস্ত ঘর থম্ থম্ করিয়া উঠিল। সে ধ্বনি সহসা সেই বদ্ধ ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে প্রান্তরের সীমাহীনতাকে আনিয়া দিল। মা দেখিতেছিলেন, তাঁহার পুত্র যেন সম্মুখ হইতে সকলকে দূরে সরাইয়া দিয়া একা এক অপরূপ মহিমায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। পাভেল বলিতেছিল —

—আমরা সাম্যবাদী। তার মানে আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির চিরশত্রু। আমরা বুঝেছি, এই অর্থ-সংগ্রহের মোহই মানুষের কাছ থেকে মানুষকে দূরে রাখে, পরস্পরকে আঘাত করবার জন্যে পরস্পরের হাতে তুলে দেয় শাণিত অস্ত্র, জাগিয়ে তোলে হাজার রকমের সমাপ্তিহীন স্বার্থের সংঘর্ষ। আমরা জানি, এই ব্যক্তিগত অর্থ-সংগ্রহের মোহে মানুষ নিজেদের কাজকে সমর্থন করিয়ে নেবার জন্যে নানারকমের মিথ্যে কথা তৈরী করে ঢাকতে চায় তাদের অনাচারকে, প্রবঞ্চনাকে, সমস্ত মিথ্যাচারকে। যে-সমাজ মানুষকে শুধু মনে করে অর্থ-বাড়াবার একটা কল মাত্র, সে-সমাজ কখনও আমাদের মিত্র-ভাবে গ্রহণ করতে পারে না—আমরাও কখনও তার রীতি-নীতি মানতে পারি না। এই রকম সমাজের বিধি-বিধান থেকে মানুষকে

দেহের দিক দিয়ে, তার মনের দিক দিয়ে সকল রকমে মুক্তি দেবার জন্যে আমরা চাই যুঝতে এবং আমরা যুঝবো ও!

—আমরা মজুর! একটা ছোট্ট খেলনা থেকে পাহাড়প্রমাণ কল পর্য্যন্ত, সমস্তই আমাদের শ্রমে তৈরী হয়। প্রত্যেক লোকই আমাদের কাজে লাগাতে চায়, শুধু তাদের নিজেব স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে। আজ আমরা তাই চাই সেই স্বাধীনতা. যা কালক্রমে সমস্ত শক্তি এনে দেবে তাদেরই হাতে, যারা হাত দিয়ে সৃষ্টি করছে এই সভ্যতাকে! আমাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে—শক্তির অধিকাব থাক সকলে, ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন করবার সমস্ত রকম জিনিসের ওপর থাক সকলের অধিকার; আর সেই সঙ্গে এই হোক নিয়ম, প্রত্যেক লোককে হবে নিজের হাতে শ্রম করতে! এই আমাদের কথা! দেখছেন, আমরা বিপ্লবী নই!

বৃদ্ধ বিচারকর্তা বলিয়া উঠিলেন, অত বেশী কথা বলবার কি দরকার?

পাভেল সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার নীল চোখে একটা কোমল করুণ আভা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল—

—যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, ততদিন আমরা এই রকম বিদ্রোহী হয়ে থাকবো। যতদিন একদল লোক শুধু খেটে যাবে, আর এক দল শুধু হুকুম চালাবে, ততদিন আমরা থাকবো বিদ্রোহী। সম্পত্তি চায় সংরক্ষণ। কি প্রাণান্ত চেষ্টা না করতে হয় সম্পত্তিকে সংরক্ষণ করবার এই প্রবৃত্তি মানুষকে এতদূর পেয়ে বসে যে সে তার দাস হয়ে পড়ে। অন্তরের দিক দিয়ে হয়ে যায় ক্রীতদাস। যে-সমস্ত অভ্যাস এবং সংস্কার আপনারা তৈরী করেছেন, তার ভার এক তিল নামাতে আপনারাই পারেন না—মনের দিক দিয়ে আমরা

ক্ষা—

তো মুক্ত! জীবন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে আপনারা জগৎকে করে তুলেছন বিচ্ছিন্ন, ভেদ-ক্লিষ্ট; এই বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে আমরা জগৎকে সমগ্র সম্পূর্ণ করতে চাই।

কয়েক সেকেণ্ড থামিয়া পাভেল আপনার মনে বলিয়া উঠিল, এবং তা হবেই।

তারপর কয়েকবার আপনার মনে শেষের কথাগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে সে বলিয়া উঠিল, আমাব বক্তব্য শেষ হয়ে গেছে। তবে শেষে এইটুকু বলতে চাই, ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের অপমান করা আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বরঞ্চ, এই প্রহসনের অনিচ্ছুক দর্শক হিসাবে এখানে থাকতে বাধ্য হয়ে, আপনাদের মুখের যে চেহারা দেখলুম তাতে আমার মনে আপনাদের প্রতি করুণাই হচ্ছে।

বিচারকদের দিকে না চাহিয়াই পাভেল বসিয়া পড়িল। ধীরে আন্দ্রি আগাইয়া আসিল বিচারকদের আহ্বান করিয়া আন্দ্রি বলিয়া উঠিল, আসামী পক্ষের ভদ্রমহোদয়গণ!

ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া স্থূলকায় বিচারকটা বলিয়া উঠিলেন, তোমার সামনে বসে কোর্ট, আসামীদের উকিল নয়!

আন্দ্রির চোখে দুষ্টুমীর হাসি ফুটিয়া উঠিল। মা সে হাসি ভাল করিয়া জানিতেন। আন্দ্রি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, তাই নাকি? না বোধ হয়। আপনারা বিচারক তো নন—আপনারাই তো আসামীদের—

—সাক্ষাৎ ভাবে যা এই কেসের সঙ্গে জড়িত নয় এমন কোন কথা বলতে পারবে না!

—সাক্ষাৎ ভাবে যা এই কেসের সঙ্গে জড়িত? আচ্ছা তাই

হবে। আমি তা হলে ভাবতে পারি যে আপনারাই হচ্ছেন সত্যিই বিচারক, স্বাধীন, সাধু—

—তোমার চরিত্র-ব্যাখানের কোন প্রয়োজন নেই।

—প্রয়োজন নেই—বলেন কি, মশাই? আচ্ছা মনে করুন, আপনার সামনে দুটো দল দাঁড়িয়ে আছে—একদল বলছে—ওরা আমাদের সর্ব্বস্ব হাতিয়ে নিয়েছে। অপরদল বলছে, হাতিয়ার আছে, তাই হাতাবার অধিকারও আমাদের আছে—

—গল্প আমরা শুন্‌তে চাই না।

—বুড়ো লোকদের তো গল্প শুন্‌তে ভাল লাগে!

—তোমার ভাঁড়ামী বন্ধ কর। তুমি বসো। কথা বলতে পারবে না আর।

আন্দ্রি ঠোঁঠে ঠোঁঠ চাপিয়া বসিয়া পড়িল। সাময়লভকে উঠিতে দেখিয়া বৃদ্ধ বিচারকটা বলিয়া উঠিল, তুমি বসো, তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না।

সাময়লভ তখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—এইমাত্র সরকারী উকিল আমাদের বর্ব্বর, সভ্যতার শত্রু বলে গালাগাল দিলেন। আমি শুধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁদের সভ্যতাটা কি রকম? তোমরাই নারীর নারীত্বকে নষ্ট করেছ, মানুষকে এমন যায়গায় নিয়ে ফেলেছ যেখানে চুরি চামারি করতে সে বাধ্য—মদের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রেখেছো—এইতো তোমাদের সভ্যতা! আমরা সত্যিই এই সভ্যতার শত্রু! তবে আমরা শ্রদ্ধা করি আর এক সভ্যতাকে, তার স্রষ্টাদের তোমরা অনন্ত নির্য্যাতন দিয়েছ, নির্ব্বাসনে নির্ব্বাসনে পচিয়ে মেরেছ—পাগল করিয়ে দিয়েছ—

—এখনও বলছি চুপ কর।

সাময়লভ বসিলে ফিডরের ডাক পড়িল। শাম্পেনের বোতলের ছিপির মত লাফাইয়া উঠিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিয়া উঠিল—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যা শাস্তি দাও—যেখানেই নির্ব্বাসনে পাঠাও আমি পালাবই নিশ্চয়ই পালাবো—পালিয়ে এসে আবার—

তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল।

তাহাদের মধ্যে আর কেহ কোন কথা বলিল না। বৃদ্ধ সিজভ মাকে ডাকিয়া বলিল, এবার রায় দেবে।

মা সচকিত হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ বিচারকটী একটানা স্বরে কি বলিয়া গেলেন—মা বুঝিতে পারিলেন না।

সিজভ বলিল, নির্ব্বাসন!

মা শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, ও আমি জানতামই।

বিচারকগণ উঠিয়া গেলেন। আসামীদের বেড়ার কাছে তাহাদের আত্মীয়রা শেষ দেখা করিবার জন্য আসিল। মা আসিয়া পাভেলের সহিত দেখা করিলেন। অন্য সকলের মতনই খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই অতি সাধারণ কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে সহস্র কথা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাঁহার নিজের সম্বন্ধে, শাশাঙ্কার এবং তাহার সম্বন্ধে। কিন্তু সমস্ত কথার অন্তরালে অন্তঃসলিলা ধারার মত তাঁহার অন্তরে আজ অপূর্ব্ব এক কলনাদিনী স্নেহক্ষীরধারা বহিয়া চলিয়াছিল—তাহার উচ্ছল গতি যেন তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। কেমন করিয়া পাভেলকে বুকের অতি নিকটতম স্থলে রাখা যায়, কেমন করিয়া জানান যায় যে তাহাকে ভালবাসিয়া বৃদ্ধার অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, কি করিলে সে সন্তুষ্ট হইবে!

মা বলিলেন অল্প বয়সের ছেলেদের বিচার করবার জন্যে বুড়োদের বিচারক করা ঠিক নয়!

হাসিয়া পাভেল উত্তর দিল, তার চেয়ে যাতে অল্প বয়সের ছেলেদের আদালতে না আসতে হয়, আর বুড়ো লোকদের না বিচার করতে বসতে হয়, জীবন সেই ভাবে নতুন করে সাজানো ভাল নয়?

মা দেখিতেছিলেন লিটল রাশিয়ান সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে। পাভেলের চেয়ে তাহার যে স্নেহের প্রয়োজন বেশী তাহা মা বুঝিতেন। আগাইয়া গিয়া তাহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই পুলিশের লোক আসিয়া তাহাদের লইয়া গেল। আদালত হইতে বাহির হইতেই বিস্ময়ে দেখেন কখন ক্লান্ত নগরীর উপর রাত্রির ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। পথে পথে লণ্ঠনের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আকাশে জ্বলিয়া উঠিয়াছে তারার প্রদীপ।

আদালতের চারিদিকে দল বাঁধিয়া সংবাদের জন্য লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাঁহাদের দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

সিজভ ঘাড় নাড়িয়া মাকে বলিল, লক্ষ্য করেছ, নিলোভনা, লোকে জিজ্ঞাসা করছে!

একটা পথের বাঁকে হঠাৎ কয়েকজন যুবক এবং যুবতী মাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিচারের ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, যদি অনুমতি দেন, আপনার হাত একটু স্পর্শ করবো।

বলিতে বলিতে সকলেই হাত বাড়াইয়া দিল। মা সকলের সঙ্গে

কর-মর্দ্দন করিলেন। কে বলিয়া উঠিল, আপনার ছেলে পুরুষত্বের আদর্শ হয়ে থাকবে!

কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল দীর্ঘজীবি হক, রুষ-শ্রমিকরা!

চারিদিক হইতে বহুকণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, দীর্ঘজীবি হক শ্রমিকরা। কাছেই কম্পিতকণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল, শোন কমরেডরা, একটা রাক্ষস আজ রাশিয়ার লোকদের গ্রাস করে ফেলছে—তার নাম হলো স্বেচ্ছাতন্ত্র! তারি উদরের তলহীন গহ্বরে আজ আবার কয়েকজন—

সিজভ মার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বলিল, চল, বাড়ী ফেরা যাক এখন!

শাশাঙ্কা স্থির করিয়াছিল, পাভেলের সঙ্গে সেও নির্ব্বাসনে যাইবে। নির্ব্বাসনে তাহাদের দুইজনের জীবন একসূত্রে বাঁধা হইবে।

ঘরের মধ্যে নিবিড় হইয়া বসিয়া তাহারা সেই কথাই আলোচনা করিতেছিল। শাশাঙ্কা ঘন ভ্রূ তুলিয়া জানালার বাহিরে দূর আকাশের দিকে চাহিয়াছিল।

মা বলিতেছিলেন, তারপর তোদের যখন ছেলে হবে, আমিও তখন তোদের কাছে গিয়ে থাকবো। এখানে যেমন আছি, সেখানে তার চেয়ে আর কি খারাপ থাকবো! পাভলুসা একটা কাজ যোগাড় করে নেবে—ও ঠিক তা পারবে—

আপনার মনে কি চিন্তা করিতে করিতে শাশাঙ্কা বলিয়া উঠিল, কিন্তু সে তো সেখানে বরাবর থাকবে না—তাকে তো চলে আসতে হবে—আর সে চলে আসবেই!

—তা কি করে হয়? ধর, যদি তখন ছেলেপুলে হয়—তাদের ফেলে,—

—সে যখন হবে তখন দেখা যাবে। যদি তাই হয়, আমার দিক দিয়ে আমি বলতে পারি, আমি এক মুহূর্তের জন্যেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আটকে রাখতে চাইবো না। যে কোন মুহূর্তে স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছে তাই সে করতে পারে। আমি তার কমরেড—হাঁ, স্ত্রী ও বটে কিন্তু তার জীবন যে-পথে যাত্রা করেছে সেখানে আমাদের এই সম্বন্ধটাকে সচরাচর স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ হয়, সে-ভাবে আমি দেখতে চাই না। তাকে ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হবে জানি কিন্তু তবুও তা করতে হবে। আর সে ভাল রকমই জানে, স্বামীকে সিন্দুকের টাকার মত আমি দেখি না—

তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া মা বলিলেন, এতোও সইতে পারিস্ তুই!

মার বুকে মাথা লুকাইয়া মৃদু হাসিয়া শাশা বলিল, সে অনেক দূরের কথা! এখন আর আমার কষ্ট কি! আমি তো কোনো ত্যাগ করছি না। আমি জানি আমি কি করছি এবং তার ফলাফল কি হবে তাও আমি জানি। তাকে যদি আমি সুখী করতে পারি তবেই আমি সুখী হবো! আমার একমাত্র কামনা হচ্ছে তার শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা—আমার স্নেহ, আমার ভালবাসা দিয়ে তাকে ভরিয়ে রাখা। আমি জানি, আমি তাকে যতখানি ভালবাসি সেও আমাকে ঠিক ততখানি ভালবাসে। তার কাছে আমি যে অর্ঘ্য নিয়ে যাব সেও আমাকে প্রতিদানে সেই অর্ঘ্য দেবে: আমরা দুজনে দুজনকে, এমনি করেই পরিপূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা করবো। তাতে যদি

মা—

প্রয়োজন হয ছাডাছাড়ির, ক্ষতি কি, বন্ধুব মত তাকে দেবো মুক্তি!

হঠাৎ আইভানোভিচ এক রকম ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিশ্রান্ত, ব্যস্ত। বলিযা উঠিল—

—শাশাঙ্কা, যতদিন সুস্থ আছো, এখানে আব এসো না! শিগ্‌গিবই এখান থেকে বেবিযে পডো—আমাব মনে হচ্ছে আজই আমাকে এখানে গ্রেফতাব করবে। দুটো চব পেছনে পেছনে ঘুবে বেডাচ্ছে। আমি গন্ধে বুঝতে প বি, এ বিষযে আব কোনও সন্দেহ নেই। হাঁ, আব একটা কথা! এই নাও পাভেলেব বক্তৃতাটা— এটা গিযে লুডমিলাকে দেবে—শিগ্‌গিবই যেন ছাপিযে ফেলে। আব দেখো মা, তোমাকেও এ জাযগা ছাডতে হবে। আজ বাত্রে তোমাব এখানে থাকা চলবে না। তোমাকেও গ্রেফতাব কবতে পাবে। ধবা পড়লে কাগজ বিলি করবে কে?

আইভানোভিচ একান্ত ব্যস্ত হইযা পডিযাছিল। তাহাকে এখনি যেন সকল কিছু ছাড়িযা চলিয়া যাইতে হইবে—অথচ কোথাও কিছুই যেন গুছান হয নাই।

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কেন ধরবে? তোর হয়ত ভুল হয়েছে ভাবতে—

—এবিষয়ে আমাব ভুল হয না। তুমি লুডমিলাব কাছে যাও—তাব অনেক কাজে লাগতে পারবে তুমি। পা... স্পর্শ থেকে যত দূরে থাকতে পার, ততই ভালো!

বেশ, তাই হবে!

সেই রকম ব্যস্ত হইয়াই আইভানোভিচ বলিল, যাও, কিন্তু একটা

কথা মনে রেখো। কাল লুডমিলার কাছে যে ছেলেটা থাকে তাকে এই বাড়ীর সামনে যে মুটেটা বসে থাককে তার কাছে আমার খবরের জন্যে পাঠাবে। লোকটা বড় ভাল—আমার একজন বিশেষ বন্ধু। আচ্ছা তোমরা এখন বিদায় হও। দেরী করা আর ভালো নয়।

পথে বাহিব হইয়া শাশাঙ্কা মাব কানে কানে বলিল, ঠিক এই রকম সহজভাবেই ও মৃত্যুকেও বরণ করে নিতে পারে। যখন মৃত্যু ওর দরজায় আসবে, তখন ঠিক এই রকম একটু তাড়াহুড়ো করবে—তারপর দরজা খুলে—সে সামনে এসে যখন দাঁড়াবে, চসমাটা একবার ঠিক করে নিয়ে শুধু বলবে, চমৎকার! চলো! তারপর চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে।

কিছু দূব অগ্রসব হইয়া শাশাঙ্কা বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—যদি দেখেন লুডমিলাব দরজাতেও গুপ্তচর ঘুরছে—তাহলে ওখানে না গিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসবেন।

—সে আমি জানি।

কয়েক মিনিট পরে মা লুডমিলার ছোট্ট ঠাণ্ডা ঘরটাতে বসিয়া আছেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া মা ভাবিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ইহার মধ্যে কোন্‌খানে ছাপা হয়। রাস্তার দিকে তিনটী জানালা। ঘরের মধ্যে একটা সোফা। বইএর সেল্‌ফ। দেওয়ালে ফটোগ্রাফ আর ছবি। মার বেশ মনে হইতেছিল, কোথায় যেন কি লুকান আছে। কোথায় যেন গোপন পথ আছে, অথচ কোথায় যে তাহা থাকা সম্ভব তাহা মা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

লুডমিলার গম্ভীর কঠোর মূর্ত্তি দেখিলেই মা বিব্রত হইয়া পড়িতেন।

একটা কালো রঙের পোষাক ফিতা দিয়া জড়ান। আপনার মনে লুডমিলা সমস্ত ঘর ধীরে পায়চারি করিতেছিল।

মা বলিয়া উঠিলেন, একটা দরকারে তোমার কাছে এসেছি।

—দরকার ছাড়া কেউ তো আমার কাছে আসে না।

তাহার কণ্ঠস্বরে এক নূতন সুর শুনিয়া মা ঘাড় তুলিয়া চাহিলেন। লুডমিলা হাসিয়া হাত বাড়াইতে পাভেলের বক্তৃতাটী তিনি তাহার হাতে দিলেন।

—এটা আজই ছাপাতে হবে বলে পাঠিয়েছে ওরা।

তারপর মা আইভানোভিচের কথা পাড়িলেন। গ্রেফতারের সম্ভাবনায় সে কি-রকম আয়োজন করিতে ব্যস্ত—ছেলেটীকে কাল তাহার সন্ধানে পাঠাইবার কথা সমস্তই বলিলেন।

পাভেলেব বক্তৃতাটী কোমরে গুঁজিয়া রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, চুপ করে, ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা আমি বুঝি না! যারা আমাকে আঘাত করলো, তার আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে! আঘাত যে করে, আঘাতই সে প্রত্যাশা করে। ধৈর্য্য! ধৈর্য্য আমি বুঝি না!

এতক্ষণ সে পাভেলের বক্তৃতা পড়ে নাই। ষ্টোভের আগুনের কাছে গিয়া তাহা পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে সহসা মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পড়া শেষ করিয়া বলিল, চমৎকার! এই তো চাই! যদিও এখানে সেই সব ধৈর্য্যের কথা আছে, তবুও এ বক্তৃতা যেন কবরের আগে ড্রামের আওয়াজ! ড্রাম যে বাজিয়েছে, তার পাকা হাত একথা মানতেই হবে!

কিছুক্ষণ সে আপনার মনে কি ভাবিল। তারপর বলিল, আপনার

ছেলেব সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে চাই না! তাব সঙ্গে আমার আজও পর্য্যন্ত কখনও চাক্ষুব পবিচয নেই। কিন্তু তবুও আমি জানি, আপনাব ছেলে এক অপূর্ব্ব মানুষ। বযস তার অল্প বটে কিন্তু মহাপুরুষেব প্রাণ আছে তাব দেহে। ও বকম ছেলেব মা হওয়া ভালো বটে কিন্তু বড ভযানক।

সোজা লুডমিলাব মুখেব দিকে চাহিযা বলিলেন, ভয়ানক আব কিছু নেই! এখন সবই ভালো।

লুডমিলা হাত দিযা অতি স্নেহে মার চুল আঁচডাইয়া দিতে লাগিল। মা দেখিলেন, একটা প্রাণ-ভবা আনন্দেব বন্যাকে সে মুখে-চোখে বন্দী কবিয়া বাখিযাছে।

মৃদু হাসিযা সে বলিল, তাহলে ছাপার ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করছেন?

—নিশ্চয়ই!

—আচ্ছা, আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন্। আমি ততক্ষণে এটা কম্পোজ করে দেখি। আমি তো আর আজ রাত্তিরে ঘুমোবো না। যদি দরকার দেখি, আপনাকে ঘুম থেকে তুলবো'খন। শোবার সময় আলোটা নিভিয়ে শোবেন।

সামনের অগ্নিকুণ্ডে দুখানা কাঠ দিয়া তাহারই পাশের দেয়ালে একটা ছোট্ট দরজা খুলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া মা আপনার মনে বলিয়া উঠিলেন—বাইরে থেকে কি কঠিন মেয়ে কিন্তু ভেতরটা ওরও জ্বলছে। এত চেষ্টা করেও তা লুকোতে পারে না। প্রত্যেকেই ভালবাসে, ভালবাসতে চায়। ভাল যদি না বাসো, জীবনে তবে কি দরকার!

মা—

আলো নিভাইয়া মা শুইয়া পড়িলেন।

পরের দিন লুডমিলা ছেলেটীকে আইভানোভিচের সন্ধানে পাঠাইয়া জানিতে পারিল, পুলিশে সত্যই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়াও সেই খবর দিল।

ডাক্তার বলিল, সে আমাকে তোমাদের এখানে দেখা করতে বলে দিয়েছে।

—এখানে এসে তোমার যে বিশেষ কোন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। কাল রাত্তিরে জনকতক ছেলে পাভেলের বক্তৃতাটী হেক্টোগ্রাফে প্রায় পাঁচশো ছাপিয়েছে। ওরা চায় আজ রাত্তিরেই এই শহরে ওগুলো বিলি করতে। কিন্তু হেক্টোগ্রাফের ছাপা শহরে বিলি করতে নেই। শহরের লোকেরা একটু ভালো ছাপা নইলে পড়ে না। ওগুলো বরঞ্চ অন্য কোথাও যদি—

মা বলিয়া উঠিলেন, ওগুলো আমাকে দাও, আমি নাটাশার কাছে নিয়ে যাই।

পাভেলের কথা পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিবেন, যেখান দিয়া পায়ে-হাঁটা পথ গিয়াছে, সেখানেই তাহার কথাকে তিনি পৌঁছাইয়া দিবেন—এই বাসনা প্রবল ভাবে তাঁহার অন্তরকে পাইয়া বসিয়াছিল।

পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া ডাক্তার বলিল, সে মন্দ কথা নয়। এখন বারোটা বেজে বারো মিনিট হয়েছে। ট্রেণ ছাড়বে দুটো পাঁচ মিনিটে। আপনি সন্ধ্যের নাগাদ সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু বিপদ তো সেখানে নয়।

—বিপদ কিসের?

—বিপদ হচ্ছে এই, আপনি হলেন আইভানোভিচের খুড়ি। তার গ্রেফতারের ঘণ্টাখানেক আগে আপনাকে আর দেখা গেলো না। আপনাকে দেখা গেলো তার পরের দিন নাটাশাদের গ্রামে। সেখানে সেই রাত্রেই কাগজগুলো বিলি হলো! আপনার গলায় দড়ি পড়তে এক মিনিটও দেরী লাগবে না।

তাহাদের আশ্বাস দিয়া মা বলিলেন,—তা কেন? আমি সেখানে গিয়েছি বুড়ো সিজভের সঙ্গে দেখা করতে। অনেক দিনের বন্ধু। আমারও ছেলে যেমন নির্ব্বাসনে গিয়াছে, তারও ভাইপো তেমনি নির্ব্বাসনে গিয়েছে। মনের দুঃখে তার ওখানেই গিয়েছিলাম বলবো!

—বেশ, তাই হক। বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেল।

ডাক্তার চলিয়া যাইলে দুইটী নারী বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। মার হাত তুলিয়া ধরিয়া লুডমিলা ঘরের মধ্যে আবার পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মার হাত ধরিয়া করুণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি মা ভাগ্যবতী! জান, আমারও একটী ছেলে আছে? তার বয়স এখন তেরো বছর হলো। তার বাপের সঙ্গে সে থাকে। তার বাবা হলো সরকারী উকিল। বাপের মতন সেও একদিন হয়ত সরকারী উকিল হবে—যাদের জন্যে আমি আজ প্রাণ দিয়ে গেলাম—আমার ছেলে হয়ত একদিন তাদেরই দেবে নির্য্যাতন। আমার ছেলে আমারই শত্রু হয়ে বাড়ছে। ছদ্মনামে আজ আট বচ্ছর ধরে বাস করছি—আট বচ্ছর তাকে আর দেখি নি।

জানালার কাছে থামিয়া বাহিরের নিষ্প্রভ ম্লান আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, সে যদি আমার পাশে থাকতো—তাহলে আমার বুকে

আজ কত জোর বাড়তো, জানো মা? আমারই শত্রু হয়ে সে বাড়ছে—এই চিন্তা আমাকে মেরে ফেলেছে! তার চেয়ে যদি জানতাম যে সে মরে গিয়েছে—

—ছিঃ বাছা!

—তুমি বুঝবে না মা। তুমি সুখী। মা আর ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে—জগতে এ দৃশ্য সচরাচর ঘটে না—এ অপূর্ব্ব!

নিজের আনন্দের মধ্যে মা সহসা তলাইয়া গেলেন। বলিয়া উঠিলেন, সত্যিই এ অপূর্ব্ব! এ এক নতুন জীবন! কোথায় ছিলাম—দেখি হঠাৎ কখন সকলে গিয়েছি আত্মীয় হয়ে।

লুডমিলাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রিয় মন্ত্র উচ্চারণ করিবার মত মা বলিতে লাগিলেন, ছেলেরা বেরিয়েছে আজ জগতের পথে—আমি আজ শুধু দেখছি, বুকের মাণিকরা চলেছে পৃথিবী জুড়ে সকলে একসঙ্গে এক পথে। তারা চলেছে, পায়ের তলায় দলে চলেছে, যা কিছু মিথ্যা, যা কিছু অন্যায়, যা কিছু হীন; তুলে নিচ্ছে সবাইকে—সবাইকে নিচ্ছে তাদের চলার পথে। যৌবন আছে তাদের, শক্তি আছে তাদের, অজেয় শক্তি তাদের, তারা শুধু চায়, সুবিচার! তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, আমরা জ্বালিয়ে তুলবো নতুন সূর্য্য—সত্যি তারা জ্বালিয়ে তুলেছে নতুন সূর্য্য। তারা বলছে সকল মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলবো একটা হৃদয়কে—সব ছেঁড়া-খোঁড়া প্রাণ জোড়া দেবো আমরা একটা সুতো দিয়ে!

জানালার বাহিরে মেঘমুক্ত সূর্য্যের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া মা বলিয়া উঠিলেন—ঐ সূর্য্য, আর এই বুকে আর এক সূর্য্য জাগবে—এত সুন্দর সূর্য্য ঐ আকাশে কখনও আসে নি—মানুষের, সকল মানুষের কল্যাণের

মহাদ্যুতিতে সমুজ্জ্বল এক নতুন সূর্য্য! তার আলোতে এই পৃথিবীর যা কিছু আছে, যত কিছু আছে, সব ভ'রে উঠবে আলোয়।

বহুদিনের-ভুলিয়া-যাওয়া প্রার্থনার সুর অন্তরে জাগিয়া উঠিল। হৃদয়-অগ্নি-কুণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গের মত তাহারা বাহির হইয়া পড়িল।

—প্রেমের এই আলো ছেলেরা পৌঁছে দেবে সব যায়গায়! নতুন মেঘের রঙে তারা রাঙিয়ে দেবে জীর্ণ যা কিছু আছে! তাদের অন্তরে যে অনির্ব্বাণ হোম-শিখা জ্বলে উঠবে—তাতে তারা পবিত্র করে তুলবে—সব কিছু! তাদের প্রেমে আসবে নতুন জীবন? সে-প্রেম কে রোধ করবে? কোথায় সে শক্তি যা তার শক্তিকে বাধা দিতে পারবে? এই পৃথিবী নিজে সেই প্রেমকে জন্ম দিয়েছে—সমস্ত জীবন-ধারা চায় তার জয়! কে থামাবে তার গতিকে?

সহসা ক্লান্ত হইয়া মা বসিয়া পড়িলেন। উত্তেজনায় তাঁহার চৈতন্য অবশ হইয়া আসিতেছিল।

—কি বললাম, কিছু অন্যায় বলিনি তো?

লুডমিলা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, অন্যায়? . এর চেয়ে সত্যি আর কিছু হতে পারে না।

বিদায়ের সময় মার মুখের দিকে চাহিয়া লুডমিলা বলিল, জানেন, আপনার মুখ দেখলে কি মনে হয়?

—কি?

—খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর প্রথম সূর্য্যোদয়!

ট্রেণে চড়িবার সময় মা স্পষ্ট বুঝিলেন, তাহার পিছনে পিছনে লোক আসিতেছে। গাড়ীতে বসিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, একজন লোক

তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। ভাবিলেন, তাহলে এইখানেই ধরা পড়বো? কিন্তু লোকগুলোর কি হবে? এত শ্রম নষ্ট হয়ে যাবে?

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে মা দেখিলেন গাড়ীর লোকটী নামিয়া গিয়া ষ্টেশনের একজন লোককে কি বলিল। সে লোকটী কোনও রকম সঙ্কোচ না করিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

অস্বস্তি বোধ করাতে মা ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরকম করে চেয়ে দেখছো কি?

—হুঃ—চোর! বুড়ো হয়ে মরতে বসেছে—তবুও—

তীব্র আঘাতের মত কথাগুলি মার বুকে গিয়া বিঁধিল। তাঁহার চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী যেন দুলিয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন আমি চোর নই, মিথ্যাবাদী!

অঙ্গের আবরণ স্বরূপ যে চাদরখানি ছিল, তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বুকের ভিতর হইতে কাগজগুলি বাহির করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কে কোথায় আছ, শোন!

দেখিতে দেখিতে চারিদিকে চীৎকার পড়িয়া গেল। উৎসুক জনতা মজা দেখিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ষ্টেশনে নামিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার ছেলে পাভেল, রাজনৈতিক অপরাধে কাল নির্ব্বাসনে গিয়েছে। এই তার বক্তৃতা। যাবার সময় তোমাদের জন্যেই সে এই সব কথা বলে গিয়েছে। আমি এসেছি তোমাদের কাছে, তার কথা বিলি করবার জন্যে!

দেখিলেন, সেই কাগজ একখানা পাইবার জন্য লোকে কাড়াকাড়ি

লাগাইয়া দিয়াছে। তাহাদের ডাকিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—সারাদিন খেটে তোমরা কি পাও জানো? অনাহার, ব্যাধি আর নির্য্যাতন। আমাদের জীবন রাত্রির মত ঘোর অন্ধকার, ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্নে ভরা।

সহসা সেই কৌতূহলী জনতা ভেদ করিয়া দুইজন সৈনিক আগাইয়া মার হাত ধরিল।

মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—আমার ছেলে যা বলে গিয়েছে—তোমরা তা বিশ্বাস করো। সে তোমাদেরই মত একজন সামান্য মজুর ছিল—কিন্তু তার আত্মা সে তোমাদের মত বিক্রী করেনি।

সহসা বুকে সজোরে ঘুসি আসিয়া লাগিল। মা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। পুলিশের লোক আসিয়া জনতা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল।

একজন সৈনিক গায়ের জামা ধরিয়া মাকে তুলিয়া ধরিল। মা বলিতে লাগিলেন, তোমাদের সমস্ত শক্তি এক যায়গায় জড় কর।

বেশ ভাল করিয়া ঝাকানি দিয়া সৈনিকটি গর্জ্জন করিয়া উঠিল, চুপ্ কর।

—কিছু ভয় করো না। কাউকে ভয় করো না। সারা জীবন ধরে নিঃশব্দে তোমরা যে অত্যাচার সহ্য করো, তার চেয়ে বেশী অত্যাচার আর কেউ দিতে পারে না।

হাত ধরিয়া সৈনিকটী মাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

—যে-নির্য্যাতন প্রতিদিন তিল তিল করে অন্তরকে মেরে ফেলে তার চেয়ে বড় নির্য্যাতন আর কিছু নেই।

মার গালে সজোরে একটী চড় পড়িল। অচৈতন্য হইয়া তিনি পড়িয়া গেলেন।

মা—

—মৃত্যুকে পার হয়ে এসেছে যে-সত্য, তাকে কেউ আর মারতে পারবে না!

অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে তিনি শুধু অনুভব করিতেছিলেন, অনেকে মিলিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিতেছে, ঘাড়ে পিঠে আঘাত করিতেছে। কোথায় যেন একটা দরজা খুলিয়া গেল। ধাক্কা দিয়া সজোরে দরজার ভিতর তাঁহাকে কে ফেলিয়া দিল। দরজার উপর দেহের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, রক্তের বন্যা যদি বইয়ে দাও—তবুও সত্যকে ডোবাতে পারবে না!

সজোরে কে তাঁহার হাতের উপর আঘাত করিল।

—মূর্খের দল! দিন দিন নিজেদের বোঝা নিজেরাই বাড়িয়ে চলেছিস্—একদিন সেই ভারে আপনারাই নুয়ে পড়বি!

কে একজন গলা টিপিয়া ধরিল। অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, হায়রে, হতভাগার দল—

———

লোকারণ্য

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

বর্ত্তমান শ্রমিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট একমাত্র উপন্যাস। লিপিচাতুর্য্যে ও বর্ণনা কৌশলে উপন্যাসের চরিত্রগুলি অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দাম আড়াই টাকা

মুসোলিনী

শ্রীনির্ম্মলকুমার ঘোষ

নব্য ইটালীর ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন ও নবজাগরণের সম্যক্ পরিচয় পাইতে হইলে এই বইখানি পড়া একান্ত দরকার।

দাম পাঁচ সিকা